সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্ত সমগ্র

B. C. P. L. No. 7.

PUBLIC LIBRARY

Class No. 821.44198.

Book No. B.575.9(2.1)

Accn. No. 58676 ...

Date 23.8.78 ...

সুকান্ত-সমগ্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
58676
23.8.78
AGARTALA, TRIPURA

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী :: কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ৩১শে শ্রাবণ ১৩৬৪

© সারস্বত লাইব্রেরী

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি
চারু খান

দাম : ২০·০০

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সুকান্ত-সমগ্র

সূচীপত্র

ভূমিকা

ছাড়পত্র

ছাড়পত্র	...	২৭
আগামী	...	২৮
রবীন্দ্রনাথের প্রতি	...	২৯
চারাগাছ	...	৩০
খবর	..	৩১
ইউরোপের উদ্দেশে	...	৩৪
প্রস্তুত	...	৩৫
প্রার্থী	...	৩৭
একটি মোরগের কাহিনী	...	৩৮
সিঁড়ি	...	৪০
কলম	...	৪১
আগ্নেয়গিরি	..	৪৩
দুরাশার মৃত্যু	...	৪৪
ঠিকানা	...	৪৫
লেনিন	...	৪৭
অনুভব	...	৪৯
কাশ্মীর	...	৫০
কাশ্মীর (২)	...	৫২
সিগারেট	...	৫৩
দেশলাই কাঠি	...	৫৫

বিবৃতি … ৫৬
চিল … ৫৮
চট্টগ্রাম : ১৯৪৩ … ৬০
মধ্যবিত্ত '৪২ … ৬১
সেপ্টেম্বর '৪৬ … ৬২
ঐতিহাসিক … ৬৫
শত্রু এক … ৬৭
মজুরদের ঝড় … ৬৮
ডাক … ৭০
বোধন … ৭১
রানার ৭৬
মৃত্যুজয়ী গান … ৭৮
কনভয় … ৭৯
ফসলের ডাক : ১৩৫১ … ৮০
কৃষকের গান … ৮২
এই নবান্নে … ৮৩
আঠারো বছর বয়স … ৮৪
হে মহাজীবন … ৮৬

ঘুম নেই

বিক্ষোভ … ৮৯
১লা মে-র কবিতা '৪৬ … ৯০
পরিখা … ৯১
সব্যসাচী … ৯২
উদ্বীক্ষণ … ৯৪
বিদ্রোহের গান … ৯৫

অনন্যোপায়	...	৯৭
অভিবাদন	...	৯৭
জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী	...	৯৮
কবিতার খসড়া	...	১০১
আমরা এসেছি	...	১০১
একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬	...	১০২
দিনবদলের পালা	...	১০৪
মুক্ত বীরদের প্রতি	...	১০৬
প্রিয়তমাসু	...	১০৯
ছুরি	...	১১১
সূচনা	...	১১২
অদ্বৈধ	...	১১৪
মণিপুর		১১৫
দিক্‌প্রান্তে	...	১১৮
চিরদিনের	...	১১৯
নিভৃত	...	১২১
বৈশম্পায়ন	...	১২২
নিভৃত	...	১২৪
কবে	...	১২৪
অলক্ষ্যে	...	১২৫
মহাত্মাজীর প্রতি	...	১২৬
পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে	...	১২৭
পরিশিষ্ট	...	১২৯
মীমাংসা	...	১৩১
অবৈধ	...	১৩২
১৯৪১ সাল	...	১৩৪

রোম : ১৯৪৩ … ১৩৫
জনরব … ১৩৭
রৌদ্রের গান … ১৩৮
দেওয়ালী … ১৪০

পূর্বাভাস

পূর্বাভাস … ১৪৩
হে পৃথিবী … ১৪৪
সহসা … ১৪৫
স্মারক … ১৪৬
নিবৃত্তির পূর্বে … ১৪৮
স্বপ্নপথ … ১৪৮
সুতরাং … ১৪৯
বুদ্বুদ মাত্র … ১৫০
আলো-অন্ধকার … ১৫০
প্রতিদ্বন্দ্বী … ১৫১
আমার মৃত্যুর পর … ১৫২
স্বতঃসিদ্ধ … ১৫৩
মুহূর্ত (ক) … ১৫৩
মুহূর্ত (খ) … ১৫৫
তরঙ্গ ভঙ্গ … ১৫৭
আসন্ন আঁধারে … ১৫৮
পরিবেশন … ১৫৯
অসহ্য দিন … ১৬০
উদ্যোগ … ১৬১
পরাভব … ১৬১

বিভীষণের প্রতি ... ১৬২
জাগবার দিন আজ ... ১৬৩
ঘুমভাঙার গান ১৬৫
হদিশ ... ১৬৬
দেয়ালিকা ... ১৬৮
প্রথম বার্ষিকী .. ১৭০
তারুণ্য ... ১৭২
মৃত পৃথিবী ... ১৭৬
দুর্মর ... ১৭৭

গীতিগুচ্ছ

ওগো কবি তুমি আপন ভোলা .. ১৮১
এই নিবিড় বাদল দিনে ... ১৮১
গানের সাগর পাড়ি দিলাম ... ১৮২
হে মোর মরণ, হে মোর মরণ .. ১৮৩
দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে ... ১৮৪
শয়ন শিয়রে ভোরের পাখির রবে ... ১৮৪
ও কে যায় চলে কথা না বলে দিও না যেতে .. ১৮৫
হে পাষাণ, আমি নির্ঝরিণী ... ১৮৬
শীতের হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে ... ১৮৬
কিছু দিয়ে যাও এই ধূলিমাখা পান্থশালায় ... ১৮৭
ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি কর ক্ষমা .. ১৮৮
সাঁঝের আঁধার ঘিরল যখন ... ১৮৮
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি ... ১৮৯
মেঘ-বিনিন্দিত স্বরে ... ১৯০
গুঞ্জরিয়া এল অলি ... ১৯০

কোন অভিশাপ নিয়ে এল এই	...	১৯১
ভুল হল বুঝি এই ধরণীতলে	...	১৯২
মুখ তুলে চায় সুবিপুল হিমালয়	...	১৯৩
ফোটে ফুল আসে যৌবন	...	১৯৪

মিঠেকড়া

অতি কিশোরের ছড়া	...	১৯৭
এক যে ছিল	...	১৯৮
ভেজাল	...	১৯৯
গোপন খবর	...	২০০
জ্ঞানী	...	২০১
মেয়েদের পদবী	...	২০২
বিয়ে বাড়ির মজা	...	২০৩
রেশন কার্ড	...	২০৪
খাদ্য-সমস্যার সমাধান	...	২০৫
পুরনো ধাঁধা	...	২০৬
ব্ল্যাক-মার্কেট	...	২০৭
ভাল খাবার	...	২০৮
পৃথিবীর দিকে তাকাও	...	২০৯
সিপাহী বিদ্রোহ	...	২১৩
আজব লড়াই	...	২১৫

অভিযান

অভিযান	...	২১৭
সূর্য-প্রণাম	...	২৩৫

হরতাল

হরতাল	...	২৫৩
লেজের কাহিনী	...	২৫৫
ষাড-গাধা-ছাগলেব কথা	...	২৫৯
দেবতাদেব ভয	...	২৬১
রাখাল ছেলে	...	২৬৪

পত্রগুচ্ছ	...	২৬৯

অপ্রচলিত রচনা

গল্প

ক্ষুধা	...	৩৫৩
দুর্বোধ্য	...	৩৬৫
ভদ্রলোক	...	৩৬৯
দবদী কিশোর	...	৩৭৩
কিশোবেব স্বপ্ন	...	৩৭৬

প্রবন্ধ :

ছন্দ ও আবৃত্তি	...	৩৮০

গান :

বর্ষ-বাণী	...	৩৮৪
গান	...	৩৮৫
জনযুদ্ধেব গান	...	৩৮৬
গান	...	৩৮৬
গান	...	৩৮৭

কবিতা :

ভবিষ্যতে	...	৩৮৮
সুচিকিৎসা	...	৩৮৯
পরিচয়	...	৩৮৯
আজিকার দিন কেটে যায়	...	৩৯০
চৈত্রদিনের গান	...	৩৯১
সুহৃদ্‌বরেষু	...	৩৯২
পটভূমি	...	৩৯৩
ভারতীয় জীবনত্রাণ সমাজের-মহাপ্রয়াণে	...	৩৯৪
“নব জ্যামিতি”র ছড়া	...	৩৯৭
জবাব	...	৩৯৮
চরমপত্র	...	৩৯৯
মেজদাকে : মুক্তির অভিনন্দন	...	৪০০
পত্র	...	৪০১
মার্শাল তিতোর প্রতি	...	৪০২
ব্যর্থতা	...	৪০৩
দেবদারু গাছে রোদের ঝলক	...	৪০৫
প্রথম ছত্রের সূচী	...	৪০৯

সুকান্ত সমগ্র

বাংলা সাহিত্যের একটি প্রিয়তম নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাঙালীর ঘরে ঘরে নিঃসন্দেহে একটি প্রিয়তম গ্রন্থ হবে 'সুকান্ত-সমগ্র'। সুকান্তর সব লেখা একত্রে পাওয়ার বাসনা আমাদের বহু দিনের এবং বহু জনের। এতদিনে সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে সারস্বত লাইব্রেরী আমাদের ধন্যবাদার্হ হলেন।

আমি জানি, কাজটা সহজ ছিল না। লেখাগুলো ছিল নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ক্রমে ক্রমে সেসব প্রকাশকের হাতে আসতে সময় লেগেছে। সব যে নিঃশেষে পাওয়া গেছে, আমাদের নজর এড়িয়ে কোথাও যে প'ড়ে নেই—এখনও খুব জোর ক'রে সে কথা বলা যায় না। সুকান্তর লেখা উদ্ধারের কাজে কত জন যে কতভাবে সাহায্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। 'সুকান্ত-সমগ্র' আসলে নানা দিক থেকে নানা লোকের সাহায্যের যোগফল।

লেখা পাওয়ার পর দেখা দিয়েছে আরেক সমস্যা।

কোনো কোনো লেখা পাওয়া গেছে ছাপার হরফে, কোনোটা বা হাতের লেখায়। কখনও ছাপানো লেখাকে, কখনও বা পাণ্ডুলিপিকে চূড়ান্ত ব'লে মানতে হয়েছে। কিন্তু ছাপানো লেখা আর তার পাণ্ডুলিপিতে যদি অমিল থাকে? ঢালাওভাবে সেই অসামঞ্জস্যকে ছাপার ভুল ব'লে মানা হবে? বদলটা প্রেস-কপিতেও হয়ে থাকতে পারে। কাজেই ছাপার হরফে আর পাণ্ডুলিপিতে গরমিল হ'লে সেটা লেখকের ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত, অভিপ্রেত না অনভিপ্রেত, এ বিষয়ে দ্বিধায় পড়তে হয়। যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তাও যে লেখাটির প্রাথমিক খসড়া নয়—সেটা যে প্রেস-কপির হুবহু নকল—তাই বা জোর ক'রে কিভাবে বলা যাবে। তাছাড়া লেখার ভুলে পাণ্ডুলিপিতেও অনেক সময় গোলমাল থাকে; বানানের অনিয়ম ছাড়াও যতি চিহ্নের অসতর্কতায় পাঠকের ভুল বুঝবার আশঙ্কা থেকে যায়।

সুতরাং যদ্দৃষ্টং তন্মুদ্রিতং করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। বানানে সমতা আনবার চেষ্টা করতে হয়েছে, যতি চিহ্নের ব্যাপারে জায়গায় জায়গায় হস্তক্ষেপের দরকার হয়েছে এবং মুদ্রিত আর পাণ্ডুলিপিগত অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে দুটোর একটিকে বেছে নিতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, এর কোনোটাই অনড় অচল ব্যবস্থা নয়—পরে প্রয়োজনবোধে রদবদল হ'তে পারে।

এর চেয়েও জটিল আরেকটি সমস্যা আছে। সে সম্বন্ধে আজকের পাঠকদের অবহিত করতে চাই। সমস্যাটি সাধারণভাবে লেখার নির্বাচন সংক্রান্ত।

মাত্র একুশ বছর সুকান্ত পৃথিবীতে বেঁচে ছিল। আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য সুকান্তকে আশ্চর্য প্রতিভা ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক বিকশিত হওয়ার মুখেই সেই আশ্চর্য প্রতিভাকে আমরা হারিয়েছি।

বয়স বাড়লে নিজেদের কম বয়সের লেখা সম্বন্ধে লেখকেরা স্বভাবতই খুব খুঁতখুঁতে হন। অনেকের কাঁচা বয়সের লেখার কথা তো পরে আমরা জানতেও পারি না। অথবা জানলেও, তাঁদের পাকা হাতের লেখাগুলো সংখ্যায় আর পরিমাণে তাঁদের কাঁচা হাতের লেখাগুলোকে ঢেকে দিতে পারে।

সুকান্ত সেদিক থেকে সত্যিই মন্দভাগ্য। অকালমৃত্যু সুকান্তকে বাংলা সাহিত্যে শুধু বিপুলতর গৌরব লাভের সুযোগ থেকেই বঞ্চিত করে নি সেই সঙ্গে লেখার সংখ্যায় আর পরিমাণে পরিণতির চেয়ে প্রতিশ্রুতির পাল্লাই ভারী করেছে।

বেঁচে থাকলে সুকান্তর কিছু লেখা যে 'সুকান্ত-সমগ্র'তে স্থান পেত না, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে আমি ছিলাম সুকান্তর অগ্রজ; তার কবিমনের অনেক কথাই আমার জানা ছিল। তার কবিতা যখন নতুন মোড় নিচ্ছিল, তখনই দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাকে হারিয়েছি। সুকান্তর যে সব কবিতা প'ড়ে আমরা চমকাই, সুকান্তর পক্ষে সে সবই আরম্ভ মাত্র।

সুকান্তর যখন বালক বয়স, তখন থেকেই তার কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এ পড়ছি। 'পদাতিক' বেরিয়ে তখন পুরনো হয়ে গেছে। রাজনীতিতে আপাদমস্তক ডুবে আছি। ক্লাস পালিয়ে বিডন স্ট্রীটের চায়ের দোকানে আমাদের আড্ডা। কলেজের বন্ধু মনোজ একদিন জোর ক'রে আমার হাতে একটা কবিতার খাতা গছিয়ে দিল। প'ড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি কবিতাগুলো সত্যিই তার চোদ্দ বছর বয়সের খুড়তুতো ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন, আমার অন্যান্য বন্ধুরা, এমন কি বুদ্ধদেব বসুও কবিতার সেই খাতা প'ড়ে অবাক না হয়ে পারেন নি।

আমার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যেই বোধহয় মনোজ একদিন কিশোর

সুকান্তকে সেই চায়ের দোকানে এনে হাজির করেছিল। সুকান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে সেদিন কেন আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম, সে বিষয়ে কেউ যদি আমাকে জেরা করে আমি সদুত্তর দিতে পারব না।

সে সব কবিতা পরে 'পূর্বাভাস'-এ ছাপা হয়েছে। তাতে কী এমন ছিল যে, প'ড়ে সেদিন আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম? আজকের পাঠকেরা আমাদের সেদিনকার বিস্ময়ের কারণটা ধরতে পারবেন না। কারণ, বাংলা কবিতার ধারা তারপর অনেকখানি ব'য়ে এসেছে। কোনো কিশোরের পক্ষে ঐ বয়সে ছন্দে অমন আশ্চর্য দখল, শব্দের অমন লাগসই ব্যবহার সেদিন ছিল অভাবিত। হালে সে জিনিস প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায় খেতে খামারে ঘরে ঘরে সবে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আরম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

সুকান্ত বেঁচে থাকতে তার অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে আমার চেয়ে কড়া সমালোচক আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। এখন ভেবে খারাপ লাগে। সামনাসামনি তাকে কখনো আমি বাহবা দিই নি। তার লেখায় সামান্য ত্রুটিও আমি কখনও ক্ষমা করি নি।

এ প্রসঙ্গ তুলছি স্মৃতিচারণার জন্যে নয়। পাঠকেরা পাছে বিচারে ভুল করেন, তার যুগ আর তার বয়স থেকে পাছে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন—সেইজন্যে গোড়াতেই আজকের পাঠকদের খানিকটা হুঁশিয়ার ক'রে দিতে চাই।

খুঁত ধরব জেনেও, নতুন কিছু লিখলেই সুকান্ত আমাকে একবার না শুনিয়ে ছাড়ত না। আমি তখন কবিতা ছেড়ে 'জনযুদ্ধ' নিয়ে ডুবে আছি। অফিসে ব'সে কথা বলবারও বেশি সময় পেতাম না। আমাদের অধিকাংশ কথাবার্তা হত সভায় কিংবা মিছিলে যাতায়াতের রাস্তায়। 'কী নিয়ে লিখব' —এটা কখনই আমাদের আলোচনার বিষয় হত না। 'কেমন ক'রে লিখব' —এই নিয়েই ছিল আমাদের যত মাথাব্যথা।

কিশোর বাহিনীর আন্দোলনে সুকান্তকে টেনে এনেছিল তখনকার

ছাত্রনেতা এবং আমাদের বন্ধু অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। রাজনীতিতে শুকনো ভাব তখন অনেকখানি কেটে গিয়ে নাচ গান নাটক আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বেশ একটা রসকষ এসেছে। কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের যেমন রাজনীতির আসরে ঢুকতে হয়েছিল, সুকান্তর বেলায় তা হয় নি। সুকান্তর সাহিত্যিক গুণগুলোকে আন্দোলনের কাজে লাগানোর ব্যাপারে অন্নদারও যথেষ্ট হাতযশ ছিল। সুকান্তর আগের যুগের লোক ব'লে আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে; আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সে সুকান্ত যেভাবে লিখেছিল—বেঁচে থাকলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও সেই একই ভাবে লিখে যেত। সুকান্তকে আমি ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি ব'লেই জানি, এক জায়গায় থেকে যাওয়া সুকান্তর পক্ষে অসম্ভব ছিল। 'পূর্বাভাসে' আর 'ঘুম নেই'তে অনেক তফাত। তেমনি সুস্পষ্ট তফাত 'ছাড়পত্রে'র প্রথম দিকের আর শেষ দিকের লেখায়।

তাছাড়া কবিতা ছেড়ে সুকান্ত পরের জীবনে উপন্যাসে চলে যেত কিনা তাই বা কে বলতে পারে? বেঁচে থাকলে কী হত তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার আজ হয়ত কোনো মানে নেই, কিন্তু কাজে হাত দিয়েই সুকান্তকে চলে যেতে হয়েছে—এ কথা ভুলে গেলে সুকান্তর প্রতি অবিচার করা হবে।

আমি আবার বলছি, 'সুকান্ত-সমগ্র'তে এমন অনেক লেখা আছে, যে লেখা হয়ত সুকান্তের সাজে না। সুকান্ত দীর্ঘজীবী হলে ছেলে বয়সের সে সব লেখা হয়ত তার বইতে স্থানও পেত না—আমার মতামত চাইলে আমিও ছাপাবার বিরুদ্ধে রায় দিতাম।

কিন্তু সুকান্তর অকালমৃত্যু আমাদেরও হাত বেঁধে দিয়েছে। সুকান্ত বেঁচে থাকলে যে জোর খাটানো যেত, এখন আর সে জোর খাটানো চলে না। ওর ছেলেবেলার লেখায় খোদকারি করেছি, বড় হওয়ার পরেও ওর লেখা নিয়ে খুঁত খুঁত করেছি—এই বিশ্বাসে যে, আমরা যাই বলি না কেন মানা না মানার শেষ বিচার ওর হাতে।

এখন সুকান্তর লেখা আর সুকান্তর নয়—দেশের এবং দশের। আমার কিংবা আর কারো একার বিচার সেখানে খাটবে না। কাজেই যে লেখা যেমন

তাকে ঠিক সেইভাবেই কালের দরবারে হাজির করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। 'সুকান্ত-সমগ্র'র সার্থকতা সেইখানেই।

ভাবতে অবাক লাগে, সুকান্ত বেঁচে থাকলে আজ তার একচল্লিশ বছর বয়স হত। কেমন দেখতে হত সুকান্তকে? জীবনে কোন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সে যেত? তার লেখার ধারা কোন্ পথে বাঁক নিত?

অসুখে পড়বার অল্প কিছুদিন আগে একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক মিটিঙে যাবার পথে আমার এক সংশয়ের জবাবে সুকান্ত বলেছিল: আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি—কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এ দেশের অধিকাংশ হবে।

সেদিন তর্কে আমি ওকে হারাতে চেষ্টা করেছিলাম। আজ আমাকে মানতেই হবে, একদিক থেকে তার কথাটা মিথ্যে নয়। গত কুড়ি বছর ধরে সুকান্তর বই বাংলা দেশের প্রায় ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে তার একটা ছাপা বই থেকে শ'য়ে শ'য়ে হাতে লিখে নকল করে লোকে সযত্নে ঘরে রেখেছে। তার পাঠককুল ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সুকান্ত মুখে যাই বলুক, আসলে সে শুধু পার্টির কর্মীদের জন্যেই লেখে নি। যে নতুন শক্তি সমাজে সেদিন মাথা তুলেছিল, সুকান্ত তার বুকে সাহস, চোখে অন্তর্দৃষ্টি আর কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছিল। এ কথাও ঠিক নয়, কাউকে খুশি করার জন্যে সুকান্ত লিখেছিল। তাগিদটা বাইরে থেকে আসে নি, এসেছিল তার নিজের ভেতর থেকে। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আসলে নিজেকেই সে কবিতায় ঢেলে দিয়েছিল।

কী ভাবে বলেছিল সেটাও দেখতে হবে। সুকান্তর আগে আর কেউ ওকথা ওভাবে বলে নি ব'লেই পাঠকেরা কান খাড়া ক'রে তার কথা শুনেছেন। বলবার উদ্দেশ্যটা যাঁদের মনের মত ছিল না, বলবার গুণে তাঁরাও না শুনে পারেন নি।

সুকান্তর মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন: '...যে কবির বাণী শোনবার জন্যে কবিগুরু কান পেতেছিলেন সুকান্ত সেই কবি। শৌখিন মজদুরি নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক, কর্মে ও কথায় তাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তার, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তার দেহমন। মাটির বুক থেকে সে উঠে এসেছিল।

'...ব্যক্তিজীবনে সুকান্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল।

কিন্তু এই শেষ চার পংক্তিতে ('আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,/নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,/অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা, আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন' : 'ঐতিহাসিক', ছাড়পত্র) কবি সুকান্ত যে আদর্শের কথা বলে গেছে তা পৃথিবীর সমস্ত মতবাদের চেয়েও প্রাচীন, সমস্ত আদর্শের চেয়েও বড় ।...

'...তার প্রথম দিকের অনেক রচনাতেই দলীয় শ্লোগান অতি স্পষ্ট ছিল ; কিন্তু মনের বালকত্ব উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রকাশকে অনন্যপরতন্ত্র করে তুলেছিল ।...'

('কবিকিশোর' : পরিচয় শারদীয়, ১৩৫৪)

এ কিন্তু ভঙ্গি দিয়ে ভোলানো নয়, কবিতার গুণে দূরের মানুষকে কাছে টানা ।

সমসাময়িকদের মধ্যে যে কাজ আর কেউ পারে নি, সুকান্ত একা তা করেছে—আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বার বহুজনের জন্যে সে খুলে দিয়ে গেছে। কবিতাবিমুখ পাঠকদের কবিতার রাজ্যে জয় ক'রে আনার কৃতিত্ব সুকান্তর। তারই সুফল আজ আমরা ভোগ করছি।

সুকান্তর মৃত্যুর পর সুকান্তকে অনুকরণের একটা যুগ গেছে। কারো কারো এ ধারণাও হয়েছিল যে, রাজনৈতিক আন্দোলনই বুঝি সুকান্তকে তুলে ধরেছিল। সুকান্তর অক্ষম অনুকারকেরা কবিতার ভূষ্টিনাশ ক'রে বক্তব্যকে বুলিসর্বস্ব ক'রে তুললেন। হিতে বিপরীত হল। একটা সময় এল, পাঠকেরা বেঁকে বসল—সেই পাঠকেরাই, যারা এর আগে এবং পরেও সুকান্ত প'ড়ে তৃপ্তি পেয়েছে।

সুকান্তর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের তোলাতুলি বা কোলাকুলির সম্পর্ক ছিল না—এটা না বোঝার জন্যেই একদল কবির মধ্যে এক সময় রাজনীতি থেকে আশাভঙ্গজনিত পালাও-পালাও রব উঠেছিল। যে যার নিজের মধ্যে তাঁরা পালিয়ে গেলেন। তাতেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের মুশকিলের আশান হয় নি।

ভুল হয়েছিল বুঝতে। সুকান্ত রাজনীতির কাঁধে চড়ে নি। রাজনীতিকে নিজের কাঁধে নিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও সুকান্তকে দিয়েছে তাই সানন্দ স্বীকৃতি। নিজেকে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছিল সুকান্তর কবিতা।

আজ যাঁরা সুকান্তর কবি প্রতিভাকে এই ব'লে উড়িয়ে দিতে চান যে, সুকান্তর কবিতায় শ্লোগান ছিল—তাঁদের বলতে চাই, সুকান্তর কবিতায় শ্লোগান নিশ্চয়ই ছিল। কবিতার জাত যাবার ভয়ে শ্লোগানগুলোকে রেখে ঢেকেও সে ব্যবহার করে নি। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত যে ভাষা হাজার হাজার মানুষের নানা আবেগের তরঙ্গ তুলেছে, তাকে কবিতায় সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই সুকান্ত সার্থক কবি। কবিতায় রাজনীতি থাকলেই যাঁদের কাছে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়, তাঁরা ভুলে যান—অরাজনৈতিক কবিতায়ও জিগির কিছু কম নেই। আসলে আপত্তিটা বোধহয় শ্লোগানে নয়, শ্লোগান বিশেষে—রাজনীতিতে নয়, রাজনীতি বিশেষে। তাঁদের কাছে অনুরোধ, কবিতার দোহাই না তুলে মনের কথাটা খুলে বলুন।

কবিতায় সুকান্তই যে শেষ কথা, তার পথই যে একমাত্র পথ—মতিভ্রম না হলে কেউ সে কথা বলবে না। সাহিত্যে অনুকারকের স্থান নেই, এ তো সবাই জানে। সুকান্তর কবিতা সুকান্তকে ছাড়া আর কাউকেই মানাবে না। সুকান্তর পরবর্তী যে কবি সুকান্ত থেকে তফাত করবে, নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে—সে আমাদের প্রশংসা পাবে। কেননা আত্মমর্যাদা না থাকলে অন্যকে মর্যাদা দেওয়া যায় না। সুকান্তকে ছাড়িয়ে যাওয়াই হবে সুকান্তকে সম্মান জানানো।

আমার এ ভূমিকা, বিশেষ ক'রে, সুকান্তর আজকের পাঠকদের জন্যে। আমি সমালোচক নই। বাংলা সাহিত্যে সুকান্তর কী দান, কোথায় তার স্থান—সে সব স্থির করবার জন্যে যোগ্য ব্যক্তিরা আছেন। 'সুকান্ত-সমগ্র' পাঠকদের হাতে ধরিয়ে দিয়েই আমি খালাস।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, শেষ করবার আগে সেই কথাতেই আবার ফিরে আসতে চাই। মনে রাখবেন, সুকান্তর বয়স আজ একচল্লিশ নয়। আজও একুশ।

সুকান্তর জন্ম বাংলা ১৩৩৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ। সুকান্তর বাবা স্বর্গত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। কলকাতায় কালীঘাটে মাতামহের ৪২, মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়িতে সুকান্তর জন্ম। সুকান্তর জীবনের অনেক কথাই সুকান্তর ছোট ভাই অশোক ভট্টাচার্যের লেখা 'কবি-সুকান্ত' প'ড়ে জেনে নিতে

পারবেন। আমি শুধু তার একুশ বছরের জীবনের কয়েকটা দিক মোটা দাগে তুলে ধরতে চাই।

সুকান্তদের পৈতৃক ভিটে ছিল ফরিদপুর জেলায়। সুকান্তর জ্যাঠামশাই ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত। বাড়িতে ছিল সংস্কৃত পঠনপাঠনের আবহাওয়া। পরে এই প্রাচীন পন্থার পাশাপাশি উঠতি বয়সীদের আধুনিক চিন্তা-ভাবনার একটা পরিমণ্ডলও গ'ড়ে ওঠে। সুকান্ত ছেলেবেলায় মা-র মুখে শুনেছে কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সুকান্তর বাবা আর জ্যাঠামশাই অসহায় অবস্থা থেকে নিজেদের পুরুষকারের জোরে বিদেশ বিভুঁইতে এসে বড় হয়েছিলেন। বইয়ের প্রকাশ ব্যবসা ছাড়াও সুকান্তর বাবা আর জ্যাঠামশাইয়ের ছিল যজমানি আর পণ্ডিত বিদায়ের আয়। বেলেঘাটায় নিজেদের বাড়ি ছেড়ে পৃথক হওয়ার আগে পর্যন্ত যৌথ পরিবার স্বচ্ছলভাবেই চলত। সুকান্তর মাতামহ পণ্ডিত বংশের মানুষ হয়েও প্রাচীন সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। এরই ভেতর দিয়ে বহু আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে হেসে খেলে কেটেছিল সুকান্তর শৈশব। ন-দশ বছর বয়স থেকেই সে ছড়া লিখে বাড়িতে কবি হিসেবে নাম কিনেছিল। লেখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলত নানারকমের বই পড়া। সুকান্ত ছোট থাকতেই ক্যান্সার রোগে সুকান্তর মা মারা গেলেন। ছেলেবেলা থেকেই সুকান্তর ছিল অন্তর্মুখী মন। ইস্কুলে সুকান্ত বন্ধু হিসেবে পেয়েছিল পরবর্তীকালের যশস্বী কবি অরুণাচল বসুকে। অরুণাচলের মা সরলা বসুর ('জলবনের কাব্য'র লেখিকা) প্রভাব সুকান্তর জীবনে কম নয়। খেলার মধ্যে তার প্রিয় ছিল ব্যাডমিন্টন আর দাবা। পরোপকারে ছেলেবেলা থেকেই দল বাঁধায় তার ছিল প্রবল উৎসাহ। শহরে মানুষ হ'লেও সুকান্ত ছিল গাছপালা মাঠ আকাশের ভক্ত।

পরের জীবন মোটামুটি তার কবিতায়ই পাওয়া যাবে। সুকান্তর কবিতা কখনই তার জীবন থেকে আলাদা নয়।

তবু সুকান্তর একটা নতুন দিক 'সুকান্ত-সমগ্র'তে তার চিঠিপত্রে পাঠকদের কাছে এই প্রথম ধরা পড়বে। যখন তাঁরা পড়বেন :

'বাস্তবিক, আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই...কোনো গহন অরণ্যে কিংবা অন্য যে কোনো নিভৃততম প্রদেশে, যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্টমনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ।...

কিংবা

'সেখানে আমি ঘন ঘন যেতে লাগলুম।...ওর আকর্ষণে অবিশ্যি নয়। বাস্তবিক আমাদের সম্পর্ক তখনও অন্য ধরনের ছিল, সম্পূর্ণ অকলঙ্ক, ভাইবোনের মতোই।' (পত্রগুচ্ছ)

কিংবা যে চিঠিতে পার্টি সম্পর্কেও সুকান্ত অভিমান প্রকাশ করেছে।

এ কি আমাদের সেই একই সুকান্ত? 'ছাড়পত্র' আর 'ঘুম নেই'-এর?

হ্যাঁ, একই সুকান্ত। কখনও বিষণ্ণ, কখনও আশায় উন্মুখ। কখনও আঘাতে কাতর, কখনও সাহসে দুর্জয়। কখনও চায় জনতা, কখনও নির্জনতা। কোথাও ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলতেই পারে না, কোথাও ঘৃণায় হুংকার দিয়ে ওঠে।

সুকান্ত কাগজের মানুষ নয়, রক্তমাংসের মানুষ। তার আত্মবিশ্বাস কখনও কখনও অহমিকাকে স্পর্শ করে, তার যুক্তি কখনও কখনও আবেগে ভেঙে পড়ে।

সুকান্ত বড় কবি হলেও বয়স তার একুশ পেরোয় নি। তার বেশীর ভাগ লেখাই আরও কম বয়সের।

'সুকান্ত-সমগ্র' সুকান্তর মহৎ সম্ভাবনাকে মনে করিয়ে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তার অভাববোধকে নিরন্তর জাগিয়ে রাখবে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, বেঁচে থাকলে এতদিনে সুকান্তর এত বছর বয়স হত। কী লিখত সে? কেমন দেখতে হত?

তখন আমার চোখে তার ছবিটাই বদলে যায়।

৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

'সুকান্ত-সমগ্র'র ষষ্ঠ সংস্করণে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ও পরিবর্তন করা হল। 'ক্ষুধা', 'দুর্বোধ্য', 'ভদ্রলোক', 'দরদী কিশোর' ও 'কিশোরের স্বপ্ন'—এই পাঁচটি গল্প এবং 'ছন্দ ও আবৃত্তি' প্রবন্ধটি এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত হয়েছে 'ব্যর্থতা' ও 'দেবদারু গাছে রোদের ঝলক' কবিতা দুটি এবং একাধিক চিঠি। পত্রগুচ্ছ ও অপ্রচলিত রচনা-সমূহ রচনার কালক্রম অনুসারে সাজানো হল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও পাওয়া গেছে, সে সবই সুকান্ত-সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আয়তন বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই সংস্করণের দাম বাড়ানো হল না।

প্রকাশক

ছাড়পত্র

ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,

আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস ॥

আগামী

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে ।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা ।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা ;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে.
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড় ;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে ।

আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে ;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো : হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে ;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে,
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে ;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

চারাগাছ

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি :
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে :
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায় ;
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি

এ অট্টালিকার প্রতি ইঁটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের, রক্তের আর চোখের জলের।
তবু এই প্রাসাদকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে
সেলাম জানায় লোকে, চেয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে।
আমি তাই এ প্রাসাদে এতকাল ঐশ্বর্য দেখেছি,
দেখেছি উদ্ধত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা।

হঠাৎ সেদিন
চকিত বিস্ময়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা।

অমনি পৃথিবী
আমার চোখের আর মনের পর্দায়
আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিল একটি পলকে।

ছোট ছোট চারাগাছ—
রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে।

হঠাৎ চকিতে,
এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ
শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল
উদ্ধত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে।

ছোট ছোট চারাগাছ—
নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনে :
প্রত্যেক ইটের নীচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের,' ঘামের আর চোখের জলের।

তাইতো অবাক আমি, দেখি যত অশ্বত্থচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।

মনে হয়, এইসব অশ্বত্থ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত ॥

খবর

খবর আসে!
দিগ্‌দিগন্ত থেকে বিদ্যুদ্‌বাহিনী খবর ;
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়—
—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।
রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝঙ্কৃত ছন্দে—প্রকাশের ব্যগ্রতায় ;
তোমাদের জীবনে যখন নিদ্রাভিভূত মধ্যরাত্রি
চোখে স্বপ্ন আর ঘরে অন্ধকার।

অতল অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে ;
অভ্যস্ত হাতে খবর সাজাই—
ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,
দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।
কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে ;
বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।

তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে
খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে,
তাদের পেয়ে কখনো কণ্ঠে নামে ব্যথা, কখনো বা আসে গান ;
সকালে দিনের আলোয় যখন তোমাদের কাছে তারা পৌঁছোয়
তখন আমাদের চোখে তাদের ডানা ঝরে গেছে।/
তোমরা খবর পাও,
শুধু খবর রাখো না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের।
ঐ কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতায়
কোনো ফাঁকে ?
পুরনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী—
৯ই আগস্টে কি আসাম সীমান্ত আক্রমণে ?
জ্বলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজীর মুক্তিতে,
প্যারিসের অভ্যুত্থানে ?
দুঃসংবাদকে মনে হয় না কি
কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা ?
যে খবর প্রাণের পক্ষপাতিত্বে অভিষিক্ত
আত্মপ্রকাশ করে না কি বড় হরফের সম্মানে ?
এ প্রশ্ন অব্যক্ত অনুচ্চারিত থাকে
ভোরবেলাকার কাগজের পরিচ্ছন্ন ভাঁজে ভাঁজে।

শুধু আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি !
তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের—
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে ?
কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরীরা এসেছে আমাদের
চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা—
পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে আজো স্বপ্ন।
কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়।

আজ তোমরা এখনো ঘুমে ॥

ইউরোপের উদ্দেশে

ওখানে এখন মে-মাস তুষার-গলানো দিন,
এখানে অগ্নি-ঝরা বৈশাখ নিদ্রাহীন ;
হয়তো ওখানে শুরু মন্থর দক্ষিণ হাওয়া,
এখানে বোশেখী ঝড়ের ঝাপ্টা পশ্চাৎ ধাওয়া ;

এখানে সেখানে ফুল ফোটে আজ তোমাদের দেশে
কত রঙ, কত বিচিত্র নিশি দেখা দেয় এসে।
ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে কত ছেলেমেয়ে
এই বসন্তে কত উৎসব কত গান গেয়ে।
এখানে তো ফুল শুকানো, ধূসর রঙের ধুলোয়
খাঁ-খাঁ করে সারা দেশটা, শান্তি গিয়েছে চুলোয়
কঠিন রোদের ভয়ে ছেলেমেয়ে বন্ধ ঘরে,
সব চুপচাপ : জাগবে হয়তো বোশেখী ঝড়ে।
অনেক খাটুনি, অনেক লড়াই করার শেষে
চারিদিকে ক্রমে ফুলের বাগান তোমাদের দেশে ;
এদেশে যুদ্ধ, মহামারী, ভুখা জ্বলে হাড়ে হাড়ে—
অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মের মাঠে তাই ঘুম কাড়ে
বেপরোয়া প্রাণ ; জমে দিকে দিকে আজ লাখে লাখ-
তোমাদের দেশে মে-মাস ; এখানে ঝোড়ো বৈশাখ ॥

প্রস্তুত

কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়,
নানাদিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়
ভীত মন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ ;
তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ মর্তলোক,
কেবলি এখানে মনের দ্বন্দ্ব আগুন ছড়ায়।

অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোণে,
তীব্র ভ্রূকুটি হেনেছি কুটিল ফুলের বনে ;
অভিশাপময় যে সব আত্মা আজো অধীর,
তাদের সকাশে রেখেছি প্রাণের দৃঢ় শিবির ;
নিজেকে মুক্ত করেছি আত্মসমর্পণে ।

চাঁদের স্বপ্নে ধুয়ে গেছে মন যে সব দিনে,
তাদের আজকে শত্রু বলেই নিয়েছি চিনে,
হীন স্পর্ধারা ধূর্তের মতো শক্তিশেলে—
ছিনিয়ে আমায় নিতে পারে আজো সুযোগ পেলে
তাই সতর্ক হয়েছি মনকে রাখি নি ঋণে ।

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে ;
আজকে কিন্তু জনতা-জোয়ারে দোলে প্লাবন,
নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন,
করছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে ।

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই ;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখি নি মনেতে কোনো আসন,
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই ॥

প্রার্থী

হে সূর্য ! শীতের সূর্য !
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে ।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব !
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক-টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই !

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর—
এক-টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী ।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিকে যাই—
এক-টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায় ।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে ।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—

শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব।
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবু সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায় —
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত —
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

তারপর শুরু হ'লো তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা:
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।

তারপর একসময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার —
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দুতিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হ'য়ে।
— খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বার বার চেষ্টা ক'রলো প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে —
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার!'

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চ'লে এলো
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে;
অবশ্য খাবার খেতে নয় —
খাবার হিসেবে॥

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

তারপর শুরু হল তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা :
আশ্চর্য ! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার !

তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এল অংশীদার—
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

খাবার ! খাবার ! খানিকটা খাবার !
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেলে প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে—
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার'।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপ্‌ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে ;
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে ॥

সিঁড়ি

আমরা সিঁড়ি,
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে ;
তোমাদের পদধূলিধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।

তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত,
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।

তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন॥

কলম

কলম, তুমি কত না যুগ কত না কাল ধ'রে
অক্ষরে অক্ষরে
গিয়েছ শুধু ক্লান্তিহীন কাহিনী শুরু ক'রে।
কলম, তুমি কাহিনী লেখ, তোমার কাহিনী কি
দুঃখে জ্বলে তলোয়ারের মতন ঝিকিমিকি ?

কলম, তুমি শুধু বারংবার,
আনত ক'রে ক্লান্ত ঘাড়
গিয়েছ লিখে স্বপ্ন আর পুরনো কত কথা,
সাহিত্যের দাসত্বের ক্ষুধিত বশ্যতা।
ভগ্ন নিব, রুগ্ন দেহ, জলের মতো কালি,
কলম, তুমি নিরপরাধ তবুও গালাগালি
খেয়েছ আর সয়েছ কত লেখকদের ঘৃণা,
কলম, তুমি চেষ্টা কর, দাঁড়াতে পার কি না।

হে কলম ! তুমি কত ইতিহাস গিয়েছ লিখে
লিখে লিখে শুধু ছড়িয়ে দিয়েছ চতুর্দিকে।
তবু ইতিহাস মূল্য দেবে না, এতটুকু কোণ
দেবে না তোমায়, জেনো ইতিহাস বড়ই কৃপণ ;
কত লাঞ্ছনা, খাটুনি গিয়েছে লেখকের হাতে
ঘুমহীন চোখে অবিশ্রান্ত অজস্র রাতে।
তোমার গোপন অশ্রু তাইতো ফসল ফলায়
বহু সাহিত্য বহু কাব্যের বুকের তলায়।
তবু দেখ বোধ নেই লেখকের কৃতজ্ঞতা,
কেন চলবে এ প্রভুর খেয়ালে, লিখবে কথা ?

হে কলম ! হে লেখনী ! আর কত দিন
ঘর্ষণে ঘর্ষণে হবে ক্ষীণ ?
আর কত মৌন-মূক, শব্দহীন দ্বিধান্বিত বুকে
কালির কলঙ্ক চিহ্ন রেখে দেবে মুখে ?
আর, কত আর
কাটবে দুঃসহ দিন দুর্বার লজ্জার ?
এ দাসত্ব ঘুচে যাক, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ,
কাজ কর—কাজ।

মজুর দেখ নি তুমি ? হে কলম, দেখ নি বেকার ?
বিদ্রোহ দেখ নি তুমি ? রক্তে কিছু পাও নি শেখার ?
কত না শতাব্দী, যুগ থেকে তুমি আজো আছ দাস,
প্রত্যেক লেখায় শুনি কেবল তোমার দীর্ঘশ্বাস !
দিন নেই, রাত্রি নেই, শ্রান্তিহীন, নেই কোনো ছুটি,
একটু অবাধ্য হলে তখুনি ভ্রূকুটি ;
এমনি করেই কাটে দুর্ভাগা তোমার বারো মাস,
কয়েকটি পয়সায় কেনা, হে কলম, তুমি ক্রীতদাস।
তাই যত লেখ, তত পরিশ্রম এসে হয় জড়ো :
—কলম ! বিদ্রোহ আজ ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ ;
উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে,
কলম ! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে ;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে ॥

আগ্নেয়গিরি

কখনো হঠাৎ মনে হয় :
আমি এক আগ্নেয় পাহাড়।
শান্তির ছায়া-নিবড় গুহায় নিদ্রিত সিংহের মতো
চোখে আমার বহু দিনের তন্দ্রা।
এক বিস্ফোরণ থেকে আর এক বিস্ফোরণের মাঝখানে
আমাকে তোমরা বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছ বারংবার
আমি পাথর : আমি তা সহ্য করেছি।

মুখে আমার মৃদু হাসি,
বুকে আমার পুঞ্জীভূত ফুটন্ত লাভা।
সিংহের মতো আধ-বোজা চোখে আমি কেবলই দেখছি :
মিথ্যার ভিতে কল্পনার মশলায় গড়া তোমাদের শহর,
আমাকে ঘিরে রচিত উৎসবের নির্বোধ অমরাবতী,
বিদ্রূপের হাসি আর বিদ্বেষের আতস-বাজি—
তোমাদের নগরে মদমত্ত পূর্ণিমা।

দেখ, দেখ :
ছায়াঘন, অরণ্য-নিবিড় আমাকে দেখ ;
দেখ আমার নিরুদ্বিগ্ন বন্যতা।
তোমাদের শহর আমাকে বিদ্রূপ করুক,
কুঠারে কুঠারে আমার ধৈর্যকে করুক আহত,
কিছুতেই বিশ্বাস ক'রো না—
আমি ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার সহোদর।

তোমাদের কাছে অজ্ঞাত থাক
ভেতরে ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠা আমার অগ্ন্যুদ্‌গার,
অরণ্যে ঢাকা অন্তর্নিহিত উত্তাপের জ্বালা ।

তোমার আকাশে ফ্যাকাশে প্রেত আলো;
বুনো পাহাড়ে মৃত্যু-ধোঁয়ার অবগুণ্ঠন :
ও কিছু নয়, হয়তো নতুন এক মেঘদূত ।
উৎসব কর, উৎসব কর—
ভুলে যাও পেছনে আছে এক আগ্নেয় পাহাড়,
ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার জাগ্রত বংশধর ।

আর,
আমার দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি ॥

দুরাশার মৃত্যু

দ্বারে মৃত্যু,
বনে বনে লেগেছে জোয়ার,
পিছনে কি পথ নেই আর ?
আমাদের এই পলায়ন
জেনেছে মরণ,

অনুগামী ধূর্ত পিছে পিছে,
প্রস্থানের চেষ্টা হল মিছে।

দাবানল !
ব্যর্থ হল শুষ্ক অশ্রুজল,
বেনামী কৌশল
জেনেছে যে আরণ্যক প্রাণী
তাই শেষে নির্মূল বনানী ॥

ঠিকানা

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাও নি ? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান ?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটির গড়ি।
আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাই নাকো পথ,
তাইতো পথের নুড়িতে গড়ব
মজবুত ইমারত।

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে,
আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধ'রে
জেনো গচ্ছিত আছে।
আমাকে কি তুমি খুঁজেছ কখনো
সমস্ত দেশ জুড়ে ?
তবুও পাও নি ? তাহলে ফিরেছ
ভুল পথে ঘুরে ঘুরে।
আমার হৃদিশ জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছু দূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।
বন্ধু, কুয়াশা, সাবধান এই
সূর্যোদয়ের ভোরে ;
পথ হারিও না আলোর আশায়
তুমি একা ভুল ক'রে।

বন্ধু, আজকে জানি অস্থির
রক্ত, নদীর জল,
নীড়ে পাখি আর সমুদ্র চঞ্চল।
বন্ধু, সময় হয়েছে এখনো
ঠিকানা অবজ্ঞাত

বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এত ?
আর কতদিন দুচক্ষু কচ্‌লাবে,
জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধ'রে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে ।

বন্ধু, আজকে বিদায় !
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো

লেনিন

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ।

বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন—
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন,
কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার, চোখে মুখে চিহ্নিত মরণ।
বিপ্লব হয়েছে শুরু, পদানত জনতার ব্যগ্র গাত্রোত্থানে,
দেশে দেশে বিস্ফোরণ অতর্কিতে অগ্ন্যুৎপাত হানে।
দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি
আজো যায় শোনা,
দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।
পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে,
লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।
আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে
লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে ;
ইতালী, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।
অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভৎর্সনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।
লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।

মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন ॥

অনুভব

॥ ১৯৪০ ॥

অবাক পৃথিবী ! অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি ।
অবাক পৃথিবী ! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন ;
অবাক পৃথিবী ! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো ।
অবাক পৃথিবী ! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার ।
হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—'রক্ত খরচ' তাতে ;
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী ! সেলাম, তোমাকে সেলাম

॥ ১৯৪৬ ॥

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখে নি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ ? শুনছ উদ্দাম কলরব ?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ ! বিপ্লব চারিদিকে ॥

কাশ্মীর

সেই বিশ্রী দম-আটকানো কুয়াশা আর নেই
নেই সেই একটানা তুষার-বৃষ্টি,
হঠাৎ জেগে উঠেছে—
সূর্যের ছোঁয়ায় চমকে উঠেছে ভূস্বর্গ।

দুহাতে তুষারের পর্দা সরিয়ে ফেলে
মুঠো মুঠো হলদে পাতাকে দিয়েছে উড়িয়ে,
ডেকেছে রৌদ্রকে,
ডেকেছে তুষার-উড়িয়ে-নেওয়া বৈশাখী ঝড়কে,
পৃথিবীর নন্দন-কানন কাশ্মীর।

কাশ্মীরের সুন্দর মুখ কঠোর হল
প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপে।
গলে গলে পড়ছে বরফ —
ঝরে ঝরে পড়ছে জীবনের স্পন্দন :
শ্যামল আর সমতল মাটির
স্পর্শ লেগেছে ওর মুখে,
দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে ওর চুল :
আন্দোলিত শাল, পাইন আর দেবদারুর বনে
ঝড়ের পক্ষে আজ সুস্পষ্ট সম্মতি।
কাশ্মীর আজ আর জমাট-বাঁধা বরফ নয় :
সূর্য-করোত্তাপে জাগা কঠোর গ্রীষ্মে
হাজার হাজার চঞ্চল স্রোত।

তাই আজ কাল-বৈশাখীর পতাকা উড়ছে
ক্ষুব্ধ কাশ্মীরের উদ্দাম হাওয়ায় হাওয়ায় ;
দুলে দুলে উঠছে
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ
বিরাট ব্যাপ্ত হিমালয়ের অসহিষ্ণু বুক॥

॥ ২ ॥

দম-আটকানো কুয়াশা তো আর নেই
নেই আর সেই বিশ্রী তুষার-বৃষ্টি,
সূর্য ছুঁয়েছে 'ভূস্বর্গ চঞ্চল'
সহসা জেগেই চমকে উঠেছে দৃষ্টি।

দুহাতে তুষার-পর্দা সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ হলদে পাতাকে দিয়েছে উড়িয়ে,
রোদকে ডেকেছে নন্দনবন পৃথিবীর
বৈশাখী ঝড় দিয়েছে বরফ গুঁড়িয়ে।

সুন্দর মুখ কঠোর করেছে কাশ্মীর
তীক্ষ্ণ চাহনি সূর্যের উত্তাপে,
গলিত বরফে জীবনের স্পন্দন
শ্যামল মাটির স্পর্শেও আজ কাঁপে।

সাগর-বাতাসে উড়ছে আজ ওর চুল
শান্ত দেবদারু পাইনের বনে ক্ষোভ,
ঝড়ের পক্ষে চূড়ান্ত সম্মতি—
কাশ্মীর নয়, জমাট বাঁধা বরফ।

কঠোর গ্রীষ্মে সূর্যোত্তাপে জাগা—
কাশ্মীর আজ চঞ্চল-স্রোত লক্ষ;
দিগ্‌দিগন্তে ছুটে ছুটে চলে দুর্বার
দুঃসহ ক্রোধে ফুলে ফুলে ওঠে বক্ষ।

ক্ষুব্ধ হাওয়ায় উদ্দাম উঁচু কাশ্মীর
কালবোশেখীর পতাকা উড়ছে নভে,
দুলে দুলে ওঠে ঘুমন্ত হিমালয়
বহু যুগ পরে বুঝি জাগ্রত হবে ॥

সিগারেট

আমরা সিগারেট।
তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও না কেন ?
আমাদের কেন নিঃশেষ করো পুড়িয়ে ?
কেন এত স্বল্প-স্থায়ী আমাদের আয়ু ?
মানবতার কোন্ দোহাই তোমরা পাড়বে ?

আমাদের দাম বড় কম এই পৃথিবীতে।
তাই কি তোমরা আমাদের শোষণ করো ?
বিলাসের সামগ্রী হিসাবে ফেল পুড়িয়ে ?
তোমাদের শোষণের টানে আমরা ছাই হই
তোমরা নিবিড় হও আরামের উত্তাপে।

তোমাদের আরাম : আমাদের মৃত্যু !
এমনি ক'রে চলবে আর কত কাল ?
আর কতকাল আমরা এমন নিঃশব্দে ডাকব
আয়ু-হরণকারী তিল তিল অপঘাতকে ?

দিন আর রাত্রি —রাত্রি আর দিন :
তোমরা আমাদের শোষণ করছ সর্বক্ষণ—
আমাদের বিশ্রাম নেই, মজুরি নেই -
নেই কোনো অল্প মাত্রার ছুটি ।

তাই, আর নয় ;
আর আমরা বন্দী থাকব না
কৌটোয় আর প্যাকেটে
আঙুলে আর পকেটে ;
সোনা-বাঁধানো 'কেসে' আমাদের নিঃশ্বাস হবে না রুদ্ধ
আমরা বেরিয়ে পড়ব,
সবাই একজোটে, একত্রে—
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিট্‌কে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে ;
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের মেরেছ এতকাল ॥

দেশলাই কাঠি

আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়েব কাঠি
এত নগণ্য, হয়তো চোখেও পড়ি না :
তবু জেনো
মুখে আমার উসখুস কবছে বারুদ—
বুকে আমাব জ্বলে উঠবাব দুবন্ত উচ্ছ্বাস ,
আমি একটা দেশলাইয়েব কাঠি ।

মনে আছে সেদিন হুলুস্থুল বেধেছিল ?
ঘবের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন—
আমাকে অবজ্ঞাভরে না-নিভিয়ে ছুড়ে ফেলায় ।
কত ঘবকে দিযেছি পুড়িয়ে,
কত প্রাসাদকে কবেছি ধূলিসাৎ ,
আমি একাই—ছোট একটা দেশলাই কাঠি ।

এমনি বহু নগব, বহু বাজ্যকে দিতে পারি ছাবখাব করে
তবুও অবজ্ঞা করবে আমাদের ?
মনে নেই ? এই সেদিন—
আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাক্সে ;
চমকে উঠেছিলে—
আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখেব আর্তনাদ ।

আমাদের কী অসীম শক্তি
তা তো অনুভব করেছ বারংবার ;
তবু কেন বোঝ না,
আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে,

আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে।
আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—
তা তো তোমরা জানোই !
কিন্তু তোমরা তো জানো না :
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই—শেষবারের মতো।

বিবৃতি

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ ;
বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দুপাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন
নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন,
পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে।

দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল ;
রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,
বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে।

পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে,
বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে,
নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন,
ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকটনাশন।
সহসা অনেক রাত্রে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে
দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে

তবুও প্রতিজ্ঞা ফেরে বাতাসে নিভৃত,
এখানে চল্লিশ কোটি এখনো জীবিত,
ভারতবর্ষের 'পরে গলিত সূর্য ঝরে আজ—
দিগ্বিদিকে উঠেছে আওয়াজ,
রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
উদ্ধত প্রাণের বেগে উন্মুখর আমার এ দেশ,
আমার বিধ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তার এসেছে নির্দেশ।

আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে

আজকে আসন্ন মুক্তি দূর থেকে দৃষ্টি দেয় শ্যেন,
এদেশে ভাণ্ডার ভ'রে দেবে জানি নতুন য়ুক্রেন।

নিরন্ন আমার দেশে আজ তাই উদ্ধত জেহাদ,
টলোমলো এ দুর্দিন, থরোথরো জীর্ণ বনিয়াদ।
তাইতো রক্তের স্রোতে শুনি পদধ্বনি
বিক্ষুব্ধ টাইফুন-মত্ত চঞ্চল ধমনী :
বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা॥

চিল

পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম :
ফুটপাতে এক মরা চিল !

চমকে উঠলাম ওর করুণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে
লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ ;
যার শ্যেনদৃষ্টিতে কেবল ছিল
তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি—
তাকে দেখলাম, ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।

গম্বুজশিখরে বাস করত এই চিল,
নিজেকে জাহির করত সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে ;
হালকা হাওয়ায় ডানা মেলে দিত আকাশের নীলে—
অনেককে ছাড়িয়ে ; একক :
পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে ।

অনেকে আজ নিরাপদ ;
নিরাপদ ইঁদুর ছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী,
নিরাপদ—কারণ আজ সে মৃত ।
আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারার,
ওরই ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো
ও পড়ে রইল ফুটপাতে,
শুক্‌নো, শীতল, বিকৃত দেহে ।

হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—
তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে ;
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশচ্যুত এক উদ্ধত চিলকে ॥

চট্টগ্রাম : ১৯৪৩

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম—
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম !
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎপ্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন ;
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম
এখনো নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার
দুঃসহ মহড়া চলে,
তাই আজো শত্রুরা সাহসী ।
জানি আমি তোমার হৃদয়ে
অজস্র ঔদার্য আছে ; জানি আছে সুস্থ শালীনতা
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
এখনও স্তিমিত নও, জানি তুমি এখনো উদ্দাম—
হে চট্টগ্রাম !

তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দুলের ঘুম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর ।
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
এখনো হয় নি নিরাপদ ।
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ ।

তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম॥

[illegible]

পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে,
আজকে সকলে ভুগছে একযোগে,
এখানে খানিক তারই পূর্বাভাস
পাচ্ছি, এখন বইছে পুব-বাতাস।
উপায় নেই যে সামলে ধরব হাল,
হিংস্র বাতাসে ছিঁড়ল আজকে পাল
গোপনে আগুন বাড়ছে ধানক্ষেতে,
বিদেশী খবরে রেখেছি কান পেতে,
সভয়ে এদেশে কাটছে রাত্রিদিন,
লুব্ধ বাজারে রুগ্ন স্বপ্নহীন।
সহসা নেতারা রুদ্ধ—দেশ জুড়ে
'দেশপ্রেমিক' উদিত ভুঁই ফুঁড়ে।
প্রথমে তাদের অন্ধ বীর মদে
মেতেছি এবং ঠকেছি প্রতিপদে;
দেখেছি সুবিধা নেই এ কাজ করায়
একক চেষ্টা কেবলই ভুল ধরায়।

এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে
আবার বোমারু রক্ত পান করে,
ক্ষুব্ধ জনতা আসামে, চাটগাঁয়ে,
শাণিত দ্বৈত নগ্ন অন্যায়ে ;
তাদের স্বার্থে আমার স্বার্থকে,
দেখছে চেতনা আজকে এক চোখে ॥

৫

সেপ্টেম্বর '৪৬

কলকাতায় শান্তি নেই।
রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
প্রতিটি সন্ধ্যায়।
হৃৎস্পন্দনধ্বনি দ্রুত হয় :
মূর্ছিত শহর
এখন গ্রামের মতো
সন্ধ্যা হলে জনহীন নগরের পথ ;
স্তম্ভিত আলোকস্তম্ভ
আলো দেয় নিতান্ত সভয়ে।
কোথায় দোকানপাট ?
কই সেই জনতার স্রোত ?
সন্ধ্যার আলোর বন্যা
আজ আর তোলে নাকো
জনতরণীর পাল
শহরের পথে।

ট্রাম নেই, বাস নেই—
সাহসী পথিকহীন
এ শহর আতঙ্ক ছড়ায়।
সারি সারি বাড়ি সব
মনে হয় কবরের মতো,
মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে আছে
চুপ ক'রে সভয়ে নির্জনে।
মাঝে মাঝে শব্দ হয়!
মিলিটারী লরীর গর্জন
পথ বেয়ে ছুটে যায় বিদ্যুতের মতো
সদম্ভ আক্রোশে।
কলঙ্কিত কালো কালো রক্তের মতন
অন্ধকার হানা দেয় অতন্দ্র শহরে;
হয়তো অনেক রাত্রে
পথচারী কুকুরের দল
মানুষের দেখাদেখি
স্বজাতিকে দেখে
আস্ফালন, আক্রমণ করে।
রুদ্ধশ্বাস এ শহর
ছটফট করে সারা রাত—
কখন সকাল হবে?
জীয়নকাঠির স্পর্শ
পাওয়া যাবে উজ্জ্বল রোদ্দুরে?
সন্ধ্যা থেকে প্রত্যূষের দীর্ঘকাল
প্রহরে প্রহরে
সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ঘড়ির ঘণ্টায়

ধৈর্যহীন শহরের প্রাণ :
এর চেয়ে ছুরি কি নিষ্ঠুর ?
বাদুড়ের মতো কালো অন্ধকার
ভর ক'রে গুজবের ডানা
উৎকর্ণ কানের কাছে
সারারাত ঘুরপাক খায়।
স্তব্ধতা কাঁপিয়ে দিয়ে
কখনো বা গৃহস্থের দ্বারে
উদ্ধত, অটল আর সুগম্ভীর
শব্দ ওঠে কঠিন বুটের।

শহর মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

জুলাই! জুলাই! আবার আসুক ফিরে
আজকের কলকাতার এ প্রার্থনা ;
দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল—
এখনো পায়ের শব্দ যাচ্ছে শোনা।

অক্টোবরকে জুলাই হতেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে,
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে॥

ঐতিহাসিক

আজ এসেছি তোমাদের ঘরে ঘরে—
পৃথিবীর আদালতের পরোয়ানা নিয়ে
তোমরা কি দেবে আমার প্রশ্নের কৈফিয়ৎ :
কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল ?
আজ বাহান্ন সালের সূচনায় কি তার উত্তর দেবে ?
জানি ! স্তব্ধ হয়ে গেছে তোমাদের অগ্রগতির স্রোত,
তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছ ভবিষ্যৎ
আর অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।
কিন্তু ভেবে দেখেছ কি ?
দেরি হয়ে গেছে অনেক, অনেক দেরি !
লাইনে দাঁড়ান অভ্যেস কর নি কোনোদিন,
একটি মাত্র লক্ষ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
মারামারি করেছ পরস্পর,
তোমাদের ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখে
বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তির দোকানের ঝাঁপ।
কেবল বঞ্চিত বিহ্বল বিমূঢ় জিজ্ঞাসাভরা চোখে
প্রত্যেকে চেয়েছ প্রত্যেকের দিকে ;
—কেন এমন হল ?

একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।

চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন ?
এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন
মূর্খ তোমরা
লাইন দিলে : কিন্তু মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু,
রক্তক্ষয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা ।
ইতিমধ্যে তোমাদের বিবদমান বিশৃঙ্খল ভিড়ে
মুক্তি উঁকি দিয়ে গেছে বহুবার ।

লাইনে দাঁড়ান আয়ত্ত করেছে যারা,
সোভিয়েট, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স
রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি
সব প্রথম এই পৃথিবীর দোকান থেকে ।
এখনো এই লাইনে অনেকে প্রতীক্ষমান,
প্রার্থী অনেক ; কিন্তু পরিমিত মুক্তি ।
হয়তো এই বিশ্বব্যাপী লাইনের শেষে
এখনো তোমাদের স্থান হতে পারে—
এ কথা ঘোষণা ক'রে দাও তোমাদের দেশময়
প্রতিবেশীর কাছে ।
তারপর নিঃশব্দে দাঁড়াও এ লাইনে প্রতিজ্ঞা
আর প্রতীক্ষা নিয়ে
হাতের মুঠোয় তৈরী রেখে প্রত্যেকের প্রাণ ।
আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,
মনে রেখো, দেরি হয়ে গেছে, অনেক অনেক দেরি ।

আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন'।

শত্রু এক

এদেশ বিপন্ন আজ ; জানি আজ নিরন্ন জীবন
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আল্পনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ সুর ;
তবুও সুদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু : এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।
কঠিন প্রতিজ্ঞা-স্তব্ধ আমাদের দৃপ্ত কারখানায়,
প্রত্যেক নির্বাক যন্ত্র প্রতিরোধ সংকল্প জানায়।
আমার হাতের স্পর্শে প্রতিদিন যন্ত্রের গর্জন
স্মরণ করায় পণ ; অবসাদ দিই বিসর্জন।
বিক্ষুব্ধ যন্ত্রের বুকে প্রতিদিন যে যুদ্ধ ঘোষণা,
সে যুদ্ধ আমার যুদ্ধ, তারই পথে স্তব্ধ দিন গোনা
অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্র দিন, জয়োন্মত্ত পাখা—
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।
আমার বেগান্ধ হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব
প্রচুর প্রচুর সৃষ্টি, শেষ বজ্র সৃষ্টির উৎসব॥

মজুরদের ঝড়

(ল্যাংস্টন হিউজ)

এখন এই তো সময়—
কই ? কোথায় ? বেরিয়ে এসো ধর্মঘটভাঙা দালালরা ;
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদ্‌লায়,
বেরিয়ে এসো !
জাহান্নমে যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য
পরাজয় আর মৃত্যুর দূত—
বেরিয়ে এসো !
বেরিয়ে এসো শক্তিমান আর অর্থলোভীর দল
সংকীর্ণ গলির বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে।
গর্তের পোকারা !
এই তো তোমাদের শুভক্ষণ,
গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো—
আর বেরিয়ে পড়ো ছোট ছোট সাপেরা
বড় আর মোটা সাপেদের যারা ঘিরে থাকো।
সময় হয়েছে,
আসরফি আর পুরনো অপমানের বদলে
সাদা যাদের পেট—
বংশগত সরীসৃপ দাঁত তারা বের করুক,
এই তো তাদের সুযোগ।
মানুষ ভালো করেই জানে

অনেক মানুষের বিরুদ্ধে একজনকে লাগানোর সেই
পুরনো কায়দা।
সামান্য কয়েকজন লোভী
অনেক অভাবীর বিরুদ্ধে—
আর স্বাস্থ্যবানদের বিরুদ্ধে
ক্ষয়ে-যাওয়ার দল।
সূর্যালোকের পথে যাদের যাত্রা
তাদের বিরুদ্ধে তাই সাপেরা।

অতীতে অবশ্য এই সাপেরা জিতেছে বহুবার।

কিন্তু এখন সেই সময়,
সচেতন মানুষ! এখন আর ভুল ক'রো না--
বিশ্বাস ক'রো না সেই সব সাপেদের
জমকালো চামড়ায় যারা নিজেদের ঢেকে রাখে,
বিপদে পড়লে যারা ডাকে
তাদের চেয়ে কম চটকদার বিষাক্ত অনুচরদের।
এতটুকু লজ্জা হয় না তাদের ধর্মঘট ভাঙতে
যে ধর্মঘট বে-আব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন।

—অবশ্য, এখনো কোনো সম্মানিত প্রতিষ্ঠান হয় নি
যার অজ্ঞাত নাম :
"ধর্মঘট ভাঙার দল"
অন্তত দরজায় সে নাম লেখা থাকে না।

ঝড় আসছে—সেই ঝড় :
যে ঝড় পৃথিবীর বুক থেকে জঞ্জালদের টেনে তুলবে
আর হুঁশিয়ার মজুর :
সে ঝড় প্রায় মুখোমুখি ॥

ডাক

মুখে-মৃদু-হাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না। ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে, উদ্ধত তবু মাথা—
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা,
শোনো, হুঙ্কার কোটি অবরুদ্ধের।

দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও—
সন্ধিপত্র মাড়াও, দুপায়ে মাড়াও।
তিন-পতাকার মিনতি : দেবে না সাড়াও ?
অসহ্য জ্বালা কোটি কোটি ক্রুদ্ধের।

ক্ষতবিক্ষত নতুন সকাল বেলা,
শেষ করব এ রক্তের হোলিখেলা,
ওঠো সোজা হয়ে, পায়ে পায়ে লাগে ঠেলা
দেখ, ভিড় দেখ স্বাধীনতালুব্ধের।

ফাল্গুন মাস, ঝরুক জীর্ণ পাতা
গজাক নতুন পাতারা, তুলুক মাথা,
নতুন দেয়াল দিকে দিকে হোক গাঁথা—
জাগে বিক্ষোভ চারিপাশে ক্ষুব্ধের।

হ্রদে তৃষ্ণার জল পাবে কত কাল ?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল ;
তুমি কোন্ দলে ?   জিজ্ঞাসা উদ্দাম :
'গুণ্ডা'র দলে আজো লেখাও নি নাম ?

বোধন

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার ;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি ;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,

ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

ব্যাহত জীবনযাত্রা, চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী! আজ শুধু মনে মনে ধুঁকে
ভেবেছ সংসারসিন্ধু কোনোমতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।
তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি ক'রে যারা গুপ্তকক্ষতে জমায়
তাদেরি দুপায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায়;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজ ও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছ হাত; আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিষ্ফল—
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।
তুমি তো প্রহর গোনো,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি,
তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ; শূন্য মাঠে কঙ্কাল-করোটি
তোমাকে বিদ্রূপ করে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে—
কুজ্ঝটি তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে।

পৃথিবী উদাস, শোনো হে দুনিয়াদার!
সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু কালো পাহাড়
দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার:

কি করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার—
এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার ?

লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি ; উজাড় গ্রাম।
সুদ ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধশেষের প্রাপ্য চাই।

কৃপণ পৃথিবী, লোভের অস্ত্র
দিয়ে কেড়ে নেয় অন্নবস্ত্র,
লোলুপ রসনা মেলা পৃথিবীতে
বাড়াও ও-হাত তাকে ছিঁড়ে নিতে
লোভের মাথায় পদাঘাত হানো—
আনো, রক্তের ভাগীরথী আনো।
দৈত্যরাজের যত অনুচর
মৃত্যুর ফাঁদ পাতে পর পর ;
মেলো চোখ আজ, ভাঙো সে ফাঁদ-
হাঁকো দিকে দিকে সিংহনাদ।
তোমার ফসল, তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণকাঠি
তোমার চেতনা চালিত হাতে।
এখনও কাঁপবে আশঙ্কাতে ?
স্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখি
মারণমন্ত্র বলে, শোনো তা কি ?
এখনো কি তুমি আমি স্বতন্ত্র ?
করো আবৃত্তি, হাঁকো সে মন্ত্র :

শোন্‌ রে মালিক, শোন্‌ রে মজুতদার !
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার ?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্‌ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।
তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতের কোনো যাদুঘরে
নৃতত্ত্ববিদ্‌ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার
তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিল কি ?   জবাব মেলে না তার।

আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়,
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড় ;
আজকের নৈঃশব্দ্য হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।

দুহাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো :

হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার-গলানো উত্তাপ।
টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ঙ্কর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর ;
তা যদি না হয়, বুঝব তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয় নি জল.
দেয় নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই ॥

রানার

রানার ছুটেছে তাই ঝুম্‌ঝুম্‌ ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে, রানার !
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার ।

রানার ! রানার !
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে স'রে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্‌ ক'রে চায় :
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায় !
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে,
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌, জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার ! এখনো রাতের কালো।

'এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'

ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,—
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে—আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;

শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে-
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার ॥

●

মৃত্যুজয়ী গান

নিয়ত দক্ষিণ হাওয়া স্তব্ধ হল একদা সন্ধ্যায়
অজ্ঞাতবাসের শেষে নিদ্রাভঙ্গে নির্বীর্য জনতা
সহসা আরণ্য রাজ্যে স্তম্ভিত সভয়ে;
নির্বায়ুমণ্ডল ক্রমে দুর্ভাবনা দৃঢ়তর করে।
দূরাগত স্বপ্নের কী দুর্দিন। মহামারী অন্তরে বিক্ষোভ
সঞ্চারিত রক্তবেগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে:
অবসন্ন বিলাসের সঙ্কুচিত প্রাণ।

বণিকের চোখে আজ কী দুরন্ত লোভ ঝ'রে পড়ে:
মুহুর্মুহু রক্তপাতে স্বধর্ম সূচনা;
ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায়।
নশ্বর পৌষদিন, চারিদিকে ধূর্তের সমতা
জটিল আবর্তে শুধু নৈমিত্তিক প্রাণের স্পন্দন;

শোকাচ্ছন্ন আমাদের সনাতন মন
পৃথিবীর সম্ভাবিত অকাল মৃত্যুতে।
দুর্দিনের সমন্বয়, সম্মুখেতে অনন্ত প্রহর—
দৃষ্টিপথ অন্ধকার, সন্দিহান আগামী দিনেরা
গলিত উদ্যম তাই বৈরাগ্যের ভান,
কণ্টকিত প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্যবাসর।

সহসা জানলায় দেখি দুর্ভিক্ষের স্রোতে
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ—
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে ;
সে মিছিলে শোনা গেল
জনতার মৃত্যুজয়ী গান ॥

●

কনভয়

হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল
যুদ্ধফেরত এক কনভয় :
ক্ষেপে-ওঠা পঙ্গপালের মতো
রাজপথ সচকিত ক'রে।
আগে আগে কামান উঁচিয়ে,
পেছনে নিয়ে খাদ্য আর রসদের সম্ভার

ইতিহাসের ছাত্র আমি,
জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম

ইতিহাসেরই দিকে।
সেখানেও দেখি উন্মত্ত এক কনভয়
ছুটে আসছে যুগযুগান্তের রাজপথ বেয়ে।
সামনে ধূমোদ্গীরণরত কামান,
পেছনে খাদ্যশস্য আঁকড়ে-ধরা জনতা—
কামানের ধোঁয়ার আড়ালে আড়ালে দেখলাম,
মানুষ।
আর দেখলাম ফসলের প্রতি তাদের পুরুষানুক্রমিক
মমতা।
অনেক যুগ, অনেক অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে
তারা এগিয়ে আসছে: ঝল্‌সানো কঠোর মুখে।

ফসলের ডাক : ১৩৫১

কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।

শক্তির উন্মুক্ত হাওয়া আমার পেশীতে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি চেতনার বিদ্যুৎ বিকাশ :
দুপায়ে অস্থির আজ বলিষ্ঠ কদম ;
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

দুচোখে আমার আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন,
নিঃশব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার

মৌশুমী হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক :
শহরের চুল্লী ঘিরে পতঙ্গের কানে।

বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে,
মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ ;
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।
মনে আছে একদিন তোমাদের ঘরে
নবান্ন উজাড় ক'রে পাঠিয়েছি সোনার বছরে,
নির্ভাবনার হাসি ছড়িয়েছি মুখে
তৃপ্তির প্রগাঢ় চিহ্ন এনেছি সম্মুখে,
সেদিনের অলক্ষ সেবার বিনিময়ে
আজ শুধু কাস্তে দাও আমাব এ হাতে।

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে.
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্যপ্রখর—
যে কাস্তে ঝল্‌সাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।

জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও.দ্বারে,
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাণ্ডারে ;
তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

পরাস্ত অনেক চাষী ; ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ—
জলন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ,
তাদের ফসল প'ড়ে,দৃষ্টি জলে সুদূরসন্ধানী

তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপি চুপি করে কানাকানি—
আমাকেই কাস্তে নিতে হবে।
নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত :

তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে ॥

কৃষকের গান

এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে
এইবার ফলাব ফসল—
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন।
এ মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুপুষ্ট ইঙ্গিতে :
দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর।
আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি ?
(গোপন একান্ত এক পণ)
এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।
ঘনায় ভাঙন দুই চোখে
ধ্বংসস্রোত জনতা জীবনে ;

আমার প্রতিজ্ঞা গ'ড়ে তোলে
ক্ষুধিত সহস্র হাতছানি।
দুয়ারে শত্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস।
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ॥

এই নবান্নে

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—
পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান
তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায় :
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায় ;
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন ;
নিজের হাতের জমি ধান-বোনা
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসে নি শুভক্ষণ—
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।

এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,

পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বচন—
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে : কোথায় আপনজন ?
তারা কি কেবল লুকোনো থাকবে,
অক্ষমতার গ্লানিকে ঢাকবে,
প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ করেছে উচ্চারণ ?

এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ ?

আঠারো বছর বয়স

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত ; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়েসে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে

হে মহাজীবন

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো !
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি ॥

ঘুমনেই

বিক্ষোভ

দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম,
হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানলাম।
জানে না তো কেউ পৃথিবী উঠছে কেঁপে
ধরেছে মিথ্যা সত্যের টুঁটি চেপে,
কখনো কেউ কি ভূমিকম্পের আগে
হাতে শাঁখ নেয়, হঠাৎ সবাই জাগে ?
যারা আজ এত মিথ্যার দায়ভাগী,
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।
ইতিহাস, জানি নীরব সাক্ষী তুমি,
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশভূমি,
অনেকে বিরূপ, কানে দেয় হাত চাপা,
তাতেই কি হয় আসল নকল মাপা ?
বিদ্রোহী মন !   আজকে ক'রো না মানা,
দেব প্রেম আর পাব কলসীর কাণা,
দেব, প্রাণ দেব মুক্তির কোলাহলে,
জীন্ ডার্ক, যীশু, সোক্রাটিসের দলে।
কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,
ততদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।
ইতিহাস !   নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ ॥

১লা মে-র কবিতা '৪৬

লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায় ?
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে ?
মনের কথা ব্যক্ত করবে
ক্ষীণ অস্পষ্ট কেঁউ-কেঁউ শব্দে ?
ক্ষুধিত পেটে ধুঁকে ধুঁকে চলবে কত দিন ?
ঝুলে পড়া তোমার জিভ,
শ্বাসে প্রশ্বাসে ক্লান্তি টেনে কাঁপতে থাকবে কত কাল ?
মাথায় মৃদু চাপড় আর পিঠে হাতের স্পর্শে
কতক্ষণ ভুলে থাকবে পেটের ক্ষুধা আর গলার শিকলকে ?
কতক্ষণ নাড়তে থাকবে লেজ ?

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝল্‌সানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে॥

পরিখা

স্বচ্ছ রাত্রি এনেছে প্লাবন, উষ্ণ নিবিড
ধূলিদাপটের মরুচ্ছায়ায় ঘনায় নীল।
ক্লান্ত বুকের হৃৎস্পন্দন ক্রমেই ধীর
হয়ে আসে তাই শেষ সম্বল তোলো পাঁচিল
ক্ষণভঙ্গুর জীবনের এই নির্বিরোধ
হতাশা নিয়েই নিত্য তোমার দাদন শোধ ?

শ্রান্ত দেহ কি ভীরু বেদনার অন্ধকূপে
ডুবে যেতে কাঁদে মুক্তিমায়ায় ইতস্তত ;
কত শিখণ্ডী জন্ম নিয়েছে নূতন রূপে ?
দুঃস্বপ্নের প্রায়শ্চিত্ত চোরের মতো।
মৃত ইতিহাস অশুচি ঘুচায় ফল্গু-স্নানে ;
গন্ধবিধুর রুধির তবুও জোয়ার আনে।

পথবিভ্রম হয়েছে এবার, আসন্ন মেঘ।
চলে ক্যারাভান ধূসর আঁধারে অন্ধগতি,
সরীসৃপের পথ চলা শুরু প্রমত্ত বেগ
জীবন্ত প্রাণ, বিবর্ণ চোখে অসম্মতি।
অরণ্য মাঝে দাবদাহ কিছু যায় না রেখে
মনকে বাঁচাও বিপন্ন এই মৃত্যু থেকে।

সঙ্গীবিহীন দুর্জয় এই পরিভ্রমণ
রক্তনেশায় এনেছে কেবলই সুখাস্বাদ,
এইবার করো মেরুদুর্গম পরিখা খনন
বাইরে চলুক অযথা অধীর মুক্তিবাদ।

দুর্গম পথে যাত্রী সওয়ার ভ্রান্তিবিহীন
ফুরিয়ে এসেছে তন্দ্রানিঝুম ঘুমন্ত দিন।

পালাবে বন্ধু? পিছনে তোমার ধূমন্ত ঝড়
পথ নির্জন, রাত্রি বিছানো অন্ধকারে।
চলো, আরো দূরে? ক্ষুধিত মরণ নিরন্তর,
পুরনো পৃথিবী জেগেছে আবার মৃত্যুপারে,
অহেতুক তাই হয় নি তোমার পরিখা খনন,
থেমে আসে আজ বিড়ম্বনায় শ্রান্ত চরণ

মরণের আজ সর্পিল গতি বক্রবধির—
পিছনে ঝটিকা, সামনে মৃত্যু রক্তলোলুপ।
বারুদের ধূম কালো ছায়া আনে,—তিক্ত রুধির;
পৃথিবী এখনো নির্জন নয়,—জ্বলন্ত ধূপ।
নৈঃশব্দ্যের তীরে তীরে আজ প্রতীক্ষাতে
সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে অস্ত্র হাতে॥

●

সব্যসাচী

অভুক্ত শ্বাপদচক্ষু নিঃস্পন্দ আঁধারে
জ্বলে রাত্রিদিন।
হে বন্ধু, পশ্চাতে ফেলি অন্ধ হিমগিরি
অনন্ত বার্ধক্য তব ফেলুক নিঃশ্বাস;

রক্তলিপ্ত যৌবনের অন্তিম পিপাসা
নিষ্ঠুর গর্জনে আজ অরণ্য ধোঁয়ায়
উঠুক প্রজ্বলি"।
সপ্তরথী শোনে নাকো পৃথিবীর শৈশবক্রন্দন,
দেখে নাই নির্বাকের অশ্রুহীন জ্বালা।
দ্বিধাহীন চণ্ডালের নির্লিপ্ত আদেশে
আদিম কুক্কুর চাহে
ধরণীর বস্ত্র কেড়ে নিতে।
উল্লাসে লেলিহজিহ্ব লুব্ধ হায়েনারা—
তবু কেন কঠিন ইস্পাত ?
জরাগ্রস্ত সভ্যতার হৃৎপিণ্ড জর্জর,
ক্ষুৎপিপাসা চক্ষু মেলে
মরণের উপসর্গ যেন।
স্বপ্নলব্ধ উদ্যমের অদৃশ্য জোয়ারে
সংঘবদ্ধ বল্মীকের দল!

নেমে এসো—হে ফাল্গুনী,
বৈশাখের খরতপ্ত তেজে
ক্লান্ত দুবাহু তব লৌহময় হোক
বয়ে যাক শোণিতের মন্দাকিনী স্রোত ;
মুমূর্ষু পৃথিবী উষ্ণ, নিত্য তৃষাতুরা,
নির্বাপিত আগ্নেয় পর্বত
ফিরে চায় অনর্গল বিলুপ্ত আতপ।
আজ কেন সুবর্ণ শৃঙ্খলে
বাঁধা তব রিক্ত বজ্রপাণি,
তুষারের তলে সুপ্ত অবসন্ন প্রাণ ?

তুমি শুধু নহ সব্যসাচী,
বিস্মৃতির অন্ধকার পারে
ধূসর গৈরিক নিত্য প্রান্তহীন বেলাভূমি 'পরে
আত্মভোলা, তুমি ধনঞ্জয়।

উর্দ্ধ্বীক্ষণ

নগরে ও গ্রামে জমেছে ভিড়
ভগ্ননীড়,—
ক্ষুধিত জনতা আজ নিবিড়।
সমুদ্রে জাগে বাড়বানল,
কী উচ্ছল,
তীরসন্ধানী ব্যাকুল জল।
কখনো হিংস্র নিবিড় শোকে,
দাঁতে ও নখে—
জাগে প্রতিজ্ঞা অন্ধ চোখে।
তবু সমুদ্র সীমানা রাখে,
দুর্বিপাকে
দিগন্তব্যাপী প্লাবন ঢাকে।
আসন্ন ঝড়ে অরণ্যময়
যে বিস্ময়
ছড়াবে, তার কি অযথা ক্ষয়?
দেশে ও বিদেশে লাগে জোয়ার,
ঘোড়সোয়ার

চিনে নেবে পথ দৃঢ় লোহার,
যে পথে নিত্য সূর্যোদয়
আনে প্রলয়,
সেই সীমান্তে বাতাস বয় ;
তাই প্রতীক্ষা—ঘনায় দিন
স্বপ্নহীন ॥

বিদ্রোহের গান

বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি ?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক ।

উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরিবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌঁছোক দ্বারে ;
ভীরুরা থাক ।

মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি,
সাধ্য কার ?

রুটি দেবে নাকো ?   দেবে না অন্ন ?
এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন ?
চোখ-রাঙানিকে করি না গণ্য
ধারি না ধার।

খ্যাতির মুখেতে পদাঘাত করি,
গড়ি, আমরা যে বিদ্রোহ গড়ি,
ছিঁড়ি দুহাতের শৃঙ্খলদড়ি,
মৃত্যুপণ।

দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্বকোণ।

ছিঁড়ি, গোলামির দলিলকে ছিঁড়ি,
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি
খুঁজি কোনখানে স্বর্গের সিঁড়ি,
কোথায় প্রাণ!

দেখব, ওপরে আজো আছে কারা,
খসাব আঘাতে আকাশের তারা,
সারা দুনিয়াকে দেব শেষ নাড়া,
ছড়াব ধান।
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান॥

অনন্যোপায়

অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ বহু উদ্যম আমার,
নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতী ঘরে, নিঃশব্দ কামার,
অর্ধেক প্রাসাদ তৈরী, বন্ধ ছাদ-পেটানোর গান,
চাষীর লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান।
যতবার গড়ে তুলি, ততবার চকিত বন্যায়
উদ্যত সৃষ্টিকে ভাঙে পৃথিবীতে অবাধ অন্যায়।
বার বার ব্যর্থ তাই আজ মনে এসেছে বিদ্রোহ,
নির্বিঘ্নে গড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেছে ; ছিন্নভিন্ন মোহ।
আজকে ভাঙার স্বপ্ন,—অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্য পথ দেখি নাকো আর।
তাইতো তন্দ্রাকে ভাঙি, ভাঙি জীর্ণ সংস্কারের খিল,
রুদ্ধ বন্দীকক্ষ ভেঙে মেলে দিই আকাশের নীল।
নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও ? তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে,
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে ॥

অভিবাদন

হে সাথী, আজকে স্বপ্নের দিন গোনা
ব্যর্থ নয় তো, বিপুল সম্ভাবনা
দিকে দিকে উদ্‌যাপন করছে লগ্ন,
পৃথিবী সূর্য-তপস্যাতেই মগ্ন।

আজকে সামনে নিরুচ্চারিত প্রশ্ন,
মনের কোমল মহল ঘিরে কবোষ্ণ ;
ক্রমশ পুষ্ট মিলিত উন্মাদনা,
ক্রমশ সফল স্বপ্নের দিন গোনা।

স্বপ্নের বীজ বপন করেছি সদ্য,
বিদ্যুৎবেগে ফসল সংঘবদ্ধ !
হে সাথী, ফসলে শুনেছো প্রাণের গান ?
দুরন্ত হাওয়া ছড়ায় ঐকতান।

বন্ধু, আজকে দোদুল্যমান পৃথ্বী,
আমরা গঠন করব নতুন ভিত্তি ;
তারই সূত্রপাতকে করেছি সাধন,
হে সাথী, আজকে রক্তিম অভিবাদন ॥

৩

জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী

কত যুগ, কত বর্ষান্তের শেষে
জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী :
আকাশে মেঘের তাড়াহুড়ো দিকে দিকে
বজ্রের কানাকানি।

সহসা ঘুমের তল্লাট ছেড়ে
শান্তি পালাল আজ।
দিন ও রাত্রি হল অস্থির
কাজ, আর শুধু কাজ!
জনসিংহের ক্ষুব্ধ নখর
হয়েছে তীক্ষ্ণ, হয়েছে প্রখর
ওঠে তার গর্জন—
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!
হাজার হাজার শহীদ ও বীর
স্বপ্নে নিবিড় স্মরণে গভীর
ভুলি নি তাদের আত্মবিসর্জন।
ঠোঁটে ঠোঁটে কাঁপে প্রতিজ্ঞা দুর্বোধ:
কানে বাজে শুধু শিকলের ঝন্‌ঝন্‌;
প্রশ্ন নয়কো পারা না পারার,
অত্যাচারীর রুদ্ধ কারার
দ্বার ভাঙা আজ পণ;
এতদিন ধ'রে শুনেছি কেবল শিকলের ঝন্‌ঝন্‌।
ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়,
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর;
ওদের স্মৃতিরা শিরায় শিরায়
কে আছে আজকে ওদের ফিরায়
কে ভাবে ওদের পর?
ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়!

নিদ্রায়, কাজকর্মের ফাঁকে
ওরা দিনরাত আমাদের ডাকে
ওদের ফিরাব কবে ?
কবে আমাদের বাহুর প্রতাপে
কোটি মানুষের দুর্বার চাপে
শৃঙ্খল গত হবে ?
কবে আমাদের প্রাণকোলাহলে
কোটি জনতার জোয়ারের জলে
ভেসে যাবে কারাগার !
কবে হবে ওরা দুঃখসাগর পার ?
মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি ;
ওরা আমাদের রক্ত দিয়েছে,
বদলে দুহাতে শিকল নিয়েছে
গোপনে করেছে ঋণী ।
মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি !
হে খাতক নির্বোধ,
রক্ত দিয়েই সব ঋণ করো শোধ !
শোনো, পৃথিবীর মানুষেরা শোনো,
শোনো স্বদেশের ভাই,
রক্তের বিনিময় হয় হোক
আমরা ওদের চাই ॥

কবিতার খসড়া

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়,
জানে না কেউ।

উদ্যমহীন মূঢ় কারায়
পুরনো বুলির মাছি তাড়ায়
যারা, তারা নিয়ে ঘোরে পাড়ায়
স্মৃতির ফেউ ॥

আমরা এসেছি

কারা যেন আজ দুহাতে খুলেছে, ভেঙেছে খিল,
মিছিলে আমরা নিমগ্ন তাই দোলে মিছিল।
দুঃখ-যুগের ধারায় ধারায়
যারা আনে প্রাণ, যারা তা হারায়
তারাই ভরিয়ে তুলেছে সাড়ায় হৃদয়-বিল।
তারাই এসেছে মিছিলে, আজকে চলে মিছিল ॥

কে যেন ক্ষুব্ধ ভোমরার চাকে ছুঁড়েছে ঢিল,
তাইতো দগ্ধ, ভগ্ন, পুরনো পথ বাতিল।

আশ্বিন থেকে বৈশাখে যারা
হাওয়ার মতন ছুটে দিশেহারা,
হাতের স্পর্শে কাজ হয় সারা, কাঁপে নিখিল।
তারা এল আজ দুর্বারগতি চলে মিছিল॥

আজকে হালকা হাওয়ায় উড়ুক একক চিল,
জনতরঙ্গে আমরা ক্ষিপ্ত ঢেউ ফেনিল।
উধাও আলোর নিচে সমারোহ,
মিলিত প্রাণের একী বিদ্রোহ!
ফিরে তাকানোর নেই ভীরু মোহ, কী গতিশীল!
সবাই এসেছে, তুমি আসোনিকো, ডাকে মিছিল॥

একটি কথায় ব্যক্ত চেতনা : আকাশে নীল,
দৃষ্টি সেখানে তাইতো পদধ্বনিতে মিল।
সামনে মৃত্যুকবলিত দ্বার,
থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়,
ব্যর্থ নোঙর, নদী হব পার, খুঁটি শিথিল।
আমরা এসেছি মিছিলে, গর্জে ওঠে মিছিল॥

একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬

আবার এবার দুর্বার সেই একুশে নভেম্বর—
আকাশের কোণে বিদ্যুৎ হেনে তুলে দিয়ে গেল
মৃত্যুকাঁপানো ঝড়।

আবার এদেশে মাঠে, ময়দানে
সুদূর গ্রামেও জনতার প্রাণে
হাসানাবাদের ইঙ্গিত হানে
প্রত্যাঘাতের স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
আবার এসেছে অবাধ্য এক একুশে নভেম্বর॥

পিছনে রয়েছে একটি বছর, একটি পুরনো সাল,
ধর্মঘট আর চরম আঘাতে উদ্দাম, উত্তাল;
বার বার জিতে, জানি অবশেষে একবার গেছি হেরে-
বিদেশী! তোদের যাদুদণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।
শোন্ রে বিদেশী, শোন্,
আবার এসেছে লড়াই জেতার চরম শুভক্ষণ!
আমরা সবাই অসভ্য, বুনো—
বৃথা রক্তের শোধ নেব দুনো
একপা পিছিয়ে দু'পা এগোনোর
আমরা করেছি পণ,
ঠে'কে শিখলাম—
তাই তুলে ধরি দুর্জয় গর্জন।
আহ্বান আসে অনেক দূরের,
হায়দ্রাবাদ আর ত্রিবাঙ্কুরের;
আজ প্রয়োজন একটি সুরের
একটি কঠোর স্বর:
"বিদেশী কুকুর! আবার এসেছে একুশে নভেম্বর।"
ডাক ওঠে, ডাক ওঠে—
আবার কঠোর বহু হরতালে
আসে মিল্লাত, বিপ্লবী তালে

এখানে সেখানে রক্তের ফুল ফোটে।
এ নভেম্বরে আবারো তো ডাক ওঠে॥

'আমাদের নেই মৃত্যু এবং আমাদের নেই ক্ষয়,
অনেক রক্ত বৃথাই দিলুম
তবু বাঁচবার শপথ নিলুম
কেটে গেছে আজ রক্তদানের ভয়।
ল'ড়ে মরি তাই আমরা অমর, আমরাই অক্ষয়॥

'আবার আসছে তেরোই ফেব্রুয়ারি,
দাঁতে দাঁত চেপে
হাতে হাত চেপে
উদ্যত সারি সারি,
কিছু না হলেও আবার আমরা
রক্ত দিতে তো পারি?
পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারি।
এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি॥

দিনবদলের পালা

আর এক যুদ্ধ শেষ,
পৃথিবীতে তবু কিছু জিজ্ঞাসা উন্মুখ।
উদ্দাম ঢাকের শব্দে

সে প্রশ্নের উত্তর কোথায় ?
বিজয়ী বিশ্বের চোখ মুদে আসে,
নামে এক ক্লান্তির জড়তা।
রক্তাক্ত প্রান্তর তার অদৃশ্য দুহাতে
নাড়া দেয় পৃথিবীকে,
সে প্রশ্নের উত্তর কোথায় ?
তুষারখচিত মাঠে,
ট্রেঞ্চে, শূন্যে, অরণ্যে, পর্বতে
অস্থির বাতাস ঘোরে দুর্বোধ্য ধাঁধায়,
ভাঙা কামানের মুখে
ধ্বংসস্তূপে উৎকীর্ণ জিজ্ঞাসা :
কোথায় সে প্রশ্নের উত্তর ?

দিগ্বিজয়ী দুঃশাসন !
বহু দীর্ঘ দীর্ঘতর দিন
তুমি আছ দৃঢ় সিংহাসনে সমাসীন,
হাতে হিসেবের খাতা
উন্মুখর এ পৃথিবী :
আজ তার শোধ করো ঋণ।
অনেক নিয়েছ রক্ত, দিয়েছ অনেক অত্যাচার,
আজ হোক তোমার বিচার।
তুমি ভাব, তুমি শুধু নিতে পার প্রাণ,
তোমার সহায় আছে নিষ্ঠুর কামান ;
জানো নাকি আমাদেরও উষ্ণ বুক, রক্ত গাঢ় লাল,
পেছনে রয়েছে বিশ্ব, ইঙ্গিত দিয়েছে মহাকাল,
স্পীডোমিটারের মতো আমাদের হৃৎপিণ্ড উদ্দাম

প্রাণে গতিবেগ আনে, ছেয়ে ফেলে জনপদ—গ্রাম,
বুঝেছি সবাই আমরা আমাদের কী দুঃখ নিঃসীম,
দেখ ঘরে ঘরে আজ জেগে ওঠে এক এক ভীম।
তবুও যে তুমি খাজো সিংহাসনে আছ
সে কেবল আমাদের বিরাট ক্ষমায়।
এখানে অরণ্য স্তব্ধ, প্রতীক্ষা-উৎকীর্ণ চারিদিক,
গঙ্গায় প্লাবন নেই, হিমালয় ধৈর্যের প্রতীক ;
এ সুযোগে খুলে দাও ক্রূর শাসনের প্রদর্শনী,
আমরা প্রহর শুধু গনি।

পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ, বন্ধ সৈনিকের রক্ত ঢালা :
ভেবেছ তোমার জয়, তোমার প্রাপ্য এ জয়মালা ;
জানো না এখানে যুদ্ধ—শুরু দিনবদলের পালা॥

●

মুক্ত বীরদের প্রতি

তোমরা এসেছ, বিপ্লবী বীর ! অবাক অভ্যুদয় !
যদিও রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা কলকাতাময়।
তবু দেখ আজ রক্তে রক্তে সাড়া--
আমরা এসেছি উদ্দাম ভয়হারা।
আমরা এসেছি চারিদিক থেকে, ভুলতে কখনো পারি !
একসূত্রে যে বাঁধা হয়ে গেছে কবে কোন্ যুগে নাড়ী।
আমরা যে বারে বারে
তোমাদের কথা পৌঁছে দিয়েছি এদেশের দ্বারে দ্বারে,

মিছিলে মিছিলে সভায় সভায় উদাত্ত আহ্বানে,
তোমাদের স্মৃতি জাগিয়ে রেখে'ছি জনতার উত্থানে।
উদ্দাম ধ্বনি মুখরিত পথেঘাটে,
পার্কের মোড়ে, ঘরে, ময়দানে, মাঠে
মুক্তির দাবি করেছি তীব্রতর,
সারা কলকাতা শ্লোগানেই থরোথরো।
এই সেই কলকাতা!
একদিন যার ভয়ে দুরু দুরু বৃটিশ নোয়াত মাথা।
মনে পড়ে চব্বিশে ?
সেদিন দুপুরে সারা কলকাতা হারিয়ে ফেলেছে দিশে ;
হাজার হাজার জনসাধারণ ধেয়ে চলে সম্মুখে
পরিষদ-গেটে হাজির সকলে, শেষ প্রতিজ্ঞা বুকে
গর্জে উঠল হাজার হাজার ভাই :
রক্তের বিনিময় হয় হোক, আমরা ওদের চাই।
সফল! সফল! সেদিনের কলকাতা—
হেঁট হয়েছিল অত্যাচারী ও দাম্ভিকদের মাথা।
জানি বিকৃত আজকের কলকাতা
বৃটিশ এখন এখানে জনত্রাতা!

গৃহযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে—
ডেকেছে এখানে কালো রক্তের বান ;
সেদিনের কলকাতা এ আঘাতে ভেঙে চুরে খান্‌খান্‌।
দিকে দিকে আজ বিদেশী প্রহরী, সঙ্গিন উদ্যত ;
তোমরা এসেছ বীরের মতন, আমরা চোরের মতো।

তোমরা এসেছ, ভেঙেছ অন্ধকার—
তোমরা এসেছ, ভয় করি নাকো আর।

পায়ের স্পর্শে মেঘ কেটে যাবে, উজ্জ্বল রোদ্দুর
ছড়িয়ে পড়বে বহু দূর —বহুদূর ।
তোমরা এসেছ, জেনো এইবার নির্ভয় কলকাতা—
অত্যাচারের হাত থেকে জানি তোমরা মুক্তিদাতা ।
তোমরা এসেছ, শিহরণ ঘাসে ঘাসে :
পাখির কাকলি উদ্দাম উচ্ছ্বাসে,
মর্মরধ্বনি তরুপল্লবে শাখায় শাখায় লাগে ;
হঠাৎ মৌন মহাসমুদ্র জাগে
অস্থির হাওয়া অরণ্যপর্বতে,
গুঞ্জন ওঠে তোমরা যাও যে-পথে ।

আজ তোমাদের মুক্তিসভায় তোমাদের সম্মুখে,
শপথ নিলাম আমরা হাজার মুখে :
যতদিন আছে আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্মান,
আমরা রুখব গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বান ।
অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা, বুঝি আরো দিতে হবে
এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে ।
তবুও আজকে ভরসা, যেহেতু তোমরা রয়েছ পাশে,
তোমরা রয়েছ এদেশের নিঃশ্বাসে ।

তোমাদের পথ যদিও কুয়াশাময়,
উদ্দাম জয়যাত্রার পথে জেনো ও কিছুই নয় ।
তোমরা রয়েছ, আমরা রয়েছি, দুর্জয় দুর্বার,
পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার ।
আবার জ্বালাব বাতি,
হাজার সেলাম তাই নাও আজ, শেষযুদ্ধের সাথী ॥

প্রিয়তমাসু

সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে
আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি—
স্বদেশের সীমানায়।

ধূসর তিউনিসিয়া থেকে স্নিগ্ধ ইতালী,
স্নিগ্ধ ইতালী থেকে ছুটে গেছি বিপ্লবী ফ্রান্সে
নক্ষত্রনিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতো
দুর্নিবার, অপরাহত রাইফেল হাতে :
—ফ্রান্স থেকে প্রতিবেশী বার্মাতেও।

আজ দেহে আমার সৈনিকের কড়া পোশাক,
হাতে এখনো দুর্জয় রাইফেল,
রক্তে রক্তে তরঙ্গিত জয়ের আর শক্তির দুর্বহ দম্ভ,
আজ এখন সীমান্তের প্রহরী আমি।

আজ কিন্তু নীল আকাশ আমাকে পাঠিয়েছে নিমন্ত্রণ,
স্বদেশের হাওয়া বয়ে এনেছে অনুরোধ,
চোখের সামনে খুলে ধরেছে সবুজ চিঠি :
কিছুতেই বুঝি না কী ক'রে এড়াব তাকে ?

কী ক'রে এড়াব এই সৈনিকের কড়া পোশাক ?
যুদ্ধ শেষ। মাঠে মাঠে প্রসারিত শান্তি,
চোখে এসে লাগছে তারই শীতল হাওয়া,
প্রতি মুহূর্তে শ্লথ হয়ে আসে হাতের রাইফেল,

গা থেকে খসে পড়তে চায় এই কড়া পোশাক,
রাত্রে চাঁদ ওঠে : আমার চোখে ঘুম নেই।

তোমাকে ভেবেছি কতদিন,
কত শত্রুর পদক্ষেপ শোনার প্রতীক্ষার অবসরে,
কত গোলা ফাটার মুহূর্তে।
কতবার অবাধ্য হয়েছে মন, যুদ্ধজয়ের ফাঁকে ফাঁকে,
কতবার হৃদয় জ্বলেছে অনুশোচনার অঙ্গারে
তোমার আর তোমাদের ভাবনায়।
তোমাকে ফেলে এসেছি দারিদ্র্যের মধ্যে,
ছুঁড়ে দিয়েছি দুর্ভিক্ষের আগুনে,
ঝড়ে আর বন্যায়, মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে
বার বার বিপন্ন হয়েছে তোমাদের অস্তিত্ব।
আর আমি ছুটে গেছি এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে।
জানি না আজো, আছ কি নেই,
দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তলিয়ে গেছে কিনা ভিটে
জানি না তাও।

তবু লিখছি তোমাকে আজ : লিখছি আত্মম্ভর আশায়
ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে।
জানি, আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা ক'রে নেই
মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গলঘটে;
জানি, সম্বর্ধনা রটবে না লোকমুখে,
মিলিত খুসিতে মিলবে না বীরত্বের পুরস্কার।
তবু, একটি হৃদয় নেচে উঠবে আমার আবির্ভাবে
সে তোমার হৃদয়

যুদ্ধ চাই না আর, যুদ্ধ তো থেমে গেছে :
পদার্পণ করতে চায় না মন ইন্দোনেশিয়ায় ।
আর সামনে নয়,
এবার পেছন ফেরার পালা ।

পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে ।
প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ ক'রে পেলাম কী ? উত্তর তার—
তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়,
ইতালীতে জনগণের বন্ধুত্ব,
ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র ;
আর নিষ্কণ্টক বার্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগাদা ।

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার ॥

ছুরি

বিগত শেষ-সংশয় ; স্বপ্ন ক্রমে ছিন্ন,
আচ্ছাদন উন্মোচন করেছে যত ঘৃণ্য,
শঙ্কাকুল শিল্পীপ্রাণ, শঙ্কাকুল কৃষ্টি,
দুর্দিনের অন্ধকারে ক্রমশ খোলে দৃষ্টি

হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত,
দেশকে যারা অস্ত্র হানে, তারা তো নয় ভ্রান্ত
বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ্ বৃন্তে
সংস্কৃতিধ্বং শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।
শিল্পীদের রক্তস্রোতে এসেছে চৈতন্য
গুপ্তঘাতী শত্রুদের করি না আজ গণ্য।
ভুলেছে যারা সভ্য-পথ, সম্মুখীন যুদ্ধ,
তাদের আজ মিলিত মুঠি করুক শ্বাসরুদ্ধ,
শহীদ্-খুন আগুন জ্বালে, শপথ অক্ষুণ্ণ :
এদেশ অতি শীঘ্র হবে বিদেশী-চব শূন্য।
বাঁচাব দেশ, আমার দেশ, হানবো প্রতিপক্ষ,
এ জনতার অন্ধ চোখে আনবো দৃঢ় লক্ষ্য।
বাইরে নয় ঘরেও আজ মৃত্যু ঢ'লে বৈরী,
এদেশে জন-বাহিনী তাই নিমেষে হয় তৈরী॥

●

সূচনা

ভারতবর্ষে পাথরের গুরুভার :
এহেন অবস্থাকেই পাষাণ বলো,
প্রস্তরীভূত দেশের নীরবতার
একফোঁটা নেই অশ্রুও সম্বলও।

অহল্যা হল এই দেশ কোন্ পাপে
ক্ষুধার কান্না কঠিন পাথরে ঢাকা,

কোনো সাড়া নেই আগুনের উত্তাপে
এ নৈঃশব্দ্য ভেঙেছে কালের চাকা।

ভারতবর্ষ! কার প্রতীক্ষা করো,
কান পেতে কার শুনছ পদধ্বনি?
বিদ্রোহে হবে পাথরেরা থরোথরো,
কবে দেখা দেবে লক্ষ প্রাণের খনি?

ভারতী, তোমার অহল্যারূপ চিনি
রামের প্রতীক্ষাতেই কাটাও কাল,
যদি তুমি পায়ে বাজাও ও-কিঙ্কিণী,
তবে জানি বেঁচে উঠবেই কঙ্কাল।

কত বসন্ত গিয়েছে অহল্যা গো—
জীবনে ব্যর্থ তুমি তবু বার বার,
দ্বারে বসন্ত, একবার শুধু জাগো
দুহাতে সরাও পাষাণের গুরুভার।

অহল্যা-দেশ, তোমার মুখের ভাষা
অনুচ্চারিত, তবু অধৈর্যে ভরা;
পাষাণ ছদ্মবেশকে ছেঁড়ার আশা
ক্রমশ তোমার হৃদয় পাগল করা।

ভারতবর্ষ, তন্দ্রা ক্রমশ ক্ষয়
অহল্যা। আজ শাপমোচনের দিন;
তুষার-জনতা বুঝি জাগ্রত হয়—
গা-ঝাড়া দেবার প্রস্তাব দ্বিধাহীন।

অহল্যা, আজ কাঁপে কী পাষাণকায় !
রোমাঞ্চ লাগে পাথরের প্রত্যঙ্গে ;
রামের পদস্পর্শ কি লাগে গায় ?
অহল্যা, জেনো আমরা তোমার সঙ্গে ॥

অবোধ

নরম ঘুমের ঘোর ভাঙল ?
দেখ চেয়ে অরাজক রাজ্য ;
ধ্বংস সমুখে কাঁপে নিত্য
এখনো বিপদ অগ্রাহ্য ?

পৃথিবী, এ পুরাতন পৃথিবী
দেখ আজ অবশেষে নিঃস্ব,
স্বপ্ন-অলস যত ছায়ারা
একে একে সকলি অদৃশ্য ।

রুক্ষ মরুর দুঃস্বপ্ন
হৃদয় আজকে শ্বাসরুদ্ধ,
একলা গহন পথে চলতে
জীবন সহসা বিক্ষুব্ধ ।

জীবন ললিত নয় আজকে
ঘুচেছে সকল নিরাপত্তা,

বিফল স্রোতের পিছুটানকে
শরণ করেছে ভীরু সত্তা।

তবু আজ রক্তের নিদ্রা,
তবু ভীরু স্বপ্নের সখ্য :
সহসা চমক লাগে চিত্তে
দুর্জয় হল প্রতিপক্ষ।

নিরুপায় ছিঁড়ে গেল দ্বৈধ
নির্জনে মুখ তোলে অঙ্কুর,
বুঝে নিল উদ্যোগী আত্মা
জীবন আজকে ক্ষণভঙ্গুর।

দলিত হৃদয় দেখে স্বপ্ন
নতুন, নতুনতর বিশ্ব,
তাই আজ স্বপ্নের ছায়ারা
একে একে সকলি অদৃশ্য ॥

মণিপুর

এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
সহস্র বছর ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি,
জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।

যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে,
যুগ যুগ আমরা যে বেঁচে থাকি পতনে উত্থানে।
যে চাষী কেটেছে ধান, এ মাটিতে নিয়েছে কবর,
এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর।
অদৃশ্য তাদের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এদেশের ধূলি,
মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন ক'রে ভুলি ?
আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি,
ভালবাসি এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি।
এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস্, তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।
কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়,
উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড়।
তবুও অজেয় এই শতাব্দীগ্রথিত হিন্দুস্থান,
এরই মধ্যে আমাদের বিকশিত স্বপ্নের সন্ধান।
আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে,
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।
এ ধুলোয় প্রতিরোধ, এ হাওয়ায় ঘৃণিত চাবুক,
এখানে নিশ্চিহ্ন হল কত শত গর্বোদ্ধত বুক।
এ মাটির জন্যে প্রাণ দিয়েছি তো কত যুগ ধ'রে,
রেখেছি মাটির মান কতবার কত যুদ্ধ ক'রে।
আজকে যখন এই দিক্‌প্রান্তে ওঠে রক্ত-ঝড়,
কোমল মাটিতে রাখে শত্রু তার পায়ের স্বাক্ষর,
তখন চীৎকার ক'রে রক্ত ব'লে ওঠে 'ধিক্ ধিক্,
এখনো দিল না দেখা দেহে দেহে নির্ভয় সৈনিক !
দাসত্বের ছদ্মবেশ দীর্ণ ক'রে উন্মোচিত হোক
একবার বিশ্বরূপ—হে উদ্দাম, হে অধিনায়ক !'

এদিকে উৎকর্ণ দিন, মণিপুর, কাঁপে মণিপুর
চৈত্রের হাওয়ায় ক্লান্ত, উৎকণ্ঠায় অস্থির দুপুর—
কবে দেখা দেবে, কবে প্রতীক্ষিত সেই শুভক্ষণ
ছড়াবে ঐশ্বর্য পথে জনতার দুরন্ত যৌবন ?
দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে–
এখনো শত্রুকে ক্ষমা ?   শত্রু কি করেছে ক্ষমা
বিধ্বস্ত বাংলাকে ?
আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা,
কেন তাই মনে মনে আমি প্রশ্ন করি সেই কথা ।
তুমি কি ক্ষুধিত বন্ধু ?   তুমি কি ব্যাধিতে জরোজরো ?
তা হোক, তবুও তুমি আর এক মৃত্যুকে রোধ করো ।
বসন্ত লাগুক আজ আন্দোলিত প্রাণের শাখায়,
আজকে আসুক বেগ এ নিশ্চল রথের চাকায়,
এ মাটি উত্তপ্ত হোক, এ দিগন্তে আসুক বৈশাখ,
ক্ষুধার আগুনে আজ শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক ।
শত্রুরা নিয়েছে আজ দ্বিতীয় মৃত্যুর ছদ্মবেশ,
তবু কেন নিরুত্তর প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা দেশ ?
এদেশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি,
এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী ।
দাসত্বের ধুলো ঝেড়ে তারা আজ আহ্বান পাঠাক,
ঘোষণা করুক তারা এ মাটিতে আসন্ন বৈশাখ ।
তাই এই অবরুদ্ধ স্বপ্নহীন নিবিড় বাতাসে
শব্দ হয়, মনে হয় রাত্রিশেষে ওরা যেন আসে ।
ওরা আসে, কান পেতে আমি তার পদধ্বনি শুনি,
মৃত্যুকে নিহত ক'রে ওরা আসে উজ্জ্বল আরুণি ;

পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে আজ অসহ্য আবেগে,
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান, রঙ লাগে মেঘে।
এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ ওদের পতাকা,
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা,
আগন্তুক ইতিহাসে ওরা আজ প্রথম অধ্যায়,
ওরা আজ পলিমাটি অবিরাম রক্তের বন্যায় ;
ওদের দুচোখে আজ বিকশিত আমার কামনা,
অভিনন্দন গাছে, পথের দুপাশে অভ্যর্থনা।
ওদের পতাকা ওড়ে গ্রামে গ্রামে নগরে বন্দরে,
মুক্তির সংগ্রাম সেরে ওরা ফেরে স্বপ্নময় ঘরে ॥

দিক্প্রান্তে

ভাঙন নেপথ্য পৃথিবীতে :
অদৃশ্য কালের শত্রু প্রচ্ছন্ন জোয়ারে,
অনেক বিপন্ন জীব ক্ষয়িষ্ণু খোঁয়াড়ে
উন্মুখ নিঃশেষে কেড়ে নিতে,
দুর্গম বিষণ্ণ শেষ শীতে।

বীভৎস প্রাণের কোষে কোষে
নিঃশব্দে ধ্বংসের বীজ নির্দিষ্ট আয়ুতে
পশেছে আঁধার রাত্রে—প্রত্যেক স্নায়ুতে ;—
গোপনে নক্ষত্র গেছে খসে
আরক্তিম আদিম প্রদোষে।

দিনের নীলাভ শেষ আলো
জানাল আসন্ন রাত্রি দুর্লক্ষ্য সংকেতে
অনেক কাস্তের শব্দ নিঃস্ব ধানক্ষেতে
সেই রাত্রে হাওয়ায় মিলাল :

দিক্‌প্রান্তে সূর্য চমকাল ॥

চিরদিনের

এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা ।

জোড়া দীঘি, তার পাড়েতে তালের সারি
দূরে বাঁশঝাড়ে আত্মদানের সাড়া,
পচা জল আর মশায় অহংকারী
নীরব এখানে অমর কিষাণপাড়া ।

এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস
এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাগরা পরে ।

রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে
কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত ।

দুর্ভিক্ষের আঁচল জড়ানো গায়ে
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে ।

রাত্রি হলেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে,
কেমন ক'রে সে আকালেতে গতবারে
চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে ।

এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতী তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে ।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে ॥

নিভৃত

অনিশ্চিত পৃথিবীতে অরণ্যের ফুল
রচে গেল ভুল ;
তারা তো জানত যারা পরম ঈশ্বর
তাদের বিভিন্ন নয় স্তর,
অনন্তর
তারাই তাদের সৃষ্টিতে
অনর্থক পৃথক দৃষ্টিতে
একই কারুকার্যে নিয়মিত
উত্তপ্ত গলিত
ধাতুদের পরিচয় দিত।
শেষ অধ্যায় এল অকস্মাৎ।
তখন প্রমত্ত প্রতিঘাত
শ্রেয় মেনে নিল ইতিহাস,
অকল্পেয় পরিহাস
সুদূর দিগন্তকোণে সকরুণ বিলাল নিঃশ্বাস।

যেখানে হিমের রাজ্য ছিল,
যেখানে প্রচ্ছন্ন ছিল পশুর মিছিলও
সেখানেও ধানের মঞ্জরী
প্রাণের উত্তাপে ফোটে, বিচ্ছিন্ন শর্বরী
সূর্য-সহচরী !
তাই নিত্যবুভুক্ষিত মন
চিরন্তন
লোভের নিষ্ঠুর হাত বাড়াল চৌদিকে

পৃথিবীকে
একাগ্রতায় নিলো লিখে
সহসা প্রকম্পিত সুষুপ্ত সত্তায়
কঠিন আঘাত লাগে সুনিরাপত্তায়
ব্যর্থ হল গুপ্ত পরিপাক,
বিফল চিৎকার তোলে বুভুক্ষার কাক ,
—পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক

বৈশম্পায়ন

আকাশের খাপছাড়া ক্রন্দন
নাই আর আষাঢ়ের খেলনা
নিত্য যে পাণ্ডুর জড়তা
সাথীহারা পথিকের সঞ্চয় ।

রিক্তের বুকভরা নিঃশ্বাস,
আঁধারের বুকফাটা চীৎকার—
এই নিয়ে মেতে আছি আমরা
কাজ নেই হিসাবের খাতাতে ।

মিলাল দিনের কোনো ছায়াতে
পিপাসায় আর কূল পাই না ;
হারানো স্মৃতির মৃদু গন্ধে
প্রাণ কভু হয় নাকো চঞ্চল ।

মাঝে মাঝে অনাহূত আহ্বান
আনে কই আলেয়ার বিত্ত ?
শহরের জমকালো খবরে
হাজিরা খাতাটা থাকে শূন্য।

আনমনে জানা পথ চলতে
পাই নাকো মাদকের গন্ধ !
রাত্রিদিনের দাবা চালেতে
আমাদের মন কেন উষ্ণ ?

শ্মশানঘাটেতে ব'সে কখনো
দেখি নাই মরীচিকা সহসা,
তাই বুঝি চিরকাল আঁধারে
আমরাই দেখি শুধু স্বপ্ন।

বার বার কায়াহীন ছায়ারে
ধরেছিনু বাহুপাশে জড়িয়ে,
তাই আজ গৈরিক মাটিতে
রঙিন বসন করি শুদ্ধ ॥

নিভৃত

বিষণ্ণ রাত, প্রসন্ন দিন আনো
আজ মরণের অন্ধ অনিদ্রায়,
সে অন্ধতায় সূর্যের আলো হানো,
শ্বেত স্বপ্নের ঘোরে যে মৃতপ্রায়।

নিভৃত-জীবন-পরিচর্যায় কাটে
যে দিনের, আজ সেখানে প্রবল দ্বন্দ্ব।
নিরন্ন প্রেম ফেরে নির্জন হাটে,
অচল চরণ ললাটের নির্বন্ধ ?

জীবন মরণে প্রাণের গভীরে দোলা
কাল রাতে ছিল নিশীথ কুসুমগন্ধী,
আজ সূর্যের আলোয় পথকে ভোলা
মনে হয় ভীরু মনের দুরভিসন্ধি ॥

কবে

অনেক স্তব্ধ দিনের এপারে চকিত চতুর্দিক,
আজো বেঁচে আছি, মৃত্যুতাড়িত আজো বেঁচে আছি ঠিক।
দুলে ওঠে দিন : শপথমুখর কিষাণ-শ্রমিকপাড়া,
হাজারে হাজারে মাঠে বন্দরে আজকে দিয়েছে সাড়া।

জ্বলে আলো আজ, আমাদের হাড়ে জমা হয় বিদ্যুৎ,
নিহত দিনের দীর্ঘ শাখায় ফোটে বসন্তদূত।
মূঢ় ইতিহাস ; চল্লিশ কোটি সৈন্যের সেনাপতি।
সংহত দিন, রুখবে কে এই একত্রীভূত গতি ?
জানি আমাদের অনেক যুগের সঞ্চিত স্বপ্নেরা
দ্রুত মুকুলিত তোমার দিন ও রাত্রি দিয়েই ঘেরা।
তাই হে আদিম, ক্ষতবিক্ষত জীবনের বিস্ময়,
ছড়াও প্লাবন, দুঃসহ দিন আর বিলম্ব নয়।
সারা পৃথিবীর দুয়ারে মুক্তি, এখানে অন্ধকার,
এখানে কখন আসন্ন হবে বৈতরণীর পার ?

অলক্ষ্যে

আমার মৃত্যুর পর কেটে গেল বৎসর বৎসর ;
ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির ব্যর্থ প্রচেষ্টাও আজ অগভীর,
এখন পৃথিবী নয় অতিক্রান্ত প্রাযান্ধ স্থবির :
নিভেছে প্রধূম্রজ্বালা, নিরঙ্কুশ সূর্য অনশ্বর ;
স্তব্ধতা নেমেছে রাত্রে থেমেছে নির্ভীক তীক্ষ্ণস্বর-
অথবা নিরন্ন দিন, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা ;
উদ্ধত বজ্রের ভয়ে নিঃশব্দে মৃত্যুর আনাগোনা,
অনন্য মানবসত্তা ক্রমান্বয়ে স্বল্পপরিসর।

গলিত স্মৃতির বাষ্প সেদিনের পল্লব শাখায়
বারম্বার প্রতারিত অস্ফুট কুয়াশা রচনায় ;

বিলুপ্ত বক্ষের ঢেউ নিশ্চিত মৃত্যুতে প্রতিহত
আমার অজ্ঞাত দিন নগণ্য উদার উপেক্ষাতে
অগ্রগামী শূন্যতাকে লাঞ্ছিত করেছে অবিরত
তথাপি ত্বা প্রস্ফুটিত মৃত্যুর অদৃশ্য দুই হাতে

●

মহাত্মাজীর প্রতি

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে ; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।
এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার,
এ মৃতদেহের বাধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্যে পার।
এসেছে বন্যা, এসেছে মৃত্যু, পরে যুদ্ধের ঝড়,
মন্বন্তর রেখে গেছে তার পথে পথে স্বাক্ষর,
প্রতি মুহূর্তে বুঝেছি এবার মুছে নেবে ইতিহাস—
তবু উদ্দাম, মৃত্যুআহত ফেলি নি দীর্ঘশ্বাস ;
নগর গ্রামের শ্মশানে শ্মশানে নিহত অভিজ্ঞান :
বহু মৃত্যুর মুখোমুখি দৃঢ় করেছি জয়ের ধ্যান।
তাইতো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।

দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাই তো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ ॥

পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার তুমি জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।
হতাশায় স্তব্ধ বাক্য; ভাষা চাই আমরা নির্বাক,
পাঠাব মৈত্রীর বাণী সারা পৃথিবীকে জানি ফের।
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমাদের ভাষা যাবে শোনা
ভেঙে যাবে রুদ্ধশ্বাস নিরুদ্যম সুদীর্ঘ মৌনতা
আমাদেরই দুঃখসুখে ব্যক্ত হবে প্রত্যেক রচনা
পীড়নের প্রতিবাদে উচ্চারিত হবে সব কথা।

আমি দিব্যচক্ষে দেখি অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ :
দস্যুতায় দৃপ্তকণ্ঠ (বিগত দিনের)
ধৈর্যের বাঁধন যার ভাঙে দুঃশাসনের আঘাত,
যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক, যে যন্ত্রণা সহায়হীনের।
বিগত দুর্ভিক্ষে যার উত্তেজিত তিক্ত তীব্র ভাষা
মৃত্যুতে ব্যথিত আর লোভের বিরুদ্ধে খরধার,
ধ্বংসের প্রান্তরে বসে আনে দৃঢ় অনাহত আশা;
তাঁর জন্ম অনিবার্য, তাঁকে ফিরে পাবই আবার।

রবীন্দ্রনাথের সেই ভুলে যাওয়া বাণী
অকস্মাৎ করে কানাকানি
'দামামা ঐ বাজে, দিন বদলের পালা
এল ঝড়ো যুগের মাঝে'।

নিষ্কম্প গাছের পাতা, রুদ্ধশ্বাস অগ্নিগর্ভ দিন;
বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে এ আকাশ, গতিরুদ্ধ বায়ু:
আবিশ্ব জিজ্ঞাসা এক চোখে মুখে ছড়ায় রঙিন
সংশয় স্পন্দিত স্বপ্ন, ভীত আশা উচ্চারণহীন
মেলে না উত্তর কোনো, সমস্যায় উত্তেজিত স্নায়ু।
ইতিহাস মোড় ফেরে পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন,
পশ্চিম সীমান্তে শান্তি, দীর্ঘ হয় পৃথিবীর আয়ু,
দিকে দিকে জয়ধ্বনি, কাঁপে দিন রক্তাক্ত আভায়।
রামরাবণের যুদ্ধে বিক্ষত এ ভারতজটায়ু
মৃতপ্রায়, যুদ্ধাহত, পীড়নে-দুর্ভিক্ষে মৌনমূক।
পূর্বাচল দীপ্ত ক'রে বিশ্বজন-সমৃদ্ধ সভায়
রবীন্দ্রনাথের বাণী তার দাবি ঘোষণা করুক।
এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।

যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ॥

পরিশিষ্ট

অনেক উল্কার স্রোত বয়েছিল হঠাৎ প্রত্যূষে,
বিনিদ্র তারার বক্ষে পল্লবিত মেঘ
ছুঁয়েছিল রশ্মিটুকু প্রথম আবেগে।
অকস্মাৎ কম্পমান অশরীরী দিন,
রক্তের বাসরঘরে বিবর্ণ মৃত্যুর বীজ
ছড়াল আসন্ন রাজপথে।
তবু স্বপ্ন নয়:
গোধূলির প্রত্যহ ছায়ায়
গোপন স্বাক্ষর সৃষ্টি কক্ষচ্যুত গ্রহ-উপবনে;
দিগন্তের নিশ্চল আভাস
ভস্মীভূত শ্মশানক্রন্দনে,
রক্তিম আকাশচিহ্ন সবেগে প্রস্থান করে
যূথ ব্যঞ্জনায়।

নিষিদ্ধ কল্পনাগুলি বন্ধ্যা তবু
অলক্ষ্যে প্রসব করে অব্যক্ত যন্ত্রণা,
প্রথম যৌবন তার রক্তময় রিক্ত জয়টীকা
স্তম্ভিত জীবন হতে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিল।
তারপর:
প্রান্তিক যাত্রায়
অতৃপ্ত রাত্রির স্বাদ,
বাসর শয্যায়
অসম্বৃত দীর্ঘশ্বাস
বিস্মরণী সুরাপানে নিত্য নিমজ্জিত

স্বগত জাহ্নবীজলে।
তৃষ্ণার্ত কঙ্কাল
অতীত অমৃত পানে দৃষ্টি হানে কত!
সর্বগ্রাসী প্রলুব্ধ চিতার অপবাদে
সভয়ে সন্ধান করে ইতিবৃত্ত দগ্ধপ্রায় মনে।
প্রেতাত্মার প্রতিবিম্ব বার্ধক্যের প্রকম্পনে লীন,
অনুর্বর জীবনের সূর্যোদয়:
ভস্মশেষ চিতা।
কুজ্ঝটিকা মূর্ছা গেল আলোক-সম্পাতে,
বাসনা-উদ্‌গ্রীব চিন্তা
উন্মুখ ধ্বংসের আর্তনাদে।

সরীসৃপ বন্যা যেন জড়তার স্থির প্রতিবাদ,
মানবিক অভিযানে নিশ্চিন্ত উষ্ণীষ!
প্রচ্ছন্ন অগ্ন্যুৎপাতে সংজ্ঞাহীন মেরুদণ্ড-দিন
নিতান্ত ভঙ্গুর, তাই উদ্যত সৃষ্টির ত্রাসে কাঁপে:
পণ্যভারে জর্জরিত পাথেয় সংগ্রাম,
চকিত হরিণদৃষ্টি অভুক্ত মনের পুষ্টিকর:
অনাসক্ত চৈতন্যের অস্থায়ী প্রয়াণ।
অথবা দৈবাৎ কোন নৈর্ব্যক্তিক আশার নিঃশ্বাস
নগণ্য অঙ্গারতলে খুঁজেছে অন্তিম।
রুদ্ধশ্বাস বসন্তের আদিম প্রকাশ,
বিপ্রলব্ধ জনতার কুটিল বিষাক্ত পরিবাদে
প্রত্যহ লাঞ্ছিত স্বপ্ন,
স্পর্ধিত আঘাত।
সুষুপ্ত প্রকোষ্ঠতলে তন্দ্রাহীন দ্বৈতাচারী নর

নিজেরে বিনষ্ট করে উৎসাবিত ধূমে,
অদ্ভুত ব্যাধির হিমছায়া
দীর্ণ করে নির্যাতিত শুদ্ধ কল্পনাকে ;
সদ্যমৃত-পৃথিবীর মানুষের মতো
প্রত্যেক মানবমনে একই উত্তাপ অবসাদে ।
তবুও শার্দুল-মন অন্ধকারে সন্ধ্যার মিছিলে
প্রথম বিস্ময়দৃষ্টি মেলে ধরে বিষাক্ত বিশ্বাসে ।

বহ্নিমান তপ্তশিখা উন্মেষিত প্রথম স্পর্ধায়
বিষকন্যা পৃথিবীর চক্রান্তে বিহ্বল
উপস্থিত প্রহরী সভ্যতা ।
ধূসর অগ্নির পিণ্ড : উত্তাপবিহীন
স্তিমিত মত্ততাগুলি স্তব্ধ নীহারিকা,
মৃত্তিকার ধাত্রী অবশেষে ॥

মীমাংসা

আজকে হঠাৎ সাত-সমুদ্র তের-নদী
পার হতে সাধ জাগে মনে, হায় তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ
প্রস্রবণের মতো এসে যেত হঠাৎ আজ—
তাহলে না হয় আকাশ বিহার হত সফল,
টুকরো মেঘেরা যেতে যেতে ছুঁয়ে যেত কপোল ।

আর আমি বুঝি দৈত্যদলনে সাগর পার
হতাম ; যেখানে দানবের দায়ে সব আঁধার।
মত্ত যেখানে দৈত্যে দৈত্যে বিবাদ ভারি :
হানাহানি নিয়ে সুন্দরী এক রাজকুমারী।
(রাজকন্যার লোভ নেই,— লোভ অলঙ্কারে,
দৈত্যেরা শুধু বিবস্ত্রা ক'রে চায় তাহারে।)

আমি একজন লুপ্তগর্ব রাজার তনয়
এত অন্যায় সহ্য করব কোনোমতে নয়
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝল্‌সে উঠবে আমার অসির কিরণ।

ভাঙাচোরা এক তলোয়ার আছে, (নয় দু'ধারী)
তাও হ'ত তবে পক্ষীরাজেরই অভাব ভারি।
তাই ভাবি আজ, তবে আমি খুঁজে নেব কৌপীন
নেব কয়েকটা বেছে জানা জানা বুলি সৌখীন॥

অবৈধ

আজ মনে হয় বসন্ত আমার জীবনে এসেছিল
উত্তর মহাসাগরের কূলে
আমার স্বপ্নের ফুলে
তারা কথা কয়েছিল
অস্পষ্ট পুরনো ভাষায়।

অস্ফুট স্বপ্নের ফুল
অসহ্য সূর্যের তাপে
অনিবার্য ঝরেছিল
মরেছিল নিষ্ঠুর প্রগল্‌ভ হতাশায়

হঠাৎ চমকে ওঠে হাওয়া
সেদিন আর নেই—
নেই আর সূর্য-বিকিরণ
আমার জীবনে তাই ব্যর্থ হল বাসন্তীমরণ !

শুনি নি স্বপ্নের ডাক :
থেকেছি আশ্চর্য নির্বাক
বিন্যস্ত করেছি প্রাণ বুভুক্ষার হাতে ।
সহসা একদিন
আমার দরজায় নেমে এল
নিঃশব্দে উড়ন্ত গৃধিনীরা ।
সেইদিন বসন্তের পাখি
উড়ে গেল
যেখানে দিগন্ত ঘনায়িত ।

আজ মনে হয়
হেমন্তের পড়ন্ত রোদ্দুরে,
কী ক'রে সম্ভব হল
আমার রক্তকে ভালবাসা !
সূর্যের কুয়াশা
এখনো কাটে নি

ঘোচে নি অকাল দুর্ভাবনা।
মুহূর্তের সোনা
এখনো সভয়ে ক্ষয় হয়,
এরই মধ্যে হেমন্তের পড়ন্ত রোদ্দুর
কঠিন কাস্তেতে দেয় সুর,
অন্যমনে এ কী দুর্ঘটনা—
হেমন্তেই বসন্তের প্রস্তাব রটনা॥

৯

১৯৪১ সাল

নীল সমুদ্রের ইশারা —
অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর ছোট ছোট দ্বীপ,
আর সূর্যময় দিনের স্তব্ধতা ;
নিঃশব্দ দিনের সেই ভীরু অন্তঃশীল
মত্ততাময় পদক্ষেপ :
এ সবের ম্লান আধিপত্য বুঝি আর
জীবনের ওপর কালের ব্যবচ্ছেদ-ভ্রষ্ট নয়।
তাই রক্তাক্ত পৃথিবীর ডাকঘর থেকে
ডাক এল—
সভ্যতার ডাক।
নিষ্ঠুর ক্ষুধার্ত পরোয়ানা
আমাকে চিহ্নিত ক'রে গেল।
আমার একক পৃথিবী
ভেসে গেল জনতার প্রবল জোয়ারে।

মনের স্বচ্ছতার ওপর বিরক্তির শ্যাওলা
গভীরতা রচনা করে,
আর শঙ্কিত মনের অস্পষ্টতা
ইতস্ততঃ ধাবমান।
নির্ধারিত জীবনের মাটির মাশুল
পূর্ণতায় মুক্তি চায়;
আমার নিষ্ফল প্রতিবাদ,
আরো অনেকের বিরুদ্ধ বিবক্ষা
তাই পরাহত হল।
কোথায় সেই দূর সমুদ্রের ইশারা
আর অন্ধকারের নির্বিরোধ ডাক!
দিনের মুখে মৃত্যুর মুখোস।
যে সব মুহূর্ত-পরমাণু
গেঁথেছিল অস্থায়ী রচনা,
সে সব মুহূর্তে আজ
প্রাণের অস্পষ্ট প্রশাখায়
অজ্ঞাত রক্তিম ফুল ফোটে॥

●

রোম : ১৯৪৩

ভেঙেছে সাম্রাজ্যস্বপ্ন, ছত্রপতি হয়েছে উধাও;
শৃঙ্খল গড়ার দুর্গ ভূমিসাৎ বহু শতাব্দীর।
'সাথী, আজ দৃঢ় হাতে হাতিয়ার নাও'—
রোমের প্রত্যেক পথে ওঠে ডাক ক্রমশ অস্থির

উদ্ধত ক্ষমতালোভী দস্যুতার ব্যর্থ পরাক্রম,
মুক্তির উত্তপ্ত স্পর্শে প্রকম্পিত যুগ যুগ অন্ধকার রোম।

হাজার বছর ধ'রে দাসত্ব বেঁধেছে বাসা রোমের দেউলে,
দিয়েছে অনেক রক্ত রোমের শ্রমিক—
তাদের শক্তির হাওয়া মুক্তির দুয়ার দিল খুলে,
আজকে রক্তাক্ত পথ ; উদ্ভাসিত দিক।
শিল্পী আর মজুরের বহু পরিশ্রম
একদিন গড়েছিল রোম,
তারা আজ একে একে ভেঙে দেয় রোমের সে সৌন্দর্যসম্ভার,
ভগ্নস্তূপে ভবিষ্যৎ মুক্তির প্রচার।

রোমের বিপ্লবী হৃৎস্পন্দনে ধ্বনিত
মুক্তির সশস্ত্র ফৌজ আসে অগণিত
দুচোখে সংহার-স্বপ্ন, বুকে তীব্র ঘৃণা
শত্রুকে বিধ্বস্ত করা যেতে পারে কিনা
রাইফেলের মুখে এই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা।
যদিও উদ্বেগ মনে, তবু দীপ্ত আশা—
পথে পথে জনতার রক্তাক্ত উত্থান,
বিস্ফোরণে বিস্ফোরণে ডেকে ওঠে বান।

ভেঙে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ
বিক্ষুব্ধ অগ্ন্যুৎপাতে উচ্চারিত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ।
যে উদ্ধত একদিন দেশে দেশে দিয়েছে শৃঙ্খল
আবিসিনিয়ার চোখে আজ তার সে দম্ভ নিষ্ফল।

এদিকে ত্বরিত সূর্য রোমের আকাশে
যদিও কুয়াশাঢাকা আকাশের নীল,
তবুও বিপ্লবী জানে, সোভিয়েত পাশে

জনরব

পাখি সব করে রব, রাত্রি শেষ ঘোষণা চৌদিকে,
ভোরের কাকলি শুনি ; অন্ধকার হয়ে আসে ফিকে,
আমার ঘরেও রুদ্ধ অন্ধকার, স্পষ্ট নয় আলো,
পাখিরা ভোরের বার্তা অকস্মাৎ আমাকে শোনালো ।
স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠি, অন্ধকারে খাড়া করি কান—
পাখিদের মাতামাতি, শুনি মুখরিত ঐকতান ;
আজ এই রাত্রিশেষে বাইরে পাখির কলরবে
রুদ্ধ ঘরে ব'সে ভাবি, হয়তো কিছু বা শুরু হবে,
হয়তো এখনি কোনো মুক্তিদূত দুরন্ত রাখাল
মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল ;
স্বপ্নের কুসুমকলি হয়তো বা ফুটেছে কাননে,
আমি কি খবর রাখি ? আমি বদ্ধ থাকি গৃহকোণে,
নির্বাসিত মন নিয়ে চিরকাল অন্ধকারে বাসা,
তাইতো মুক্তির স্বপ্ন আমাদের নিতান্ত দুরাশা ।
জন-পাখিদের কণ্ঠে তবুও আলোর অভ্যর্থনা,
দিকে দিকে প্রতিদিন অবিশ্রান্ত শুধু যায় শোনা ;
এরা তো নগণ্য জানি, তুচ্ছ ব'লে ক'রে থাকি ঘৃণা,
আলোর খবর এরা কি ক'রে যে পায় তা জানি না ।

এদের মিলিত সুরে কেন যেন বুক ওঠে দুলে,
অকস্মাৎ পূর্বদিকে মনের জানালা দিই খুলে :
হঠাৎ বন্দর ছাড়া বাঁশি বুঝি বাজায় জাহাজ,
চকিতে আমার মনে বিদ্যুৎ বিদীর্ণ হয় আজ।
অদূরে হঠাৎ বাজে কারখানার পাঞ্চজন্যধ্বনি,
দেখি দলে দলে লোক ঘুম ভেঙে ছুটেছে তখনি ;
মনে হয়, যদি বাজে মুক্তি-কারখানার তীব্র শাঁখ
তবে কি হবে না জমা সেখানে জনতা লাখে লাখ ?
জন-পাখিদের গানে মুখরিত হবে কি আকাশ ?
—ভাবে নির্বাসিত মন, চিরকাল অন্ধকারে বাস।

পাখিদের মাতামাতি : বুঝি মুক্তি নয় অসম্ভব,
যদিও ওঠে নি সূর্য, তবু আজ শুনি জনরব ॥

রৌদ্রের গান

এখানে সূর্য ছড়ায় অকৃপণ
দুহাতে তীব্র সোনার মতন মদ,
যে সোনার মদ পান ক'রে ধান ক্ষেত
দিকে দিকে তার গড়ে তোলে জনপদ।

ভারতী ! তোমার লাবণ্য দেহ ঢাকে
রৌদ্র তোমায় পরায় সোনার হার,

সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল
প্রেয়সী, তোমার কত না অহংকার

সারাটা বছর সূর্য এখানে বাঁধা
রোদে ঝলসায় মৌন পাহাড় কোনো,
অবাধ রৌদ্রে তীব্র দহন ভরা
রৌদ্রে জ্বলুক তোমার আমার মনও।

বিদেশকে আজ ডাকো রৌদ্রের ভোজে
মুঠো মুঠো দাও কোষাগার-ভরা সোনা,
প্রান্তর বন ঝলমল করে রোদে
কী মধুর আহা রৌদ্রে প্রহর গোনা।

রৌদ্রে কঠিন ইস্পাত উজ্জ্বল
ঝকমক করে ইশারা যে তার বুকে,
শূন্য নীরব মাঠে রৌদ্রের প্রজা
স্তব করে জানি সূর্যের সম্মুখে।

পথিক-বিরল রাজপথে সূর্যের
প্রতিনিধি হাঁকে আসন্ন কলরব,
মধ্যাহ্নের কঠোর ধ্যানের শেষে
জানি আছে এক নির্ভয় উৎসব।

তাইতো এখানে সূর্য তাড়ায় রাত
প্রেয়সী, তুমি কি মেঘভয়ে আজ ভীত?
কৌতুকছলে এ মেঘ দেখায় ভয়,
এ ক্ষণিক মেঘ কেটে যাবে নিশ্চিত।

সূর্য, তোমায় আজকে এখানে ডাকি—
দুর্বল মন, দুর্বলতর কায়া,
আমি যে পুরনো অচল দীঘির জল
আমার এ বুকে জাগাও প্রতিচ্ছায়া ॥

দেওয়ালী

তোর সেই ইংরাজীতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা কামনা
পেয়েছি, তবুও আমি নিরুৎসাহে আজ অন্যমনা,
আমার নেইকো সুখ, দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,
রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।
এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,
মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালী,
সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা :
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা ;
তবু তোর রঙচঙে সুমধুর চিঠির জবাবে
কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে
পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তের প্লাবনে।
যদিও সর্বদা তোর শুভ আমি চাই মনে মনে,
তবুও নতুন ক'রে আজ চাই তোর শান্তিসুখ,
মনের আঁধারে তোর শত শত প্রদীপ জ্বলুক,
এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে ?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে,
আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রঙ, নেই রোশনাই—
শুধু মাত্র ছন্দ আছে, তাই দিয়ে শুভেচ্ছা পাঠাই।

পূর্বাভাস

পূর্বাভাস

সন্ধ্যার আকাশতলে পীড়িত নিঃশ্বাসে
বিশীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ ম্লান হয়ে আসে।
বুভুক্ষু প্রেতেরা হাসে শাণিত বিদ্রূপে·
প্রাণ চাই শতাব্দীর বিলুপ্ত রক্তের—
সুষুপ্ত যক্ষেরা নিত্য কাঁদিছে ক্ষুধায়
ধূর্ত দাবাগ্নি আজ জ্বলে চুপে চুপে,
প্রমত্ত কস্তুরীমৃগ ক্ষুব্ধ চেতনায়
বিপন্ন করুণ ডাকে তোলে আর্তনাদ।
ব্যর্থ আজ শব্দভেদী বাণ—
সহস্র তির্যক্‌শৃঙ্গ করিছে বিবাদ—
জীবন-মৃত্যুর সীমানায়।
লঙ্ঘিত সম্মান
ফিরে চায় ভীরু-দৃষ্টি দিয়ে।
দুর্বল তিতিক্ষা আজ দুর্বাশার তেজে
স্বপ্ন মাঝে উঠেছে বিষিয়ে।

দূর পূর্বাকাশে,
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।
মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ—
বিস্ফারিত হিংস্র-বেদনায়।
অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান
লৌহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত,
উত্তপ্ত মাটিতে ঝরে বর্ণহীন শোণিত প্রপাত।

সুপ্তোত্থিত পিরামিড দুঃসহ জ্বালায়
পৈশাচিক ক্রূর হাসি হেসে
বিস্তীর্ণ অরণ্য মাঝে কুঠার চালায় :
কালো মৃত্যু ফিরে যায় এসে ॥

হে পৃথিবী

হে পৃথিবী, আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায়,
যদি কভু শুধু ভুল ক'রে
মনে রাখো মোরে.
বিলুপ্তি সার্থক মনে হবে
দুর্ভাগার ।
বিস্মৃত শৈশবে
যে আঁধার ছিল চারিভিতে
তারে কি নিভৃতে
আবার আপন ক'রে পাব.
ব্যর্থতার চিহ্ন এঁকে যাব.
স্মৃতির মর্মরে ?
প্রভাতপাখির কলস্বরে
যে লগ্নে করেছি অভিযান,
আজ তার তিক্ত অবসান

তবু তো পথের পাশে পাশে
প্রতি ঘাসে ঘাসে
লেগেছে বিস্ময় !
সেই মোর জয় ॥

৫

সহসা

আমার গোপন সূর্য হল অস্তগামী
এপারে মর্মরধ্বনি শুনি,
নিস্পন্দ শবের রাজ্য হতে
ক্লান্ত চোখে তাকাল শকুনি

গোধূলি আকাশ ব'লে দিল
তোমার মরণ অতি কাছে,
তোমার বিশাল পৃথিবীতে
এখনো বসন্ত বেঁচে আছে।

অদূরে নিবিড় ঝাউবনে
যে কালো ঘিরেছে নীরবতা,
চোখ তারই দীর্ঘায়িত পথে
অস্পষ্ট ভাষায় কয় কথা।

আমার দিনান্ত নামে ধীরে
আমি তো সুদূর পরাহত,

অশত্থশাখায় কালো পাখি
দুশ্চিন্তা ছড়ায় অবিরত।

সন্ধ্যাবেলা, আজ সন্ধ্যাবেলা
নিষ্ঠুর তমিস্রা ঘনাল কী!
মরণ পশ্চাতে বুঝি ছিল
সহসা উদার চোখাচোখি॥

স্মারক

আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
তবুও পড়িবে মনে,
চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে কভু হৃদয়ের আঙিনায়
রজনীগন্ধা বনে,
তবুও পড়িবে মনে।
বলাকার পাখা আজও যদি উড়ে সুদূর দিগঞ্চলে
বন্যার মহাবেগে,
তবুও আমার স্তব্ধ বুকের ক্রন্দন যাবে মেলে
মুক্তির ঢেউ লেগে,
বন্যার মহাবেগে।
বাসরঘরের প্রভাতের মতো স্বপ্ন মিলায় যদি
বিনিদ্র কলরবে
তবুও পথের শেষ সীমাটুকু চিরকাল নিরবধি

পার হয়ে যেতে হবে,
বিনিদ্র কলরবে।
মদিরাপাত্র শুষ্ক যখন উৎসবহীন রাতে
বিষণ্ণ অবসাদে।
বুঝি বা তখন সুপ্তির তৃষা ক্ষুব্ধ নয়নপাতে
অস্থির হয়ে কাঁদে,
বিষণ্ণ অবসাদে।
নির্জন পথে হঠাৎ হাওয়ার আসক্তিহীন মায়া
ধূলিরে উড়ায় দূরে,
আমার বিবাগী মনের কোনেতে কিসের গোপন ছায়া
নিঃশ্বাস ফেলে সুরে ;
ধূলিরে উড়ায় দূরে।
কাহার চকিত-চাহনি-অধীর পিছনের পানে চেয়ে
কাঁদিয়া কাটায় রাতি,
আলেয়ার বুকে জ্যোৎস্নার ছবি সহসা দেখিতে পেয়ে
জ্বালে নাই তার বাতি,
কাঁদিয়া কাটায় রাতি।
বিরহিণী তারা আঁধারের বুকে সূর্যেরে কভু হায়
দেখেনিকো কোনো ক্ষণে।
আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
হয়তো পড়িবে মনে,
রজনীগন্ধা বনে॥

নিবৃত্তির পূর্বে

দুর্বল পৃথিবী কাঁদে জটিল বিকারে,
মৃত্যুহীন ধমনীর জ্বলন্ত প্রলাপ ;
অবরুদ্ধ বক্ষে তার উন্মাদ তড়িৎ :
নিত্য দেখে বিভীষিকা পূর্ব অভিশাপ ।

ভয়ার্ত শোণিত-চক্ষে নামে কালোছায়া,
রক্তাক্ত ঝটিকা আনে মূর্ত শিহরণ—
দিক্‌প্রান্তে শোকাতুরা হাসে ক্রূর হাসি ;
রোগগ্রস্ত সন্তানের অদ্ভুত মরণ ।

দৃষ্টিহীন আকাশের নিষ্ঠুর সান্ত্বনা .
ধূ-ধূ করে চেরাপুঞ্জি—সহিষ্ণু হৃদয় ।
ক্লান্তিহারা পথিকের অরণ্য ক্রন্দন ;
নিশীথে প্রেতের বুকে জাগে মৃত্যুভয় ॥

স্বপ্নপথ

আজ রাত্রে ভেঙে গেল ঘুম,
চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম,
তন্দ্রাঘোরে দেখিলাম চেয়ে
অবিরাম স্বপ্নপথ বেয়ে

চলিয়াছে দুরাশার স্রোত,
বুকে তার বহু ভগ্ন পোত।
বিফল জীবন যাহাদের,
তারাই টানিছে তার জের ;
অবিশ্রান্ত পৃথিবীর পথে,
জলে স্থলে আকাশে পর্বতে
একদিন পথে যেতে যেতে
উষ্ণ বক্ষ উঠেছিল মেতে
যাহাদের, তারাই সংঘাতে
মৃত্যুমুখী, ব্যর্থ রক্তপাতে ॥

সুতরাং

এত দিন ছিল বাঁধা সড়ক,
আজ চোখে দেখি শুধু নরক !
এত আঘাত কি সইবে,
যদি না বাঁচি দৈবে ?
চারি পাশে লেগে গেছে মড়ক।

বহুদিনকার উপার্জন,
আজ দিতে হবে বিসর্জন !
নিষ্ফল যদি পন্থা ;
সুতরাং ছেঁড়া কন্থা ,
মনে হয় শ্রেয় বর্জন ॥

বুদ্বুদ মাত্র

মৃত্যুকে ভুলেছ তুমি তাই,
তোমার অশান্ত মনে বিপ্লব বিরাজে সর্বদাই।
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুকে স্মরণ ক'রো মনে,
মুহূর্তে মুহূর্তে মিথ্যা জীবন ক্ষরণে,—
তারি তরে পাতা সিংহাসন,
রাত্রি দিন অসাধ্য সাধন।
তবুও প্রচণ্ড-গতি জীবনের ধারা,
নিয়ত কালের কীর্তি দিতেছে পাহারা,
জন্মের প্রথম কাল হতে,
আমরা বুদ্বুদ মাত্র জীবনের স্রোতে।
এ পৃথিবী অত্যন্ত কুশলী,
যেখানে কীর্তির নামাবলী,
আমাদের স্থান নেই সেথা—
আমরা শক্তের ভক্ত, নহি তো বিজেতা॥

আলো-অন্ধকার

দৃষ্টিহীন সন্ধ্যাবেলা শীতল কোমল অন্ধকার
স্পর্শ ক'রে গেল মোরে। স্বপনের গভীর চুম্বন,
ছন্দ-ভাঙা স্তব্ধতায় ভ্রান্তি এনে দিল চিরন্তন,
অহর্নিশি চিন্তা মোর বিক্ষুব্ধ হয়েছে; প্রতিবার
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি অন্ধকারে মৃত্যুর বিস্তার।

মুহূর্ত-কম্পিত-আমি বন্ধ করি অলৌকিক গান,
প্রচ্ছন্ন স্বপন মোর আক্ষরিক মিথ্যার পাষাণ ;
কঠিন প্রলুব্ধ চিন্তা নগরীতে নিষ্ফল আমার।
তবু চাই রুদ্ধতায় আলোকের আদিম প্রকাশ-
পৃথিবীর গন্ধ নেই এমন দিবস বারোমাস।
আবার জাগ্রত মোর তুষ্ট চিন্তা নিগূঢ় ইঙ্গিতে ;
ভূঁইচাঁপা সুরভির মরণ অস্তিত্বময় নয়,
তার সাথে কল্পনার কখনো হবে না পরিচয় ;
তবু যেন আলো আর অন্ধকার মোর চারিভিতে ॥

প্রতিদ্বন্দ্বী

গন্ধ এনেছে তীব্র নেশায় ফেনিল মদির,
জোয়ার কি এল রক্ত নদীর ?
নইলে কখনো নিস্তার নেই বন্দীশালায়।
সচরাচর কি সামনা সামনি ধূর্ত পালায় ?
কাজ নেই আর বল্লাল সেন-ই আমলে,
মুক্তি পেয়েছি ধোঁয়াতে নিবিড় শ্যামলে,
তোমাতে আমাতে চিরদিন চলে দ্বন্দ্ব।
ঠাণ্ডা হাওয়ায় তীব্র বাঁশির ছন্দ
মনেরে জাগায় সাবধান হুঁশিয়ার !
খুঁজে নিতে হবে পুরাতন হাতিয়ার
পাণ্ডুর পৃথিবীতে।
আফিঙের ঘোর মেরু-বর্জিত শীতে

বিষাক্ত আর শিথিল আবেষ্টনে
তোমারে স্মরিছে মনে।
সন্ধান করে নিত্য নিভৃত রাতে
প্রতিদ্বন্দ্বী, উচ্ছল মদিরাতে ॥

আমার মৃত্যুর পর

আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন,
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লীর ঝংকারে
জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শঙ্কারে,
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার-অঞ্জন।
পরিচয়ভারে ন্যুব্জ অনেকের শোকগ্রস্ত মন,
বিস্ময়ের জাগরণে ছদ্মবেশ নেবে বিলাপের
মুহূর্তে বিস্মৃত হবে সব চিহ্ন আমার পাপের
কিছুকাল সন্তর্পণে ব্যক্ত হবে সবার স্মরণ!

আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পৃষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর ॥

স্বতঃসিদ্ধ

মৃত্যুর মৃত্তিকা 'পরে ভিত্তি প্রতিকূল—
সেখানে নিয়ত রাত্রি ঘনায় বিপুল ;
সহসা চৈত্রের হাওয়া ছড়ায় বিদায় :
স্তিমিত সূর্যের চোখে অন্ধকার ছায়।
বিরহ বন্যার বেগে প্রভাতের মেঘ
রাত্রির সীমায় এসে জানায় আবেগ,
ধূসর প্রপঞ্চ-বিশ্ব উন্মুক্ত আকাশে
অনেক বিপন্ন স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে।
তবু তো প্রাণের মর্মে প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা
অজস্র ফুলের রাজ্যে বাঁধে লঘু বাসা ;
রাত্রির বিবর্ণ স্মৃতি প্রভাতের বুকে
ছড়ায় মলিন হাসি নিরর্থ-কৌতুকে॥

মুহূর্ত

(ক)

এমন মুহূর্ত এসেছিল
একদিন আমার জীবনে
যে মুহূর্তে মনে হয়েছিল
সার্থক ভুবনে বেঁচে থাকা :
কালের আরণ্য পদপাত
ঘটেছিল আমার গুহায়।

জরাগ্রস্ত শীতের পাতারা
উড়ে এসেছিল কোথা থেকে,
সব কিছু মিশে একাকার
কাল-বোশেখীর পদার্পণে!
সেদিন হাওয়ায় জমেছিল
অদ্ভুত রোমাঞ্চ দিকে দিকে ;
আকাশের চোখে আশীর্বাদ,
চুক্তি ছিল আমৃত্যু জীবনে।
সে সব মুহূর্তগুলো আজো
প্রাণের অস্পষ্ট প্রশাখায়
ফোটায় সবুজ ফুল,
উড়ে আসে কাব্যের মৌমাছি।
অসংখ্য মুহূর্তে গ'ড়ে তোলা
স্বপ্ন-দুর্গ মুহূর্তে চুরমার।
আজ কক্ষচ্যুত ভাবি আমি
মুহূর্তকে ভুলে থাকা বৃথা ;—
যে মুহূর্ত অদৃশ্য প্লাবনে
টেনে নিয়ে যায় কক্ষান্তরে।
আজ আছি নক্ষত্রের দলে,
কাল জানি মুহূর্তের টানে
ভেসে যাব সূর্যের সভায়,
ক্ষুব্ধ কালো ঝড়ের জাহাজে॥

মুহূর্ত

(খ)

মুহূর্তকে ভুলে থাকা বৃথা ;
যে মুহূর্ত
তোমার আমার আর অন্য সকলের
মৃত্যুর সূচনা,
যে মুহূর্ত এনে দিল আমার কবিতা
আর তোমার আগ্রহ।
এ মুহূর্তে সূর্যোদয়,
ও মুহূর্তে নক্ষত্রের সভা,
আর এক মুহূর্তে দেখি কালো ঝড়ে
সুস্পষ্ট সংকেত।
অনেক মুহূর্ত মিলে পৃথিবীর
বাড়াল ফসল,
মুহূর্তে মুহূর্তে তারপর
সে ফসলে ঘনালো উচ্ছেদ।
এমন মুহূর্ত এল আমার জীবনে,
যে মুহূর্ত চিরদিন মনে রাখা যায়—
অথচ আশ্চর্য কথা,
নতুন মুহূর্ত আর এক
সে মুহূর্তে ছড়ালো বিষাদ।

অনেক মুহূর্ত গেছে অনেক জীবনে,
যে সব মুহূর্ত মিলে
আমার কাব্যের শূন্য হাতে

ভরে দিত অক্ষয় সম্পদ।
কিন্তু আজ উষ্ণ-দ্বিপ্রহরে
আমার মুহূর্ত কাটে কাব্যরচনার
দুঃসহ চেষ্টায়।
হয়তো এ মুহূর্তেই অন্য কোনো কবি
কাব্যের অজস্র প্রেরণায়
উচ্ছ্বসিত, অথচ বাধার
উদ্ধত প্রাচীর মুখোমুখি।
অতএব মুহূর্তকে মনে রাখা ভাল
যে মুহূর্ত বৃথা ক্ষয় হয়॥

গোপন মুহূর্ত আজ এক
নিশ্ছিদ্র আকাশে
অবিরাম পূর্বাচল খুঁজে
ক্লান্ত হল অস্ফুট জীবনে,
নিঃসঙ্গ স্বপ্নের আসা-যাওয়া
ধূলিসাৎ—তাই আজ দেখি,
প্রত্যেক মুহূর্ত—অনাগত
মুহূর্তের রক্তিম কপোলে
তুলে ধরে সলজ্জ প্রার্থনা॥

তরঙ্গ ভঙ্গ

হে নাবিক, আজ কোন্‌ সমুদ্রে
এল মহাঝড়,
তারি অদৃশ্য আঘাতে অবশ
মরু-প্রান্তর।
এই ভুবনের পথে চলবার
শেষ-সম্বল
ফুরিয়েছে, তাই আজ নিরুক্ত
প্রাণ চঞ্চল।

আজ জীবনেতে নেই অবসাদ !
কেবল ধ্বংস, কেবল বিবাদ—
এই জীবনের একী মহা উৎকর্ষ !
পথে যেতে যেতে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ।

২

(ছুটি আজ চাই ছুটি,
চাই আমাদের সকালে বিকালে দুটি
নুন-ভাত, নয় আধপোড়া কিছু রুটি।)
—একী অবসাদ ক্লান্তি নেমেছে বুকে,
তাইতো শক্তি হারিয়েছি আজ
দাঁড়াতে পারি না রুখে।
বন্ধু, আমরা হারিয়েছি বুঝি প্রাণধারণের শক্তি,
তাইতো নিঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।
এর চেয়ে ভাল মনে হয় আজ পুরনো দিন,
আমাদের ভাল পুরনো, চাই না বৃথা নবীন॥

আসন্ন আঁধারে

নিশুতি রাতের বুকে গলানো আকাশ ঝরে
ত্বনিয়ায় ক্লান্তি আজ কোথা ?

নিঃশব্দে তিমির স্রোত বিরক্ত-বিস্বাদে
প্রগল্‌ভ আলোর বুকে ফিরে যেতে চায় ।
—তবে কেন কাঁপে ভীরু বুক ?
স্বেদ-সিক্ত ললাটের শেষ বিন্দুটুকু
প্রখর আলোর সীমা হতে
বিচ্ছিন্ন করেছে যেন সাহারার নীরব ইঙ্গিতে ।
কেঁদেছিল পৃথিবীর বুক !
গোপনে নির্জনে
ধাবমান পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের কাছে
পেয়েছিল অতীত বারতা ?
মেরুদণ্ড জীর্ণ তবু বিকৃত ব্যথায়
বার বার আর্তনাদ করে
আহত বিক্ষত দেহ,—মুমূর্ষু চঞ্চল,
তবুও বিরাম কোথা ব্যগ্র আঘাতের ।

প্রথম পৃথিবী আজ জ্বলে রাত্রিদিন
আবাল্যের সঞ্চিত দাহনে
চিরদিন দ্বন্দ্ব চলে জোয়ার ভাঁটায় ;
আষাঢ়ের ক্ষুব্ধ-ছায়া বসন্তের বুকে
এসে পড়েছিল একদিন—
উদ্‌ভ্রান্ত পৃথিবী তাই ছুটেছে পিছনে
আলোরে পশ্চাতে ফেলি, দূরে—বহু দূরে

যত দূরে দৃষ্টি যায়—
চেয়ে দেখি ঘিরেছে কুয়াশা।
উড়ন্ত বাতাসে আজ কুমেরু কঠিন
কোথা হতে নিয়ে এল জড়-অন্ধকার ;
—এই কি পৃথিবী ?
একদিন জ্বলেছিল বুকের জ্বালায়—
আজ তার শব দেহ নিঃস্পন্দ অসাড় ॥

পরিবেশন

সান্ধ্য ভিড় জমে ওঠে রেস্তোঁরার দুর্লভ আসরে,
অর্থনীতি, ইতিহাস সিনেমার পরিচ্ছন্ন পথে—
খুঁজে ফেরে অনন্তের বিলুপ্ত পর্যায়।
গন্ধহীন আনন্দের অন্তিম নির্যাস্
এক কাপ চা-এ আর রঙিন সজ্জায়।
সম্প্রতি নীরব হল ; বিনিদ্র বাসরে
ধূমপান চলে : তবে ভবতরী তাস।
স্মৃতি-ভ্রষ্ট উঞ্ছজীবী চলে কোন মতে।

জড়-ভরতের দল বসে আছে পার্কের বেঞ্চিতে,
পবিত্র জাহ্নবী-তীরে প্রার্থী যত বেকার যুবক।
কতক্ষণ ?   গঞ্জনার বড় তীব্র জ্বালা—
বিবাগী প্রাণের তবু গৃহগত টান।

ক্রমে গোঠে সন্ধ্যা নামে : অন্তরও নিরালা,
এই বার ফিরে চলো, ভাগ্য সবই মিতে ;
দূরে বাজে একটানা রেডিয়োর গান।
এখনো হয় নি শূন্য, ক্রমাগত বেড়ে চলে সখ।

ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে, আগমনী পশ্চিমা হাওয়ায়,
সুপ্রাচীন গুরুভক্তি আজো আনে উন্মত্ত লালসা।
চুপ করে বসে থাকো অন্ধকার ঘরে এক কোণে :—
রাম আর রাবণের উভয়েরই হাতে তীক্ষ্ণ কশা॥

অসহ্য দিন

অসহ্য দিন! স্নায়ু উদ্বেল! শ্লথ পায়ে ঘুরি ইতস্তত
অনেক দুঃখে রক্ত আমার অসংযত!
মাঝে মাঝে যেন জ্বালা করে এক বিরাট ক্ষত
হৃদয়গত।
ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
দিন রাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে
এখানে ওখানে, পথে চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত,
মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত॥

উৎসর্গ

[illegible]

বন্ধু, তোমার [illegible] [illegible] সুতীক্ষ্ণ [illegible]
[illegible] মাঝে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] এসে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] হারায়ে হারায়ে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] ও [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

বন্ধু, তোমার [illegible] সুতীক্ষ্ণ [illegible]
[illegible] মাঝে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।।

উদ্যোগ

বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
ঘরে তোল ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখ কাস্তে,
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ করো শক্ত,
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত
আজকে মজুর হাতুড়ির সুর ক্রমশই করে দৃপ্ত,
আসে সংহতি ; শত্রুর প্রতি ঘৃণা হয় নিক্ষিপ্ত।
ভীরু অন্যায় প্রাণ-বন্যায় জেনো আজ উচ্ছেদ্য,
বিপন্ন দেশে তাই নিঃশেষে ঢালো প্রাণ দুর্ভেদ্য।
সব প্রস্তুত যুদ্ধের দূত হানা দেয় পুব-দরজায়,
ফেণী ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গর্জায়।
বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত॥

পরাভব

হঠাৎ ফাল্গুনী হাওয়া ব্যাধিগ্রস্ত কলির সন্ধ্যায় :
নগরে নগররক্ষী পদাতিক পদধ্বনি শুনি ;—
দূরাগত স্বপ্নের কী দুর্দিন,—মহামারী, অন্তরে বিক্ষোভ--

অবসন্ন বিলাসের সংকুচিত প্রাণ।
ব্যক্তিত্বের গাত্রদাহ ; রন্ধ্রহীন স্বধর্ম বিকাশ,
অতীতের ভগ্ননীড় এইবার সুপুষ্ট সন্ধ্যায়।
বণিকের চোখে আজ কী দুরন্ত লোভ ঝ'রে পড়ে,—
বৈশাখের ঝড়ে তারই অস্পষ্ট চেতনা।
ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায় ··
নশ্বর পৌষের দিন চারিদিকে ধূর্তের সমতা :
জটিল আবর্তে শুধু নৈমিত্তিক প্রাণের স্পন্দন।
গলিত উদ্যম তাই বৈরাগ্যের ভাণ,—
প্রকাশ্য ভিক্ষার ঝুলি কালক্রমে অত্যন্ত উদার ;
সংক্রামিত রক্ত-রোগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে।
শোকাচ্ছন্ন আমাদের সনাতন মন,
পৃথিবীর সম্ভাবিত অকাল মৃত্যুতে,
দুর্দিনের সমন্বয়, সম্মুখেতে অনন্ত প্রহর।
বিজিগীষা ?—সন্দিহান আগামী দিনেরা :
দৃষ্টিপথ অন্ধকার, (লাল-সূর্য মুক্তির প্রতীক ?
—আজ তবে প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্য বাসর।)

বিভীষণের প্রতি

আমরা সবাই প্রস্তুত আজ, ভীরু পলাতক !
লুপ্ত অধুনা এদেশে তোমার গুপ্তঘাতক,
হাজার জীবন বিকশিত এক রক্ত-ফুলে,
পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।

অভিজ্ঞতার আগুনে শুদ্ধ অতীত পাতক,
এখানে সবাই সংঘবদ্ধ, যে নবজাতক।

ক্রমশ এদেশে গুচ্ছবদ্ধ রক্ত-কুসুম
ছড়ায় শত্রু-শবের গন্ধ, ভাঙে ভীত ঘুম।
এখানে কৃষক বাড়ায় ফসল মিলিত হাতে,
তোমার স্বপ্ন চূর্ণ করার শপথ দাঁতে,
যদিও নিত্য মূর্খ বাধার ব্যর্থ জুলুম :
তবু শত্রুর নিধনে লিপ্ত বাসনার ধুম।

মিলিত ও ক্ষত পায়ের রক্তে গড়ে লালপথ,
তাইতো লক্ষ মুঠিতে ব্যক্ত দৃঢ় অভিমত।
ক্ষুধিত প্রাণেব অক্ষরে লেখা, "প্রবেশ নিষেধ,
এখানে সবাই ভুলেছে দ্বন্দ্ব, ভুলেছে বিভেদ।"
দুর্ভিক্ষ ও শত্রুর শেষ হবে যুগপৎ,
শোণিত ধারার উষ্ণ ঐক্যে ঘনায় বিপদ॥

জাগবার দিন আজ

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে ;
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়া ছবি ভাসছে—
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশী জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।

আজকের দিন নয় কাব্যের—
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের ;
শরতের অবকাশে শোনা যায় আকাশের বাঁশরী,
কিন্তু বাঁশরী বৃথা, জমবে না আজ কোনো আসর-ই ।
আকাশের প্রান্তে যে মৃত্যুর কালো পাখা বিস্তার—
মৃত্যু ঘরের কোণে, আজ আর নেই জেনো নিস্তার ;
মৃত্যুর কথা আজ ভাবতেও পাও বুঝি কষ্ট,
আজকের এই কথা জানি লাগবেই অস্পষ্ট,
তবুও তোমার চাই চেতনা,
চেতনা থাকলে আজ দুর্দিন আশ্রয় পেত না,
আজকে রঙিন খেলা নিষ্ঠুর হাতে করো বর্জন,
আজকে যে প্রয়োজন প্রকৃত দেশপ্রেম অর্জন ;
তাই এসো চেয়ে দেখি পৃথ্বী—
কোনখানে ভাঙে আর কোনখানে গড়ে তার ভিত্তি ।
কোনখানে লাঞ্ছিত মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব,
কোনখানে দানবের 'মরণ-যজ্ঞ' চলে নিত্য ;
পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সঙ্গে ;
সংগ্রাম শুরু করো মুক্তির,
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির ।
আজকে শপথ করো সকলে
বাঁচাব আমার দেশ, যাবে না তা শত্রুর দখলে ;
তাই আজ ফেলে দিয়ে তুলি আর লেখনী,
একতাবদ্ধ হও এখনি ॥

ঘুমভাঙার গান

মাথা তোল তুমি বিন্ধ্যাচল,
          মোছ উদ্‌গত অশ্রুজল
যে গেল সে গেল, ভেবে কি ফল ?
          ভোল ক্ষত !

তুমি প্রতারিত বিন্ধ্যাচল,
          বোঝ নি ধূর্ত চতুর ছল,
হাসে যে আকাশচারীর দল,
          অনাহত ।

শোন অবনত বিন্ধ্যাচল,
          তুমি নও ভীরু বিগত বল
কাঁপে অবাধ্য হৃদয়দল
          অবিরত ।

কঠিন, কঠোর, বিন্ধ্যাচল,
          অনেক ধৈর্যে আজো অটল
ভাঙো বিঘ্নকে : করো শিকল
          পদাহত ।

বিশাল, ব্যাপ্ত বিন্ধ্যাচল,
          দেখ সূর্যের দর্পানল ;
ভুলেছে তোমার দৃঢ় কবল
          বাধা যত ।

সময় যে হল বিন্ধ্যাচল,
ছেঁড় আকাশের উঁচু ত্রিপল
দ্রুত বিদ্রোহে হানো উপল
' শত শত ॥

হদিশ

আমি সৈনিক, হাঁটি যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রভাতী আলোয়, অনেক ক্লান্ত দিনের পরে,
অজ্ঞাত এক প্রাণের ঝড়ে।

বহু শতাব্দী ধরে লাঞ্ছিত, পাই নি ছাড়া
বহু বিদ্রোহ দিয়েছে মনের প্রান্ত নাড়া
তবু হতবাক্ দিই নি সাড়া !

আমি সৈনিক, দাসত্ব কাঁধে যুদ্ধে যেতে
দেখেছি প্রাণের উচ্ছ্বাস দূরে ধানের ক্ষেতে
তবু কেন যেন উঠি নি মেতে।

কত সান্ত্বনা খুঁজেছি আকাশে গভীর নীলে
শুধু শূন্যতা এনেছে বিষাদ এই নিখিলে
মূঢ় আতঙ্ক জন-মিছিলে।

ক্ষতবিক্ষত চলেছি হাজার, তবুও একা
সামনে বিরাট শত্রু পাহাড় আকাশ-ঠেকা
কোন সূর্যের পাই নি দেখা।

অনেক রক্ত দিয়েছি বিমূঢ় বিনা কারণে,
বিরোধী স্বার্থ করেছি পুষ্ট অযথা রণে;
সঙ্গীবিহীন প্রাণধারণে।

ভীরু সৈনিক করেছি দলিত কত বিক্ষোভ
ইন্ধন চেয়ে যখনি জ্বলেছে কুবেরীর লোভ
দিয়েছি তখনি জন-খাণ্ডব।

একদা যুদ্ধ শুরু হল সারা বিশ্ব জুড়ে,
জগতের যত লুণ্ঠনকারী আর মজুরে,
চঞ্চল দিন ঘোড়ার খুরে।

উঠি উদ্ধত প্রাণের শিখরে, চারিদিকে চাই
এল আহ্বান জন-পুঞ্জের শুনি রোশনাই
দেখি ক্রমাগত কাছে উৎরাই।

হাতছানি দিয়ে গেল শস্যের উন্নত শীষ,
জনযাত্রায় নতুন হদিশ—
সহসা প্রাণের সবুজে সোনার দৃঢ় উষ্ণীষ॥

দেয়ালিকা

এক

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা।
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা ॥

দুই

সকালে বিকালে মনের খেয়ালে
ইঁদারায়
দাঁড়িয়ে থাকলে অর্থটা তার
কি দাঁড়ায় ?

তিন

কখন বাজল ছ'টা
প্রাসাদে প্রাসাদে ঝল্‌সায় দেখি
শেষ সূর্যের ছটা—
স্তিমিত দিনের উদ্ধত ঘনঘটা ॥

চার

বেজে চলে রেডিও
সর্বদা গোলমাল করতেই
'রেডি' ও ॥

পাঁচ

জাপানী গো জাপানী
ভারতবর্ষে আসতে কি শেষ
ধরে গেল হাঁপানী ?

ছয়

জার্মানী গো জার্মানী
তুমি ছিলে অজেয় বীর
এ কথা আজ আর মানি ?

সাত

হে রাজকন্যে
তোমার জন্যে
এ জনারণ্যে
নেইকো ঠাঁই—
জানাই তাই ॥

আট

আঁধিয়ারে কেঁদে কয় সল্‌তে :
'চাইনে চাইনে আমি জ্বলতে ॥'

প্রথম বার্ষিকী

আরবার ফিরে এল বাইশে শ্রাবণ।
আজ বর্ষশেষে হে অতীত,
কোন সম্ভাষণ
জানাব অলক্ষ্য পানে?
ব্যথাক্ষুব্ধ গানে,
ঝরাব শ্রাবণ বরিষণ!
দিনে দিনে, তিলে তিলে যে বেদনা
উদাস মধুর
হয়েছে নিঃশব্দ প্রাণে
ভরেছে বিপুল টানে,
তারে আজ দেব কোন সুর?
তোমার ধূসর স্মৃতি, তোমার কাব্যের সুরভিতে
লেগেছে সন্ধ্যার ছোঁওয়া, প্রাণ ভরে দিতে
হেমন্তের শিশিরের কণা
আমি পারিব না।
প্রশান্ত সূর্যাস্ত পরে দিগন্তের যে রাগ-রক্তিমা,
লেগেছে প্রাণের 'পরে,
সহসা স্মৃতির ঝড়ে
মুছিয়া যাবে কী তার সীমা!
তোমার সন্ধ্যার ছায়াখানি
কোন পথ হতে মোরে
কোন পথে নিয়ে যাবে টানি'
অমর্ত্যের আলোক সন্ধানী
আমি নাহি জানি।

একদা শ্রাবণ দিনে গভীর চরণে,
নীরবে নিষ্ঠুর সরণিতে
পাদস্পর্শ দিতে
ভিক্ষুক মরণে
পেয়েছ পথের মধ্যে দিয়েছ অক্ষয়
তব দান,
হে বিরাট প্রাণ।
তোমার চরণ স্পর্শে রোমাঞ্চিত পৃথিবীর ধূলি
উঠিছে আকুলি,'
আজিও স্মৃতির গন্ধে ব্যথিত জনতা
কহিছে নিঃশব্দ স্বরে একমাত্র কথা,
"তুমি হেথা নাই"।
বিস্ময়ের অন্ধকারে মুহ্যমান জলস্থল তাই
আধো তন্দ্রা, আধো জাগরণে
দক্ষিণ হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে
ফেলিছে নিঃশ্বাস।
ক্লেদক্লিষ্ট পৃথিবীতে একী পরিহাস!
তুমি চলে গেছ তবু আজিও বহিছে বারোমাস
উদ্দাম বাতাস,
এখনো বসন্ত আসে
সকরুণ বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে,
এখনো শ্রাবণ ঝরোঝর
অবিশ্রান্ত মাতায় অন্তর।
এখনো কদম্ব বনে বনে
লাগে দোলা মত্ত সমীরণে
এখনো উদাসি'

শরতে কাশের ফোটে হাসি।
জীবনে উচ্ছ্বাস, হাসি গান
এখনো হয় নি অবসান।
এখনো ফুটিছে চাঁপা হেনা,
কিছুই তো তুমি দেখিলে না।
তোমার কবির দৃষ্টি দিয়ে
কোনো কিছু দিলে না চিনিয়ে।
এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়,
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায়;
স্বার্থের প্রাচীরতলে মানুষের সমাধি রচনা,
অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা
পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,
মিথ্যা ছলনাতে—
আজিকার মানুষের জয়;
প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়॥

তারুণ্য

হে তারুণ্য, জীবনের প্রত্যেক প্রবাহ
অমৃতের স্পর্শ চায়; অন্ধকারময়
ত্রিকালের কারাগৃহ ছিন্ন করি'
উদ্দাম গতিতে বেদনা-বিদ্যুৎ-শিখা
জ্বালাময় আত্মার আকাশে, উর্ধ্বমুখী
আপনারে দগ্ধ করে প্রচণ্ড বিস্ময়ে।

জীবনের প্রতি পদক্ষেপ তাই বুঝি
ব্যথাবিদ্ধ বিষণ্ন বিদায়ে। রক্তময়
দ্বিপ্রহরে অনাগত সন্ধ্যার আভাসে
তোমার অক্ষয় বীজ অঙ্কুরিত যবে
বিষ-মগ্ন রাত্রিবেলা কালের হিংস্রতা
কণ্ঠরোধ করে অবিশ্বাসে। অগ্নিময়
দিনরাত্রি মোর ; আমি যে প্রভাতসূর্য
স্পর্শহীন অন্ধকারে চৈতন্যের তীরে
উন্মাদ, সন্ধান করি বিশ্বের বন্যায়
সৃষ্টির প্রথম সুর। বজ্রের ঝংকারে
প্রচণ্ড ধ্বংসের বার্তা আমি যেন পাই
মুক্তির পুলক-লুব্ধ বেগে একী মোর
প্রথম স্পন্দন ! আমার বক্ষের মাঝে
প্রভাতের অস্ফুট কাকলি, হে তারুণ্য,
রক্তে মোর আজিকার বিদ্যুৎ-বিদায়
আমার প্রাণের কণ্ঠে দিয়ে গেল গান ;
বক্ষে মোর পৃথিবীর সুর। উচ্ছ্বসিত
প্রাণে মোর রোমাঞ্চিত আদিম উল্লাস।
আমি যেন মৃত্যুর প্রতীক। তাণ্ডবের
সুর যেন নৃত্যময় প্রতি অঙ্গে মোর,
সম্মুখীন সৃষ্টির আশ্বাসে। মধ্যাহ্নের
ধ্যান মোর মুক্তি পেল তোমার ইঙ্গিতে
তারুণ্যের ব্যর্থ বেদনায় নিমজ্জিত
দিনগুলি যাত্রা করে সম্মুখের টানে।
নৈরাশ্য নিঃশ্বাসে ক্ষত তোমার বিশ্বাস
প্রতিদিন বৃদ্ধ হয় কালের কর্দমে !

হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রী সঙ্গীত বিহীন,
আকাশের স্বপ্ন মাঝে রাত্রির জিজ্ঞাসা
ক্ষয় হয়ে যায়। নিভৃত ক্রন্দনে তাই
পরিশ্রান্ত সংগ্রামের দিন। বহ্নিময়
দিনরাত্রি চক্ষে মোর এনেছে অন্তিম।
ধ্বংস হোক, লুপ্ত হোক ক্ষুধিত পৃথিবী
আর সর্পিল সভ্যতা। ইতিহাস
স্তুতিময় শোকের উচ্ছ্বাস। তবু আজ
তারুণ্যের মুক্তি নেই, মুমূর্ষু মানব।
প্রাণে মোর অজানা উত্তাপ অবিরাম
মুগ্ধ করে পুষ্টিকর রক্তের সঙ্কেতে!
পরিপূর্ণ সভ্যতা সঞ্চয়ে আজ যারা
রক্তলোভী বর্ধিত প্রলয় অন্বেষণে,
তাদের সংহার করো মৃতের মিনতি।
অন্ধ তমিস্রার স্রোতে দূরগামী দিন
আসন্ন রক্তের গন্ধে মূর্ছিত সভয়ে।
চলেছে রাত্রির যাত্রী আলোকের পানে
দূর হতে দূরে। বিফল তারুণ্য-স্রোতে
জরাগ্রস্ত কিশলয় দিন। নিত্যকার
আবর্তনে তারুণ্যের উদ্‌গত উদ্যম
বার্ধক্যের বেলাভূমি 'পরে অতর্কিতে
স্তব্ধ হয়ে যায়। তবু, হায়রে পৃথিবী,
তারুণ্যের মর্মকথা কে বুঝাবে তোরে!
কালের গহ্বরে খেলা করে চিরকাল
বিস্ফোরণহীন। স্তিমিত বসন্তবেগ
নিরুদ্দেশ যাত্রা করে জোয়ারের জলে।

অন্ধকার, অন্ধকার, বিভ্রান্ত বিদায় ;
নিশ্চিত ধ্বংসের পথে ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবী ।
বিকৃত বিশ্বের বুকে প্রকম্পিত ছায়া
মরণের, নক্ষত্রের আহ্বানে বিহ্বল
তারুণ্যের হৃৎপিণ্ডে বিদীর্ণ বিলাস ।
ক্ষুব্ধ অন্তরের জ্বালা, তীব্র অভিশাপ :
পর্বতের বক্ষমাঝে নির্ঝর-গুঞ্জনে
উৎস হতে ধাবমান দিক্‌-চক্রবালে ।
সম্মুখের পানপাত্রে কী দুর্বার মোহ,
তবু হায় বিপ্রলব্ধ রিক্ত হোমশিখা !
মত্ততায় দিক্‌ভ্রান্তি, প্রাণের মঞ্জরী
দক্ষিণের গুঞ্জরণে নিষ্ঠুর প্রলাপে
অস্বীকার করে পৃথিবীরে । অলক্ষিতে
ভূমিলগ্ন আকাশকুসুম ঝরে যায়
অস্পষ্ট হাসিতে । তারুণ্যের নীলরক্ত
সহস্র সূর্যের স্রোতে মৃত্যুর স্পর্ধায়
ভেসে যায় দিগন্ত আঁধারে । প্রত্যুষের
কালো পাখি গোধূলির রক্তিম ছায়ায়
আকাশের বার্তা নিয়ে বিনিদ্র তারার
বুকে ফিরে গেল নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় ।
দিনের পিপাসু দৃষ্টি, রাত্রি ঝরে
বিবর্ণ পথের চারিদিকে । ভয়ঙ্কর
দিনরাত্রি প্রলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বে লীন ;
তারুণ্যের প্রত্যেক আঘাতে কম্পমান
উর্বর-উচ্ছেদ । অশরীরী আমি আজ
তারুণ্যের তরঙ্গের তলে সমাহিত

উত্তপ্ত শয্যায়। ক্রমাগত শতাব্দীর
বন্দী আমি অন্ধকারে কেন খুঁজে ফিরি
অদৃশ্য সূর্যের দীপ্তি উচ্ছিষ্ট অন্তরে।
বিদায় পৃথিবী আজ, তারুণ্যের তাপে
নিবদ্ধ পথিক দৃষ্টি উদ্বুদ্ধ আকাশে
সার্থক আমার নিত্য-লুপ্ত পরিক্রমা
ধ্বনিময় অনন্ত প্রান্তরে। দূরগামী
আমি আজ উদ্বেলিত পশ্চাতের পানে
উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি রেখে যাই
সম্মুখের ডাকে। শাশ্বত ভাস্বর পথে
আমার নিষিদ্ধ আয়োজন, হিমাচ্ছন্ন
চক্ষে মোর জড়তার ঘন অন্ধকার।
হে দেবতা আলো চাই, সূর্যের সঞ্চয়
তারুণ্যের রক্তে মোর কী নিঃসীম জ্বালা
অন্ধকার-অরণ্যের উদ্দাম উল্লাস
লুপ্ত হোক আশঙ্কায় উদ্ধত মৃত্যুতে॥

মৃত পৃথিবী

পৃথিবী কি আজ শেষে নিঃস্ব
ক্ষুধাতুর কাঁদে সারা বিশ্ব,
চারিদিকে ঝরে পড়া রক্ত,
জীবন আজকে উত্যক্ত।

আজকের দিন নয় কাব্যের
পরিণাম আর সম্ভাব্যের
ভয় নিয়ে দিন কাটে নিত্য,
জীবনে গোপন দুর্বৃত্ত ।
তাইতো জীবন আজ রিক্ত,
অলস হৃদয় স্বেদসিক্ত ;
আজকে প্রাচীর গড়া ভিন্ন
পৃথিবী ছড়াবে ক্ষতচিহ্ন ।
অগোচরে নামে হিম-শৈত্য,
কোথায় পালাবে মরু দৈত্য ?
জীবন যদিও উৎক্ষিপ্ত,
তবু তো হৃদয় উদ্দীপ্ত,
বোধহয় আগামী কোনো বন্যায়,
ভেসে যাবে অনশন, অন্যায় ॥

●

দুর্মর

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলা দেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে ।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,

গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলা দেশের প্রাণ।

"হয় ধান নয় প্রাণ" এ শব্দে
সারা দেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।

সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয় :
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ॥

গীতি-গুচ্ছ

১

ওগো কবি তুমি আপন ভোলা,
আনিলে তুমি নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা !
মালাখানি নিয়ে মোর
একী বাঁধিলে অলখ ডোর !
নিবেদিত প্রাণে গোপনে তোমার কী সুর
তোলা !
জেনেছ তো তুমি অজানা প্রাণের
নীরব কথা !
তোমার বাণীতে আমার মনের
এ ব্যাকুলতা—
পেয়েছ কী তুমি সাঁঝের বেলাতে,
যখন ছিলাম কাজের খেলাতে
তখন কী তুমি এসেছিলে—
ছিল দুয়ার খোলা ॥

২

এই নিবিড় বাদল দিনে
কে নেবে আমায় চিনে,
জানিনে তা।
এই নব ঘন ঘোরে,
কে ডেকে নেবে মোরে

কে নেবে হৃদয় কিনে,
উদাসচেতা ?
পবন যে গহন ঘুম আনে,
তার বাণী দেবে কী কানে,
যে আমার চিরদিন
অভিপ্রেতা !
শ্যামল রঙ বনে বনে,
উদাস সুর মনে মনে,
অদেখা বাঁধন বিনে
ফিরে কি আসবে হেথা ?

৩

গানের সাগর পাড়ি দিলাম
সুরের তরঙ্গে,
প্রাণ ছুটেছে নিরুদ্দেশে
ভাবের তুরঙ্গে।
আমার আকাশ মীড়ের মূর্ছনাতে
উধাও দিনে রাতে
তান তুলেছে অন্তবিহীন
রসের মৃদঙ্গে।
আমি কবি সপ্তসুরের ডোরে,
মগ্ন হলাম অতল ঘুম-ঘোরে ;

জয় করেছি জীবনে শঙ্কারে,
মোর বীণা ঝংকারে ;
গানের পথের পথিক আমি
সুরেরই সঙ্গে ॥

৪

হে মোর মরণ, হে মোর মরণ !
বিদায় বেলা আজ একেলা
দাও গো শরণ
তুমি আমার বেদনাতে
দাও আলো আজ এই ছায়াতে
ফোটার গন্ধে অলস ছন্দে
ফেলিও চরণ ॥
তোমার বুকে অজানা স্বাদ,
ক্লান্তি আনো, দাও অবসাদ ;
তোমায় আমি দিবসযামী
করিনু বরণ
তোমার পায়ে কী আছে যে,
জীবনবীণা উঠেছে বেজে ?
আমায় তুমি নীরব চুমি
করিও হরণ ॥

৫

দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে
যেয়ো না চলে,
অরুণ-আলো কে যে দেবে
যাও গো বলে।
ফেরো তুমি যাবার বেলা,
সাঁঝ আকাশে রঙের মেলা
দেখেছ কী কেমন ক'রে
আগুন হয়ে উঠল জ্বলে।
পূব গগনের পানে বারেক তাকাও,
বিরহেরই ছবি কেন আঁকাও ?
আঁধার যেন প্লাবন সম আসছে বেগে
শেষ হয়ে যাক তারা তোমার
ছোঁয়াচ লেগে।
থামো ওগো, যেয়ো না হয়
সময় হলে ॥

৬

শয়ন শিয়রে ভোরের পাখির রবে
তন্দ্রা টুটিল যবে।
দেখিলাম আমি খোলা বাতায়নে
তুমি আনমনা কুসুম চয়নে

অন্তর মোর ভরে গেল সৌরভে।
সন্ধ্যায় যবে ক্লান্ত পাখিরা ধীরে,
ফিরিছে আপন নীড়ে,
দেখিলাম তুমি এলে নদীকূলে
চাহিলে আমায় ভীরু আঁখি তুলে
হৃদয় তখনি উড়িল অজানা নভে॥

৭

ও কে যায় চলে কথা না বলে দিও না যেতে,
তাহারই তরে আসন ঘরে রেখেছি পেতে।
কেন সে সুধার পাত্র ফেলে
চলে যেতে চায় আজ অবহেলে
রামধনু রথে বিদায়ের পথে উঠিছে মেতে॥

রঙে রঙে আজ গোধূলি গগন,
নহেকো রঙিন, বিলাপে মগন।
আমি কেঁদে কই যেয়ো না কোথাও,
সে যে হেসে কয় মোরে যেতে দাও,
বাড়ায়ে বাহু বিরহ-রাহু চাহিছে পেতে॥

৮

হে পাষাণ, আমি নির্ঝরিণী
তব হৃদয়ে দাও ঠাঁই।
আমার কল্লোলে
নিঠুর যায় গ'লে
ঢেউয়েতে প্রাণ দোলে,
—তবু নীরব সদাই!
আমার মর্মেতে কী গান ওঠে মেতে
জানো না তুমি তা,
তোমার কঠিন পায় চির দিবসই হায়
রহিনু অবনতা।
যতই কাছে আসি,
আমারে মৃদু হাসি
করিছ পরবাসী,
তোমাতে প্রেম নাই॥

৯

শীতের হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে,
শিউলি-বকুল উদাস হল ক্ষণে ক্ষণে,
ধূলি-ওড়া পথের 'পরে
বনের পাতা শীতের ঝড়ে
যায় ভেসে ক্ষীণ মলিন হেসে আপন মনে

রাতের বেলা বইল বাতাস নিরুদ্দেশে,
কাঁপনটুকু রইল শুধু বনের শেষে।
কাশের পাশে হিমের হাওয়া,
কেবল তারি আসা যাওয়া—
সব-ঝরাবার মন্ত্রণা সে দিল শুধুই সংগোপনে ॥

১০

কিছু দিয়ে যাও এই ধূলিমাখা পান্থশালায়,
কিছু মধু দাও আমার বুকের ফুলের মালায়।
কত জন গেল এ পথ দিয়ে
আমার বুকের সুবাস নিয়ে
কিছু ধন তারা দিয়ে গেল মোর সোনার থালায়।

পথ চেয়ে আমি বসে আছি হেথা তোমার আশে
তুমি এসে যদি কাছে বসো প্রিয় আমার পাশে।
কিছু কথা বল আমার সনে,
ঢেউ তুলে যাও নীরব মনে,
এইটুকু শুধু দাও তুমি ওগো আমার ডালায় ॥

১১

ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি কর ক্ষমা,
মুক্তি দাও হে এ-মরু তরুরে, প্রিয়তমা।
ছিন্ন কর এ গ্রন্থিডোর
রিক্ত হয়েছে চিত্ত মোর
নেমেছে আমার হৃদয়ে শ্রান্তি ঘন-অমা।

যে আসব ছিল তোমার পাত্রে,
শোষণ করেছি দিনে ও রাত্রে।
রসের সিন্ধু মন্থন শেষে,
গরল উঠেছে তব উদ্দেশে,
তুমি আর নহ আমার অতীত, হে মনোরমা।

১২

সাঁঝের আঁধার ঘিরল যখন
শাল-পিয়ালের বন,
তারই আভাস দিল আমায়
হঠাৎ সমীরণ।
কুটির ছেড়ে বাইরে এসে দেখি
আকাশকোণে তারার লেখালেখি
শুরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ।

আজকে আমার মনের কোণে
কে দিল যে গান,
ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি
রোমাঞ্চিত প্রাণ।
আকাশতলে বিমুক্ত প্রান্তরে,
উধাও হয়ে গেলাম ক্ষণ তরে !
কার ইশারায় হলাম অন্যমন ॥

১৩

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি,
মম অন্তর-প্রাঙ্গণে আসন্ন হল আগমনী।
ঘুমভাঙা উদ্বেল রাতে,
আধ-ফোটা ভীরু জ্যোৎস্নাতে
কার চরণের ছোঁয়া হৃদয়ে উঠিল রণরণি।

মেঘ-অঞ্জন-ঘন কার এই আঁখি পাতে লিখা,
বন্দন-নন্দিত উৎসবে জ্বালা দীপশিখা।
মুকুলিত আপনার ভারে
টলিয়া পড়িছে বারে বারে
সংগীত হিল্লোলে কে সে স্বপনের অগ্রণী ॥

১৪

মেঘ-বিনিন্দিত স্বরে—
কে তুমি আমারে ডাকিলে শ্রাবণ বাতাসে ?
তোমার আহ্বান ধ্বনি—
পরশিয়া মোরে গরজিল দূর আকাশে ।
বেদনা বিভোল আমি
ক্ষণেক দুয়ারে থামি
বাহিরে ধূসর দিনে—
ছুটে চলি পথে মদির-বিবশ নিশাসে ।

মেঘে মেঘে ছাওয়া মলিন গগনে,
কোন আয়োজন ছিল আনমনে ।
বাহিরে কী ঘনঘটা,
ভিতরে বিজলী-ছটা
মত্ত ভিতরে বাহিরে—
আজ কি কাটিবে বিরহ বিধুর হতাশে ॥

১৫

গুঞ্জরিয়া এল অলি ;
যেথা নিবেদন অঞ্জলি ।
পুষ্পিত কুসুমের দলে
গুনগুন গুঞ্জিয়া চলে

দলে দলে যেথা ফোটা-কলি

আমার পরাণে ফুল ফুটিল যবে,
তখন মেতেছি আমি কী উৎসবে।
আজ মোর ঝরিবার পালা,
সব মধু হয়ে গেছে ঢালা;
আজ মোরে চলে যেও দলি।

১৬

কোন অভিশাপ নিয়ে এল এই
বিরহ বিধুর-আষাঢ়।
এখানে বুঝি বা শেষ হয়ে গেছে
উচ্ছল ভালবাসার।
বিরহী যক্ষ রামগিরি হতে
পাঠাল বারতা জলদের স্রোতে
প্রিয়ার কাছেতে জানাতে চাহিল-
সব শেষ সব আশার

আমার হৃদয়ে এল বুঝি সেই মেঘ,
সেই বিহ্বল পর্বত-উদ্বেগ।
তাই এই ভরা বাদল আঁধারে
মন উন্মন হল বারে বারে

হৃদয় তাইতো সমুখীন হল
বিপুল সর্বনাশার

১৭

ভুল হল বুঝি এই ধরণীতলে,
তাই প্রাণে চিরকাল আগুন জ্বলে
তাই আগুন জ্বলে
দিনের শেষে
এক প্লাবন এসে
জানি ঘিরিবে আমার মন কৌতূহলে,
নব কৌতূহলে।
আমার জীবনে ভুল ছিল না বুঝি,
তাই বারে বারে সে আমারে গিয়াছে খুঁজি
দিনের শেষে
আজ বাউল বেশে
ঘুচাব মনের ভুল নয়ন জলে,
মোর নয়ন জলে॥

১৮

মুখ তুলে চায় সুবিপুল হিমালয়,
আকাশের সাথে প্রণয়ের কথা কয়,
আকাশ কহিছে ডেকে,
কথা কও কোথা থেকে ?
তুমি যে ক্ষুদ্র মোর কাছে মনে হয় ॥

হিমালয় তাই মূর্ছিত অভিমানে,
সে কথা কেহ না জানে ।
ব্যর্থ প্রেমের ভারে
দীর্ঘ নিশাস ছাড়ে—
হিমালয় হতে তুষারের ঝড় বয় ॥

১৯

ফোটে ফুল আসে যৌবন
সুরভি বিলায় দোঁহে
বসন্তে জাগে ফুলবন
অকারণে যায় বহে ॥

কোনো একক্ষণ মিলনে,
বিশ্বেরে অনুশীলনে

কাটে জানি জানি অনুক্ষণ
অতি অপরূপ মোহে ॥

ফুল ঝরে আর যৌবন চলে যায়,
বার বার তারা 'ভালবাসো' বলে যায়।
তারপর কাটে বিরহে,
শূন্য শাখায় কী রহে
সে কথা শুধায় কোন মন ?
'তুমি বৃথা' যায় কহে ॥

সিঁড়িবড়া

অতি কিশোরের ছড়া

তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাও না যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চুনকালি,
কোনো কাজটাই পারি নাকো বলতে পারি ছড়া,
পাশের পড়া পড়ি না ছাই পড়ি ফেলের পড়া।
তেতো ওষুধ গিলি নাকো, মিষ্টি এবং টক
খাওয়ার দিকেই জেনো আমার চিরকালের সখ
বাবা-দাদা সবার কাছেই গোঁয়ার এবং মন্দ,
ভাল হয়ে থাকার সঙ্গে লেগেই আছে দ্বন্দ্ব।
পড়তে ব'সে থাকে আমার পথের দিকে চোখ,
পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশী ঝোঁক।
স্কুলের কেয়ার করি নাকো মধুর জন্যে ছুটি,
যেখানে ভিড় সেইখানেতেই লাগাই ছুটোছুটি।
পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজনের দেখলে মাথা নাড়া,
ভাবি উপদেশের ষাঁড়ে করলে বুঝি তাড়া।
তাইতো ফিরি ভয়ে ভয়ে, দেখলে পরে তর্ক,
বুঝি কেবল গোময় সেটা,—নয়কো মধুপর্ক।
ভুল করি ভাই যখন তখন, শোধরাবার আহ্লাদে
খেয়ালমতো কাজ ক'রে যাই, কষ্ট পাই কি সাধে?
সোজাসুজি যা হয় বুঝি, হায় অদৃষ্ট চক্র!
আমার কথা বোঝে না কেউ, পৃথিবীটাই বক্র॥

এক যে ছিল

এক যে ছিল আপনভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভাল লাগত না,
সহ্য হত না পড়াশুনার ঝামেলা
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখল না কোনোকালেই,
অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

বড়মানুষীর মধ্যে গরীবের মতো মানুষ,
তাই বড় হয়ে সে বড়মানুষ না হয়ে
মানুষ হিসেবে হল অনেক বড়।
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

গানসাধার বাঁধা আইন সে মানে নি,
অথচ স্বর্গের বাগান থেকে সে চুরি ক'রে আনল
তোমার আমার গান।
কবি সে, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল না ছোট বয়সে,
অথচ শিল্পী ব'লে সে-ই পেল শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান।
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

মানুষ হল না ব'লে যে ছিল তার দিদির আক্ষেপের বিষয়,
অনেক দিন, অনেক বিদ্রূপ যাকে করেছে আহত;
সে-ই একদিন চমক লাগিয়ে করল দিগ্বিজয়।

কেউ তাকে বলল, 'বিশ্বকবি', কেউ বা 'কবিগুরু'
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারদিক করল প্রণাম।
তাই পৃথিবী আজো অবাক হয়ে তাকিয়ে বলছে :
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না,
এ প্রশ্নের জবাব তোমাদের মতো আমিও খুঁজি ॥

ভেজাল

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।
ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
'কৌন ছোড়ে গা ভেজাল ভেইয়া, ভেজালসে হ্যয় ফয়দা।'
ভেজাল পোশাক ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা—বাংলাতে ইংরেজী ভেজাল চলছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ বলছে।
'খাঁটি জিনিস' এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,
'ভেজাল' নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।
কলিতে ভাই 'ভেজাল' সত্য ভেজাল ছাড়া গতি নেই,
ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম, ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই ॥

গোপন খবর

শোনো একটা গোপন খবর দিচ্ছি আমি তোমায়,
কলকাতাটা যখন খাবি খাচ্ছিল রোজ বোমায়,
সেই সময়ে একটা বোমা গড়ের মাঠের ধারে,
মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে ছিল একেবারে,
অনেক দিনের ঘটনা তাই ভুলে গেছল লোকে,
মাটির ভেতর ছিল তাইতো দেখে নি কেউ চোখে,
অনেক বর্ষা কেটে গেল, গেল অনেক মাস,
যুদ্ধ থামায় ফেলল লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস,
হঠাৎ সেদিন একলা রাতে গড়ের মাঠের ধারে,
বেড়িয়ে ফেরার সময় হঠাৎ চমকে উঠি : আরে !
বৃষ্টি পেয়ে জন্মেছে এক লম্বা বোমার গাছ,
তারই মাথায় দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোর নাচ,
গাছের ডালে ঝুলছে কেবল বোমা-ই সারি সারি,
তাই না দেখে ভড়কে গিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি।
পরের দিনই সকাল বেলা গেলাম সে ময়দানে,
হায়রে !—গাছটা চুরি গেছে ··কোথায় কে তা জানে।
গাছটা ছিল। গড়ের মাঠে খুঁজতে আজো ঘুরি,
প্রমাণ আছে অনেক, কেবল গাছটা গেছে চুরি ॥

জ্ঞানী

বরেনবাবু মস্ত জ্ঞানী, মস্ত বড় পাঠক,
পড়েন তিনি দিনরাত্তির গল্প এবং নাটক,
কবিতা আর উপন্যাসের বেজায় তিনি ভক্ত,
ডিটেকটিভের কাহিনীতে গরম করেন রক্ত ;
জানেন তিনি দর্শন আর নানা রকম বিজ্ঞান
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি, তাইতো আছে দিক্-জ্ঞান ;
ইতিহাস আর ভূগোলেতে বেজায় তিনি দক্ষ,—
এসব কথা ভাবলেই তাঁর ফুলতে থাকে বক্ষ।
সব সময়েই পড়েন তিনি, সকাল থেকে সন্ধ্যে,
ছুটির দিনে পড়েন তিনি, পড়েন পুজোর বন্ধে।
মাঝে মাঝে প্রকাশ করেন গূঢ় জ্ঞানের তত্ত্ব
বিদ্যাখানা জাহির করেন বরেন্দ্রনাথ দত্ত :
হঠাৎ ঢুকে রান্নাঘরে বলেন, ওসব কী রে ?
ভাইঝি গীতা হেসে বলে, এসব কালো জিরে।
বরেনবাবু রেগে বলেন, জিরে তো হয় সাদা,
তিলও কালো, জিরেও কালো ? পেয়েছিস কি গাধা ?
রান্না করার সময় কেবল পুড়িয়ে হাজার লঙ্কা,
হনুমতী হয়েছিস তুই, হচ্ছে আমার শঙ্কা।
হঠাৎ ছোট্ট খোকাটাকে কাঁদতে দেখে, দত্ত
খোলেন বিরাট বইয়ের পাতা নামটি "মনস্তত্ত্ব"।
খুঁজতে খুঁজতে বরেনবাবু হয়ে গেলেন সারা—
বুঝলেন না, কেন খোকা মাথায় করছে পাড়া।
হঠাৎ এসে ভাইঝি গীতা দুধের বাটি নিয়ে,
খাইয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিটে দিল ঘুম পাড়িয়ে।

বরেনবাবু ভাবেন, খোকার কেমনতর ধারা,
আধ ঘণ্টার চেঁচামেচি পাঁচ মিনিটেই সারা ?
বরেনবাবুর কাছে আরো বিরাট একটি ধাঁধা,
হলদে চালের রঙ কেন হয় ভাত হলে পর সাদা ?
পাথর বাটির গরম জিনিস ঠাণ্ডা হয় তা জানি,
পাহাড় দেশে গরম কেন এমন ছটফটানি ?
পথ চলতে ভেবে এসব ভিজে ওঠেন ঘামে,
মানিকতলা যেতে চাপেন ধর্মতলার ট্রামে।
বরেনবাবু জানেন কিন্তু নানা রকম বিজ্ঞান,
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি তাইতো এমন দিক্-জ্ঞান ॥

৫

মেয়েদের পদবী

মেয়েদের পদবীতে গোলমাল ভারী,
অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি ;
'আ'কার অন্ত দিয়ে মহিলা করার
চেষ্টা হাসির। তাই ভূমিকা ছড়ার।
'গুপ্ত' 'গুপ্তা' হয় মেয়েদের নামে,
দেখেছি অনেক চিঠি, পোস্টকার্ড, খামে।
সে নিয়মে যদি আজ 'ঘোষ' হয় 'ঘোষা',
তা হলে অনেক মেয়ে করবেই গোসা,
'পালিত' 'পালিতা' হলে 'পাল' হলে 'পালা'
নির্ঘাৎ বাড়বেই মেয়েদের জ্বালা ;

‘মল্লিক’ ‘মল্লিকা’, ‘দাস’ হলে ‘দাসা’
শোনাবে পদবীগুলো অতিশয় খাসা ;
‘কর’ যদি ‘করা’ হয়, ‘ধর’ হয় ‘ধরা’,
মেয়েরা দেখবে এই পৃথিবীটা—“সরা” ।
‘নাগ’ যদি ‘নাগা’ হয়, ‘সেন’ হয় ‘সেনা’,
বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা ॥

বিয়ে বাড়ির মজা

বিয়ে বাড়ি : বাজছে সানাই, বাজছে নানান বাদ্য
একটি ধারে তৈরি হচ্ছে নানা রকম খাদ্য ;
হৈ-চৈ আর চেঁচামেচি, আসছে লুচির গন্ধ,
আলোয় আলোয় খুশি সবাই, কান্নাকাটি বন্ধ,
বাসরঘরে সাজছে ক’নে, সকলে উৎফুল্ল,
লোকজনকে আসতে দেখে কর্তার মুখ খুলল :
“আসুন, আসুন— বসুন সবাই, আজকে হলাম ধন্য,
যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য ;
মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি এবং মিষ্টি
খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি ।”
বর আসে নি, তাই সকলে ব্যস্ত এবং উৎসুক,
আনন্দে আজ বুক সকলের নাচছে কেবল ধুক্-ধুক্,
‘হুলু’ দিতে তৈরি সবাই, শাঁখ হাতে সব প্রস্তুত,
সময় চলে যাচ্ছে ব’লে মনটা করছে খুঁত-খুঁত ।

ভাবছে সবাই কেমন ক'রে বরকে করবে জব্দ ;
হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে গাড়ির শব্দ :
হুলুধ্বনি উঠল মেতে, শাঁখ বাজলো জোরে.
বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেল পথের মোড়ে,
কোথায় বরের সাজসজ্জা ? কোথায় ফুলের মালা ?
সবাই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, পালা, পালা, পালা।
বর নয়কো, লাল-পাগড়ী পুলিশ আসছে নেমে !
বিয়ে বাড়ির লোকগুলো সব হঠাৎ উঠল ঘেমে,
বললে পুলিশ : এই কি কর্তা, ক্ষুদ্র আয়োজন ?
পঞ্চাশ জন কোথায় ? এ যে দেখছি হাজার জন !
এমনি ক'রে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে ?
থানায় চলো, কাজ কি এখন এইখানে গোলমালে ?
কর্তা হলেন কাঁদো-কাঁদো, চোখেতে জল আসে,
গেটের পাশে জড়ো-হওয়া কাঙালীরা হাসে ॥

রেশন কার্ড

রঘুবীর একদিন দিতে গিয়ে আড্ডা,
হারিয়ে ফেলল ভুলে রেশনের কার্ডটা ;
তারপর খোঁজাখুঁজি এখানে ও ওখানে,
রঘু ছুটে এল তার রেশনের দোকানে,
সেখানে বলল কেঁদে, হুজুর, চাই যে আটা—
দোকানী বলল হেঁকে, চলবে না কাঁদা-কাটা,

হাটে মাঠে ঘাটে যাও, খোঁজো গিয়ে রাস্তায়
ছুটে যাও আড্ডায়, খোঁজো চারিপাশটায় ;
কিংবা অফিসে যাও এ রেশন এলেকার,
আমার মামার পিসে, কাজ করে ছেলে তার,
তার কাছে গেলে পরে সবই ঠিক হয়ে যাবে,
ছ'মাসের মধ্যেই নয়া এক কার্ড পাবে।
রঘুবীর বলে কেঁদে, ছ'মাস কি করব ?
ছ'মাস কি উপবাস ক'রে ধুঁকে মরব ?
আমি তার করব কী ?—দোকানী উঠল রেগে—
যা খুশি তা করো তুমি—বলল সে অতি বেগে :
পয়সা থাকে তো খেয়ো হোটেলে কি মেসেতে,
নইলে সটান্ তুমি যেতে পার দেশেতে ॥

খাদ্য-সমস্যার সমাধান

বন্ধু :

ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত
তোমার কাছে তাই,
এলাম ছুটে, আমায় কিছু
চাল ধার দাও ভাই !

মজুতদার :

দাঁড়াও তবে, বাড়ির ভেতর
একটু ঘুরে আসি,
চালের সঙ্গে ফাউও পাবে
ফুটবে মুখে হাসি।

মজুতদার :

এই নাও ভাই, চালকুমড়ো,
আমায় খাতির করো,
চালও পেলে কুমড়ো পেলে
লাভটা হল বড় ॥

পুরনো ধাঁধা

বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
বড়মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি-মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একী অনাসৃষ্টি ?
বলতে পারো ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে ?
ধনীর মেয়ের দামী পুতুল হরেক রকম খেলনা,
গরীব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফ্যালনা।

বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?
'হিং-টিং-ছট্' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায় ॥

ব্ল্যাক-মার্কেট

হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,
ব্ল্যাক-মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার
গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান ছয় হাঁকালো।
কেউ নেই ত্রিভুবনে, নেই কিছু অভাবও
তবু ছাড়ল না তার লোক-মারা স্বভাব ও।
একা থাকে, তাই হরি চাকরটা রক্ষী
ত্রিসীমানা মাড়ায় না তাই কাক-পক্ষী।
বিশ্বে কাউকে রাম কাছে পেতে চান না,
হরিই বাজার করে, সে-ই করে রান্না।
এমনি ক'রেই বেশ কেটে যাচ্ছিল কাল,
হঠাৎ হিসেবে রাম দেখলেন গোলমাল,
বললেন চাকরকে : কিরে ব্যাটা, কি ব্যাপার ?
এত টাকা লাগে কেন বাজারেতে রোজকার ?
আলু তিন টাকা সের ? পটোল পনেরো আনা ?
ভেবেছিস বাজারের কিছু বুঝি নেই জানা ?

রোজ রোজ চুরি তোর? হতভাগা, বজ্জাত!
হাসছিস? এক্ষুনি ভেঙে দেব সব দাঁত।
খানিকটা চুপ ক'রে বলল চাকর হরি:
আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক-মার্কেট করি॥

●

ভাল খাবার

ধনপতি পাল, তিনি জমিদার মস্ত;
সূর্য রাজ্যে তাঁর যায় নাকো অস্ত,
তার ওপর ফুলে উঠে কারখানা-ব্যাঙ্কে
আয়তনে হারালেন মোটা কোলা ব্যাঙকে।
সবার "হুজুর" তিনি, সকলের কর্তা,
হাজার সেলাম পান দিনে গড়পড়তা।
সদাই পাহারা দেয় বাইরে সেপাই তাঁর,
কাজ নেই, তাই শুধু 'খাই-খাই' বাই তাঁর,
এটা খান, সেটা খান, সব লাগে বিদ্‌ঘুটে,
টান মেরে ফেলে দেন একটু খাবার খুঁটে;
খাদ্যে অরুচি তাঁর, সব লাগে তিক্ত,
খাওয়া ফেলে ধমকান শেষে অতিরিক্ত।
দিনরাত চিৎকার: আরো বেশি টাকা চাই,
আরো কিছু তহবিলে জমা হয়ে থাকা চাই।
সব ভয়ে জড়োসড়ো, রোগ বড় প্যাঁচানো,
খাওয়া ফেলে দিনরাত টাকা ব'লে চ্যাঁচানো।

ডাক্তার কবিরাজ ফিরে গেল বাড়িতে ;
চিন্তা পাকালো জট নায়েবের দাড়িতে।
নায়েব অনেক ভেবে বলে হুজুরের প্রতি :
কী খাদ্য চাই ? কী সে খেতে উত্তম অতি ?
নায়েবের অনুরোধে ধনপতি চারিদিক
দেখে নিয়ে বার কয় হাসলেন ফিক্-ফিক্ ;
তারপর বললেন : বলা ভারি শক্ত,
সব চেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত ॥

পৃথিবীর দিকে তাকাও

দেখ, এই মোটা লোকটাকে দেখ
অভাব জানে না লোকটা,
যা কিছু পায় সে আঁকড়িয়ে ধরে
লোভে জ্বলে তার চোখটা।
মাথা-উঁচু করা প্রাসাদের সারি
পাথরে তৈরি সব তার,
কত সুন্দর, পুরনো এগুলো !
অট্টালিকা এ লোকটার।
উঁচু মাথা তার আকাশ ছুঁয়েছে
চেয়ে দেখে না সে নীচুতে,
কত জমির যে মালিক লোকটা
বুঝবে না তুমি কিছুতে।

দেখ, চিমনীরা কী ধোঁয়া ছাড়ছে
কলে আর কারখানাতে,
মেশিনের কপিকলের শব্দ
শোনো, সবাইকে জানাতে।
মজুরেরা দ্রুত খেটেই চলেছে—
খেটে খেটে হল হন্যে ;
ধনদৌলত বাড়িয়ে তুলছে
মোটা প্রভুটির জন্যে।
দেখ, একজন মজুরকে দেখ
ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটছে,
কেনা গোলামের মতোই খাটুনি
তাই হাড়ভাঙা খাটছে।
ভাঙা ঘর তার নীচু ও আঁধার
স্যাঁতসেঁতে আর ভিজে তা,
এর সঙ্গে কি তুলনা করবে
প্রাসাদ বিশ্ব-বিজেতা ?
কুঁড়েঘরের মা সারাদিন খাটে
কাজ করে সারা বেলা এ,
পরের বাড়িতে ধোয়া মোছা কাজ—
বাকীটা পোষায় সেলায়ে।
তবুও ভাঁড়ার শূন্যই থাকে,
থাকে বাড়ন্ত ঘরে চাল,
বাচ্চা ছেলেরা উপবাস করে
এমনি ক'রেই কাটে কাল।

বাবু যত তারা মজুরকে তাড়া
করে চোখে চোখে রাখে,
ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে মজুরকে ধরে
দোকানে যাওয়ার ফাঁকে।
খাওয়ার সময় ভোঁ বাজলে তারা
ছুটে আসে পালে পাল,
খায় শুধু কড়কড়ে ভাত আর
হয়তো একটু ডাল।
কম-মজুরির দিন ঘুরে এলে
খাদ্য কিনতে গিয়ে
দেখে এ টাকায় কিছুই হয় না,
বসে গালে হাত দিয়ে।
পুরুত শেখায়, ভগবানই জেনো প্রভু
(সুতরাং চুপ ; কথা বলবে না কভু)
সকলেরই প্রভু—ভাল আর খারাপের
তাঁরই ইচ্ছায় এ ; চুপ করো সব ফের।
শিক্ষক বলে, শোনো সব এই দিকে,
চালাকি ক'রো না, ভাল কথা যাও শিখে
এদের কথায় ভরসা হয় না তবু ?
সরে এসো তবে, দেখ সত্যি কে প্রভু।
ফ্যাকাশে শিশুরা, মুখে শাস্তির ভীতি,
আগের মতোই মেনে চলে সব নীতি।
যদি মজুরেরা কখনো লড়তে চায়,
পুলিশ প্রহারে জেলে টেনে নিয়ে যায়।

মজুরের শেষ লড়াইয়ের নেতা যত
এলোমেলো সব মিলায় ইতস্তত—
কারাপ্রাচীরের অন্ধকারের পাশে।
সেখানেও স্বাধীনতার বার্তা আসে।
রাশিয়াই, শুধু রাশিয়া মহান দেশ,
যেখানে হয়েছে গোলামির দিন শেষ ;
রাশিয়া, যেখানে মজুরের আজ জয়,
লেনিন গড়েছে রাশিয়া! কী বিস্ময়!
রাশিয়া, যেখানে ন্যায়ের রাজ্য স্থায়ী,
নিষ্ঠুর 'জার' যেই দেশে ধরাশায়ী,
সোভিয়েট-'তারা' যেখানে দিচ্ছে আলো,
প্রিয়তম সেই মজুরের দেশ ভাল।
মজুরের দেশ, কল-কারখানা,
প্রাসাদ, নগর, গ্রাম,
মজুরের খাওয়া, মজুরের হাওয়া,
শুধু মজুরের নাম।
মজুরের ছুটি, বিশ্রাম আর
গরমে সাগর-ধার,
মজুরের কত স্বাধীনতা! আর
অজস্র অধিকার।
মজুরের ছেলে ইস্কুলে যায়
জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে,
ছোট ছোট মন ভরে নেয় শুধু
জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে।

মজুরের সেনা 'লাল ফৌজ' দেয়
পাহারা দিন ও রাত,
গরীবের দেশে সইবে না তারা
বড়লোকদের হাত।
শান্ত-স্নিগ্ধ, বিবাদ-বিহীন
জীবন সেখানে, তাই
সকলেই সুখে বাস করে আর
সকলেই ভাই-ভাই ;
এক মনেপ্রাণে কাজ করে তারা
বাঁচাতে মাতৃভূমি,
তোমার জন্যে আমি, সেই দেশে,
আমার জন্যে তুমি ॥

সিপাহী বিদ্রোহ

হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ—"হো-হো, হো-হো, হো-হো"
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে—সিপাহী বিদ্রোহ !
আগুন হয়ে সারাটা দেশ ফেটে পড়ল রাগে,
ছেলে বুড়ো জেগে উঠল নব্বই সন আগে ;
একশো বছর গোলামিতে সবাই তখন ক্ষিপ্ত,
বিদেশীদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত !
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী—
সবার হাতে অস্ত্র, নাচে বনের পশু-পক্ষী।

কেবল ধনী, জমিদার, আর আগের রাজার ভক্ত
যোগ দিল, তা নয়কো, দিল গরীবেরাও রক্ত !
সবাই জীবন তুচ্ছ করে, মুসলমান ও হিন্দু,
সবাই দিতে রাজি তাদের প্রতি রক্তবিন্দু ;
ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড় কেবল মিথ্যে,
বিদেশীরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে।
অত্যাচারী নয়কো তারা, অত্যাচারীর মুণ্ড
চেয়েছিল ফেলতে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড।
নানা জাতের নানান সেপাই গরীব এবং মূর্খ :
সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ ;
তাইতো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে
এগিয়েছিল, এগিয়েছিল মরণ বরণ করতে !

আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা
উঠছে বেজে কোনোদিকেই নেইকো কোনো শঙ্কা ;
জব্বলপুরে সেপাইদেরও উঠছে বেজে বাদ্য
নতুন ক'রে বিদ্রোহ আজ ; কেউ নয়কো বাধ্য,
তখন এঁদের স্মরণ করো, স্মরণ করো নিত্য—
এঁদের নামে, এঁদের পণে শানিয়ে তোলো চিত্ত।
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী,
এঁদের নামে, দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি ?

আজব লড়াই

ফেব্রুয়ারী মাসে ভাই, কলকাতা শহরে
ঘটল ঘটনা এক, লম্বা সে বহরে।
লড়াই লড়াই খেলা শুরু হল আমাদের,
কেউ রইল না ঘরে রামাদের শ্যামাদের ;
রাস্তার কোণে কোণে জড়ো হল সকলে,
তফাৎ রইল নাকো আসলে ও নকলে,
শুধু শুনি 'ধর' 'ধর' 'মার' 'মার' শব্দ
যেন খাঁটি যুদ্ধ এ, মিলিটারী জব্দ।
বড়রা কাঁদুনে গ্যাসে কাঁদে, চোখ ছল ছল
হাসে ছিঁচকাঁদুনেরা বলে, 'সব ঢাল জল'।
ঐ বুঝি ওরা সব সঙ্গীন উঁচোলো,
ভয় নেই, যত হোক বেয়নেট ছুঁচোলো,
ইট-পাটকেল দেখি রাখে এরা তৈরি,
এইবার যাবে কোথা, বাছাধন বৈরী!
ভাবো বুঝি ছোট ছেলে, একেবারে বাচ্চা!
এদের হাতেই পাবে শিক্ষাটা আচ্ছা ;
ঢিল খাও, তাড়া খাও, পেট ভরে কলা খাও,
গালাগালি খাও আর খাও কানমলা খাও।
জালে ঢাকা গাড়ি চড়ে বীরত্ব কি যে এর
বুঝবে কে, হরদম সামলায় নিজেদের।
বার্মা-পালানো সব বীর এরা বঙ্গে
যুদ্ধ করছে ছোট ছেলেদের সঙ্গে ;
ঢিলের ভয়েতে ওরা চালায় মেসিনগান,
"বিশ্ববিজয়ী" তাই রাখে জান, বাঁচে মান।

খালি হাত ছেলেদের তেড়ে গিয়ে করে খুন ;
সাবাস ! সাবাস ! ওরা খেয়েছে রাজার নুন

ডাংগুলি খেলা নয়, গুলির সঙ্গে খেলা,
রক্ত-রাঙানো পথে দু পাশে ছেলের মেলা ;
দুর্দম খেলা চলে, নিষেধে কে কান দেয় ?
ও-বাড়ি ও ও-পাড়ার কালো, ছোটু প্রাণ দেয় ।
স্বচক্ষে দেখলাম বস্তির আলী জান,
'আংরেজ চলা যাও' বলে ভাই দিল প্রাণ ।

এমন বিরাট খেলা শেষ হল চটপট
বড়দের বোকামিতে আজো প্রাণ ছটফট ;
এইবারে আমি ভাই হেরে গেছি খেলাতে,
ফিরে গেছি দাদাদের বকুনির ঠেলাতে ;
পরের বারেতে ভাই শুনব না কারো মানা,
দেবই, দেবই আমি নিজের জীবনখানা ॥

অভিযান

নেপথ্যে (গান)

ক্ষুধিতের সেবার সব ভার
লও লও কাঁধে তুলে—
কোটি শিশু নরনারী
মরে অসহায় অনাদরে,
মহাশ্মশানে জাগো মহামানব
আগুয়ান হও ভেদ ভুলে।

বৈজয়ন্তী নগর। সকাল। (দূরে কে যেন বলছে

হে পুরবাসী! হে মহাপ্রাণ,
যা কিছু আছে করগো দান,
অন্ধকারের হোক অবসান
করুণা-অরুণোদয়ে।

বালকদলের প্রবেশ

উদয়ন

ওই ভাখ, ওই ভাখ, আসে ওই
আয় তোরা, ওর সাথে কথা কই।

ইন্দ্রসেন

নগরে এসেছে এক অদ্ভুত মেয়ে
পরের জন্যে শুধু মরে ভিখ্ চেয়ে।

সত্যকাম

শুনেছি ও থাকে দূর দেশে,
সেইখান থেকে হেঁটে এসে

দেশের জন্যে ভিখ্‌ চায়
আমাদের খোলা দরজায়।

উদয়ন

শুনেছি ওঁদের দেশে পথের ধারে
মরছে হাজার লোক বিনা আহারে,
নানান ব্যাধিতে দেশ গিয়েছে ছেয়ে,
তাইতো ভিক্ষা মাগে ওদের মেয়ে।

সংকলিতার প্রবেশ (গান ধরল)

গান

শোনো, শোনো, ও বিদেশের ভাই,
এসেছি আজ বন্ধুজনের ঠাঁই ;
দেশবাসী মরছে অনশনে
তোমরা কিছু দাও গো জনে জনে,
বাঁচাব দেশ অন্ন যদি পাই !

উদয়ন

শোনো ওগো বিদেশের কন্যা,
ব্যাধি দুর্ভিক্ষের বন্যা
আমরাই প্রাণ দিয়ে বাঁধব—
তোমাদের কান্নায় আমরাও যোগ দিয়ে কাঁদব।

ইন্দ্রসেন

আমরা তোমায় তুলে দেব অন্ন বস্ত্র অর্থ
তুমি কেবল গান শোনাবে এই আমাদের শর্ত।

সত্যকাম

ওই ছ্যাখ আসে হেথা রাজ্যের কোতোয়াল
ইয়া বড় গোঁফ তার, হাতে বাঁকা তরোয়াল
ওর কাছে গিয়ে তুমি পাতো দুই হস্ত
ও দেবে অনেক কিছু, ও যে লোক মস্ত !

কোতোয়ালের প্রবেশ

সংকলিতা (আঁচল তুলে)

ওগো রাজপ্রতিনিধি,
তুমি রাজ্যের বিধি ।
তুমি দাও আমাদের অন্ন,
আমরা যে বড়ই বিপন্ন ।

কোতোয়াল

যা চ'লে ভিখারী মেয়ে যা চ'লে
দেব না কিছুই তোর আঁচলে ।

সংকলিতা

তুমি যদি না দেবে তো কে দেবে এ রাজ্যে ?
সবারে রক্ষা করা তোমাদের কাজ যে ।

কোতোয়াল

চুপ কর হতভাগী, বড় যে সাহস তোর ?
এখুনি বুঝিয়ে দেব আমার গায়ের জোর ।

সংকলিতা

তোমরা দেখাও শুধু শক্তি,
তাইতো করে না কেউ ভক্তি ;
করো না প্রজার কোনো কল্যাণ,
তোমরা অন্ধ আর অজ্ঞান।

কোতোয়াল

চল তবে মুখপুড়ী, বেড়েছিস বড় বাড়—
কপালে আছে রে তোর নির্ঘাত কারাগার

(সংকলিতাকে পাকড়াও করে গমনোদ্যত, এমন সময় জনৈক পথিকের প্রবেশ

পথিক

শুনেছ হে কোতোয়াল—
নগরে শুনছ যেন গোলমাল ?

উদয়, ইন্দ্র ও সত্য (একসঙ্গে)
ছাড়, ছাড়, ছাড় ওকে—ছেড়ে দাও।

কোতোয়াল

ওরে রে ছেলের দল, চোপরাও !

সংকলিতা

কখনো কি তোমরা ন্যায়ের ধারটি ধারো ?
বন্দী যদি করো আমায় করতে পারো ;

করি নি তো দেশের আঁধার ঘুচিয়ে আলো
কারাগারে যাওয়াই আমার পক্ষে ভালো।

পথিক

ওগো নগরপাল!
রাজপুরীতে এদিকে যে জমলো প্রজার পাল

পথিকের প্রস্থান

ইন্দ্রসেন

অত্যাচারী কোতোয়ালের আজকে একি অত্যাচার?
এমনিতর খেয়ালখুশি করব না বরদাস্ত আর।

কোতোয়াল
(তরবারি উঁচিয়ে)

হারে রে দুধের ছেলে, এতটুকু নেই ডর?
মাথার বিয়োগব্যথা এখুনি বুঝবে ধড়।

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত
(চিৎকার ক'রে)

রাখো অস্ত্রের চাকচিক্য
এদেশে লেগেছে দুর্ভিক্ষ
প্রজাদল হয়েছে অশান্ত
মহারাজ তাই বিভ্রান্ত।

কোতোয়াল

একি শুনি আজ তোমার ভাষ্য ?
মনে হয় যেন অবিশ্বাস্য.
মহামন্বন্তরের হাস্য,
এখানেও শেষে হল প্রকাশ্য ?

উদয়ন

আমরা তো পূর্বেই জানি.
লাঞ্ছিতা হলে কল্যাণী
এদেশেও ঘটবে অমঙ্গল
উঠবেই মৃত্যুর কল্লোল

কোতোয়াল

বুঝলাম, সামান্যা নয় এই মেয়ে,
নৃপতিকে সংবাদ দাও দূত যেয়ে

রাজদূতের প্রস্থান

(সংকলিতার প্রতি)

আজকে তোমার প্রতি করেছি যে অন্যায়
তাইতো ডুবছে দেশ মৃত্যুর বন্যায় ;
বলো তবে দয়া করে কিসে পাব উদ্ধার
ঘুচবে কিসের ফলে মৃত্যুর হাহাকার ?

সংকলিতা

নই আমি অদ্ভুত, নই অসামান্যা,
ধ্বনিত আমার মাঝে মানুষের কান্না—

যেখানে মানুষ আর যেখানে তিতিক্ষা
আমার দেশের তরে সেথা চাই ভিক্ষা।
আমার দেশের সেই মহামন্বন্তর
ঘরেছে তোমার দেশও ধীরে অভ্যন্তর।

মহারাজ ও পিছনে কুবের শেঠের প্রবেশ

মহারাজ

কে তুমি এসেছ মেয়ে আমার দেশে,
এসেছ কিসের তরে, কার উদ্দেশে ?

সংকলিতা

আমার দেশেতে আজ মরে লোক অনাহারে,
এসেছি তাদের তরে মহামানবের দ্বারে—
লাখে লাখে তারা আজ পথের দুধার থেকে
মৃত্যুদলিত শবে পথকে ফেলেছে ঢেকে।
চাষী ভুলে গেছে চাষ, মা তার ভুলেছে স্নেহ,
কুটিরে কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ ;
উজার নগর গ্রাম, কোথাও জ্বলে না বাতি,
হাজার শিশুরা মরে, দেশের আগামী জাতি
রোগের প্রাসাদ ওঠে সেখানে প্রতিটি ঘরে,
মানুষ ক্ষুধিত আর শেয়ালে উদর ভরে ;
এখনো রয়েছে কোটি মরণের পথ চেয়ে
তাইতো ভিক্ষা মাগি এদেশে এ-গান গেয়ে—

গান

ওঠো জাগো ও দেশবাসী,
আমরা যে রই উপবাসী,
আসছে মরণ সর্বনাশী।
হও তবে সত্বর—
দুয়ারে উঠল মহাঝড়।

সংকলিতা

কিন্তু তোমার এই এতবড় রাজ্য
এখানে পেলাম নাকো কোনোই সাহায্য।

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত

প্রজারা সহসা ক্ষিপ্ত হয়েছে যে মহারাজ—
রাজপ্রাসাদের পাশে ভিড় করে আছে আজ।

প্রস্থান

মহারাজ

বলো মেয়ে তাদের আমি শান্ত করি কী দিয়ে?

সংকলিতা

ধনাগারে আজ তাদের হাতে এখুনি দাও ফিরিয়ে।

মহারাজ

তাও কখনো সম্ভব ?
অবশেষে ছাড়ব বিপুল বৈভব ?

কুবের শেঠ
(করজোড়ে)

শ্রীচরণে নিবেদন করি সবিনয়--
কখনই নয়, প্রভু, কখনই নয়।

মহারাজ

কিন্তু কুবের শেঠ,
বড্ড উঁচলা দেখি এদের ক্ষুধিত পেট।

কুবের শেঠ

এ এদের ছল, মহারাজ !
নতুবা নির্ঘাত দুষ্ট চাষাদের কাজ !

মহারাজ

তুমিই যখন এদের সমস্ত,
এদের খাওয়ার সকল বন্দোবস্ত
তোমার হাতেই করলাম আজ ন্যস্ত।

কুবের শেঠ
(বিগলিত হয়ে)

মহারাজ ন্যায়পরায়ণ !
তাইতো সদাই সেবা করি ও চরণ।

মহারাজের সঙ্গে শেঠের প্রস্থান

ইন্দ্রসেন

বাঘের ওপর দেওয়া হল ছাগ পালনের ভার,
কোতোয়াল হে ! তোমাদের যে ব্যাপার চমৎকার !

কোতোয়াল

বটে ! বটে ! বড় যে সাহস ?
গর্দান যাবে তবে রোস্‌ !

সংকলিতা

ছেলের দলের সামনে সাহস ভারি,
যোগ্য লোকের কাছে গিয়ে ঘোরাও তরবারি

কোতোয়াল

চুপ করে থাক্‌ মেয়ে, চুপ করে থাক্‌,
তুই এনেছিস দেশে ভীষণ বিপাক।
যেদিন এদেশে তুই এলি ভিখারিনী
অশুভ তোরই সাথে এল সেই দিনই।

সত্যকাম

কে বলে একথা কোতোয়াল ?
ও হেথা এসেছে বহুকাল ;
এতদিন ছিল না আকাল।

প্রজার ফসল করে হরণ
তুমিই ডেকেছে দেশে মরণ,
সে কথা হয় না কেন স্মরণ ?
জমানো তোমার ঘরে শস্য,
তবু তুমি করো ওকে দৃষ্য ?

কোতোয়াল

কে হে তুমি ? দেখছি চোরের পকেটকাটা সাক্ষী,
বলছ কেবল বৃহৎ বৃহৎ বাক্যি ?

ইন্দ্রসেন

কোতোয়ালজী, আজকে হঠাৎ রাগের কেন বৃদ্ধি ?
তোমার কি আজ খাওয়া হয় নি সিদ্ধি ?

কোতোয়াল

চুপ কর ওরে হতভাগা !
এটা নয় তামাসার জা'গা !

(দাঁতে দাঁত ঘ'সে সংকলিতার প্রতি)

এই মেয়ে বাড়িয়েছে ছেলেদের বিক্রম,
তাইতো আমাকে কেউ করে নাকো সম্ভ্রম ।

সংকলিতা

চিরদিনই তরুণেরা অন্যায়ের করে নিবারণ,
এদের এ সাহসের আমি তাই নয়কো কারণ ।

কোতোয়াল

আমি রামদাস কোতোয়াল—
চটাসূনি ভুলে, আর কাটিসূনি কুমিরের খাল।

সংকলিতা

ছি! ছি! ছি! ওগো কোতোয়ালজী,
আমি কি তোমাকে পারি চটাতে?
শত্রুও পারে না তা বটাতে।

কোতোয়াল

জানে বাতাস, জানে অন্তরীক্ষ.
জানে নদী, জানে বনের বৃক্ষ,
তুই এনেছিস এদেশে দুর্ভিক্ষ।

সংকলিতা

ক্ষমা করো! আমি সর্বনেশে!
পরের উপকারের তরে এসে—
মন্বন্তর ছড়িয়ে গেলাম তোমাদের এই দেশে।

উদয়ন

অমন ক'রে বলছ কেন ভগ্নী!
জ্বালছ মনে কেন ক্ষোভের অগ্নি?
রাঘব বোয়াল এই কোতোয়াল
হানা দেয় এ রাজ্যে
একে তুমি এনোই না গেরাহ্যে।

কোতোয়াল

আমার শাসন ছায়ায় হয়ে পুষ্ট
রাঘব বোয়াল বলিস আমায় দুষ্ট ?

ইন্দ্রসেন

বলা উচিত সহস্রবার যেমন তুমি নির্দয়
নির্দোষীকে পীড়ন করায় যেমন তোমার নেই ভয়

কোতোয়াল

বার বার করেছি তো সাবধান,
এইবার যাবে তোর গর্দান ।

সংকলিতা

চুপ করে থাক ভাই, কথায় নেইকো ফল,
আমার জন্যে কেন ডাকছ অমঙ্গল ?
রাজা ধনাগার যদি দেন প্রজাদের হাতে
ওর যে সমূহ ক্ষতি, ভেবে ও ক্ষুব্ধ তাতে ।

কোতোয়াল

ওরে ওরে রাক্ষুসী, ওরে ওরে ডাইনী,
তোর কথা আমি যেন শুনতেই পাই নি,
তোর যে ঘনাল দিন, সাহস ভয়ংকর,
দুঃসাহসের কথা বলতে নেইকো ডর ?

সত্যকাম

তোমার মতো দুর্জনকে করতে হলে ভয়
পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মোটেই উচিত নয়।

কোতোয়াল

তোদের মুখে শুনছি যেন ভাগবতের টীকা,
নিজের হাতে জ্বালছিস আজ নিজের চিতার শিখা।

ইন্দ্রসেন

একটি তোমার তলোয়ারের জোরে
ভাবছ বুঝি চিরকালটাই যাবে শাসন করে?
সেদিন তো আজ অনেক কালই গত,
তোমার মুখের ফাঁকা আওয়াজ শুনছি অবিরত।

কোতোয়াল
(ইন্দ্রসেনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে)

বুঝলে এঁচোড়পাকা,
আওয়াজ আমার নয়কো মোটেই ফাঁকা।

সংকলিতা
(আর্তনাদ ক'রে)

দরিদ্রের রক্ত ক'রে শোষণ
বিরাট অহংকারকে করো পোষণ,
তুমি পশু, পাষণ্ড, বর্বর
অত্যাচারী, তোমার ও হাত কাঁপে না থরথর!

কোতোয়াল

(হুংকার দিয়ে)

আমাকে বলিস পশু, বর্বর ?
ওরে দুর্মতি তুই তবে মর !

(তলোয়ারের আঘাতে আর্তনাদ ক'রে সংকলিতার মৃত্যু)

প্রজাদলের প্রবেশ ও কোতোয়াল পলায়নোদ্যত

জনৈক পথিক

কোথায় সে কন্যা, অপরূপ কান্তি,
যার বাণী আমাদের দিতে পারে শান্তি ;
দেশে আজ জাগরণ যার সংগীতে,
আমরা যে উৎসুক তাকে গৃহে নিতে।

(সংকলিতার মৃতদেহের দিকে চেয়ে আর্তনাদ ক'রে)

এ যে মহামহীয়সী, এ যে কল্যাণী
ধুলায় লুটায় কেন এর দেহখানি ?

ইন্দ্রসেন

(কোতোয়ালকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে)

ওই দেখ, ভাই সব, ওই অপরাধী
সবার বিচার হোক ওর প্রতিবাদী—

জনৈক প্রজা

ওরে রে স্পর্ধিত পশু, কী সাহস তোর,
তুই করেছিস আজ অন্যায় ঘোর ;
কল্যাণীকে হেনে আজ তোর আর
পৃথিবীতে বাঁচবার নেই অধিকার।

ইন্দ্রসেন

রাজার ওপরে আর করব না নির্ভর—
আমাদের ভাগ্যের আমরাই ঈশ্বর !

সকলে

চলবে না অন্যায়, খাটবে না ফন্দি,
আমাদের আদালতে আজ তুই বন্দী !!!

(কোতোয়ালকে প্রজারা বন্দী করল)

যবনিকা

সূর্য-প্রণাম

উদয়াচল

আগমনী

সমবেত গান

পুব সাগরের পার হতে কোন পথিক তুমি উঠলে হেসে,
তিমির ভেদি ভুবন-মোহন আলোর বেশে।
ওগো পথিক, তোমার আলোয় ঘুচুক জরা
ছন্দে নাচুক বসুন্ধরা।
গগনপথে যাত্রা তোমার নিরুদ্দেশে।
তুমি চিরদিনের দোলে দোলাও অনন্ত আবর্তনে,
নৃত্যে কাঁপুক চিত্ত মোদের নটরাজের নর্তনে।
আলোর সুরে বাজাও বাঁশি,
চিরকালের রূপ-বিকাশি'
আঁধার নাশে সুন্দর হে তোমার বাণীর মূক আবেশে॥

আবির্ভাব

আবৃত্তি

সূর্যদেব,
আজি এই বৈশাখের খরতপ্ত তেজে
পৃথিবী উন্মত্ত যবে তুমি এলে সেজে

কনক-উদয়াচলে প্রথম আবেগে
ফেলিলে চরণচিহ্ন, তার স্পর্শ লেগে
ধরণী উঠিল কাঁপি গোপন স্পন্দনে
সাজাল আপন দেহ পুষ্প ও চন্দনে
তব পূজা লাগি। পৃথিবীর চক্ষুদান
হল সেই দিন। অন্ধকার অবসান,
যবে দ্বার খুলে প্রভাতের তীরে আসি
বলিলে, হে বিশ্বলোক তোরে ভালবাসি,
তখনি ধরিত্রী তার জয়মাল্যখানি
আশীর্বাদসহ তব শিরে দিল আনি—
সস্মিত নয়নে। তারে তুমি বলেছিলে,
জানি এ যে জয়মাল্য, মোরে কেন দিলে ?
কতবার তব কানে পঁচিশে বৈশাখ
সুদূরের তরে শুধু দিয়ে গেল ডাক,
তুমি বলেছিলে চেয়ে সম্মুখের পানে
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

বরণ

বর্ণনা

হঠাৎ আলোর আভাস পেয়ে কেঁপে উঠল
ভোরবেলা, কোন্ পুলকে, কোন্ অজানা সম্ভাবনায় ?
রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করে অন্ধকার।

শিউলি বকুল ঝ'রে পড়ে শেষ'রাত্রির কান্নার মতো,
হেমন্ত-ভোরের শিশিরের মতো।
অস্পষ্ট হল অন্ধকার; স্বচ্ছ, আরও স্বচ্ছ
মৃতপ্রায়ের আগ্রহের মতো পাণ্ডুর আলো এসে পড়ে
আশীর্বাদের মতো ঝরা ফুলের মরা চোখে,
শুভ্র কপোলে,—ঘুমন্ত হাসির মতো তার মায়া।
পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা এল উচ্ছ্বসিত বন্যার বেগে,
হাতে তাদের আহরণী-ডালা;
তারা অবাক হয়ে দেখলে
একী! নতুন ফুল ফুটেছে তাদের আঙিনায়
রবির প্রথম আলো এসে পড়েছে তার মুখে,
ওরা বললে, ওতো সূর্যমুখী।
পিলু-বারোয়াঁর সুর তখনও রজনীগন্ধার বনে
দীর্ঘশ্বাসের মতো সুরভিত-মত্ততায় হা-হা করছে;
কিন্তু তাও গেল মিলিয়ে। শুধু জাগিয়ে দিয়ে
গেল হাজার সূর্যমুখীকে।
সূর্য উঠল। অচেতন জড়তার বুকে ঠিকরে
পড়তে লাগল, বন্ধ জানলায় তার কোমল
আঘাত, অজস্র দীপ্তিতে বিহ্বল।
পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা ফিরে গেল উজ্জ্বল, উচ্ছল হয়ে
বুকে তাদের সূর্যমুখীর
অদৃশ্য সুবাস।

মঙ্গলাচরণ

গান

ওগো কবি, তুমি আপন ভোলা—
আনিলে তুমি নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা,
মালিকাটি নিয়ে মোর
একী বাঁধিলে অলখ-ডোর।
নিবেদিত প্রাণে গোপনে তোমার কি সুর তোলা,
জেনেছ তো তুমি সকল প্রাণের নীরব কথা,
তোমার বাণীতে আমার মনের এ ব্যাকুলতা
পেয়েছ কি তুমি সাঁঝের বেলাতে
যখন ছিলাম কাজের খেলাতে
তখন কি তুমি এসেছিলে, ছিল যে দুয়ার খোলা?

আহ্বান

সমবেত গান

আমাদের ডাক এসেছে
এবার পথে চলতে হবে,
ডাক দিয়েছে গগন-রবি
ঘরের কোণে কেই বা রবে
ডাক এসেছে চলতে হবে আজ সকালে
বিশ্বপথে সবার সাথে সমান তালে
পথের সাথী আমরা রবির

সাঁঝ-সকালে চলরে সবে।
ঘুম থেকে আজ সকালবেলা ওঠ রে
ডাক দিল কে পথের পানে ছোট রে,
পিছন পানে তাকাস নি আজ চল সমুখে
জয়ের বাণী নূতন প্রাতে বল ও-মুখে
তোদের চোখে সোনার আলো
সফল হয়ে ফুটবে কবে॥

৫

স্তব

আবৃত্তি

কবিগুরু, আজ মধ্যাহ্নের অর্ঘ্য
দিলাম তোমায় সাজায়ে,
পৃথিবীর বুকে রচেছ শান্তিস্বর্গ
মিলনের সুর বাজায়ে।
যুগে যুগে যত আলোক-তীর্থযাত্রী
মিলিবে এখানে আসিয়া,
তোমার স্বর্গ এনে দেবে মধুরাত্রি
তাহাদের ভালবাসিয়া।
তারা দেবে নিতি শান্তির জয়মাল্য
তোমার কণ্ঠে পরায়ে,
তোমার বাণী যে তাহাদের প্রতিপাল্য,
মর্মেতে যাবে জড়ায়ে।

তুমি যে বিরাট দেবতা শাপভ্রষ্ট
ভুলিয়া এসেছ মর্তে
পৃথিবীর বিষ পান করে নাই এখনো তোমার ওষ্ঠ
ঝঞ্ঝা-প্রলয়-আবর্তে।
আজিকার এই ধূলিময় মহাবাসরে
তোমারে জানাই প্রণতি,
তোমার পূজা কি শঙ্খঘণ্টা কাঁসরে ?
ধূপ-দীপে তব আরতি ?
বিশ্বের আজ শান্তিতে অনাসক্তি,
সভ্য মানুষ যোদ্ধা,
চলেছে যখন বিপুল রক্তারক্তি,
তোমারে জানাই শ্রদ্ধা।

৬

অবশেষ
বর্ণনা

কিন্তু মধ্যাহ্ন তো পেরিয়ে যায়
সন্ধ্যার সন্ধানে, মেঘের ছায়ায়
বিশ্রাম করতে করতে, আকাশের
সেই ধু-ধু করা তেপান্তরের মাঠ।
আর সূর্যও তার অবিরাম আলোকসম্পাত
ক'রে ঢলে পড়ল সাঁঝ-গগনে।
সময়ের পশ্চাতে বাঁধা সূর্যের গতি
কী সূর্যের পিছনে বাঁধা সময়ের গতি

তা বোঝা যায় না।
দিন যায় ভাবীকালকে আহ্বান করতে
একটা দিন আর একটা ঢেউ,
সময় আর সমুদ্র।
তবু দিন যায়
সূর্যের পিছনে, অন্ধকারে অবগাহন
করতে করতে।

যেতে হবে।
প্রকৃতির কাছে এই পরাভবের লজ্জায়
আর বেদনায় রক্তিম হল
সূর্যের মুখ,
আর পৃথিবীর লোকেরা ;
তাদের মুখ পুব-আকাশের মতো
কালো হয়ে উঠল।

মিনতি

সমবেত গান

দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে,
যেও না চলে,
অরুণ-আলো কে যে দেহে
যাও গো বলে।

ফেরো তুমি যাবার বেলা ;
সাঁঝ-আকাশে রঙের মেলা—
দেখছ কী কেমন ক'রে
আগুন হয়ে উঠল জ্বলে ।
পুব-গগনেব পানে বাবেক তাকাও
বিরহেরই ছবি কেন আঁকাও
আঁধার যেন দৈত্য সম আসছে বেগে,
শেষ হয়ে যাক তারা তোমাব ছোঁয়াচ লেগে
থামো ওগো, যেও না হয়
সময় হলে ॥

.সূর্য-প্রণাম

অস্তাচল

প্রান্তিক

আবৃত্তি

বেলাশেষে শান্তছায়া সন্ধ্যার আভাসে
বিষণ্ণ মলিন হয়ে আসে,
তারি মাঝে বিভ্রান্ত পথিক
তৃপ্তিহীন খুঁজে ফেরে পশ্চিমের দিক।
পথপ্রান্তে
প্রাচীন কদম্বতরুমূলে,
ক্ষণতরে স্তব্ধ হয়ে যাত্রা যায় ভুলে।
আবার মলিন হাসি হেসে
চলে নিরুদ্দেশে।
রজনীর অন্ধকারে একটি মলিন দীপ হাতে
কাদের সন্ধান করে উষ্ণ অশ্রুপাতে
কালের সমাধিতলে।
স্মৃতিরে সঞ্চয় করে জীবন-অঞ্চলে ;
মাঝে মাঝে চেয়ে রয় ব্যথা ভরা পশ্চিমের দিকে,
নির্নিমিখে।
যেথায় পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে অমর অক্ষরে
সেথায় কাদের আর্তনাদ বারংবার বৈশাখীর ঝড়ে।
আবার সম্মুখপানে
যাত্রা করে রাত্রির আহ্বানে।

ক্ষণদীপ উর্বর আলোতে
চিরন্তন পথের সংকেত
রেখে যায় প্রভাতের কানে।
অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃতির অন্তঃপুরে,
ভেসে ওঠে মানসমুকুরে
উত্তরকালের আর্তনাদ,—
"কবিগুরু
আমাদের যাত্রা শুরু
কালের অরণ্য পথে পথে
পরিত্যক্ত তব রাজ-রথে
আজি হতে শতবর্ষ আগে
অস্ত গোধূলির সন্ধ্যারাগে
যে দিগন্ত হয়েছে রক্তিম,
সেথা আজ কারো চিত্তবীণা
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজে কিনা
সে কথা শুধাও ?
শুধু দিয়ে যাও
ক্ষণিকের দক্ষিণ বাতাসে তোমার সুবাস
বাণীহীন অন্তরের অন্তিম আভাস।
তাই আজ বাধামুক্ত হিয়া
অজস্র উপেক্ষাভরে বিস্মৃতিরে পশ্চাতে ফেলিয়া
ছিন্নবাধা বলাকার মতো
মত্ত অবিরত,
পশ্চাতের প্রভাতের পুষ্প-কুঞ্জবনে
আজ শূন্য মনে।"

তাই উচ্চকিত পথিকের মন
অকারণ
উচ্ছ্বলিত চঞ্চল পবনে
অনাগত গগনে গগনে।
ক্লান্ত আজ প্রভাতের উৎসবের বাঁশি ;
পুরবাসী নবীন প্রভাতে
পুরাতন জয়মাল্য হাতে !
অস্তাচলে পথিকের মুখে মূর্ত হাসি ॥

শেষ মিনতি

গান

ও কে যায় চলে কথা না বলে, দিও না যেতে
তাহারই তরে আসন ঘরে রেখেছি পেতে।
কত কথা আছে তার মনেতে সদাই,
তবু কেন রবি কহে আমি চলে যাই ;
রামধনু রথে
বিদায়ের পথে
উঠিল মেতে।
রঙে রঙে আজ গোধূলি গগন
রঙিন কী হল, বিলাপে মগন।
আমি কেঁদে কই যেও না কোথাও,
সে যে হেসে কয় মোরে যেতে দাও

বাড়ায়ে বাহু
মরণ-রাহু
চাহিছে পেতে

৫

আয়োজন
বর্ণনা

হঠাৎ বুঝি তোমার রথের সাতটি ঘোড়া উঠল
হ্রেষা-রবে চঞ্চল হয়ে, যাবার ডাক শুনি ?
অস্তপথ আজ তোমারই প্রত্যাশায় উন্মুখ, হে কবি,
কখন তুমি আসবে ?
কবে, কখন তুমি এসে দাঁড়ালে
অস্তপথের সীমানায়, কেউ জানল না ; এমন কী
তুমিও না !
একবার ভেবে দেখেছ কি,
হে ভাবুক, তোমার চলমান ঘোড়ার শেষ পদক্ষেপের
আঘাতে কেমন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠবে আমাদের
অন্তরলোক ?
তোমার রচিত বাণীর মন্দিরে কোন্
নতুন পূজারী আসবে জানি না, তবু তোমার আসন হবে
শূন্য আর তোমার নিত্য-নুতন পূজাপদ্ধতি, অর্ঘ্য-উপচার
আর মন্দিরের বেদী স্পর্শ করবে না। দেউলের ফাটল
দিয়ে কোন অশথ-তরু চাইবে আকাশ, চাইবে তোমার

মন্দিরে তার প্রতিষ্ঠা, জানি না। তবু একদিন তা
সম্ভব, তুমিও জানো। সেই দিনকার কথা
ভেবে দেখেছ কি, হে দিগন্ত-রবি?
তোমার বেণুতে আজ শেষ সুর কেঁপে উঠল।
তুমি যাবে আমাদের মথিত করে। কোন্ মহাদেশের
কোন্ আসনে হবে তোমার স্থান? বিশ্ববীণার তারে আজ
কোন সুর বেজে উঠেছে, জানো? সে তোমারই বিদায়
বেদনায় সকরুণ ওপারের সুর। এই সুরই চিরন্তন,
সত্য এবং শাশ্বত। যুগের পর যুগ যে সুর ধ্বনিত হয়ে
আসছে, আবহমানকালের সেই সুর। সৃষ্টি-সুরের
প্রত্যুত্তর এই সুরের নাম লয়। তান-লয় নিয়ে তোমার
খেলা চলেছে কতকাল, আজ সেই লয়ের তান রণরণিত হচ্ছে
কোন্ অদৃশ্য তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, জানি না।
কোন্ যুগান্তরের পারেও ধ্বনিত হবে সেই সুর
কতদূর—তা কে জানে।

●

যাত্রা
আবৃত্তি

অমৃতলোকের যাত্রী হে অমর কবি, কোন প্রস্থানের
পথে তোমার একাকী অভিযান। প্রতিদিন তাই
নিজেরে করেছ মুক্ত, বিদায়ের নিত্য-আশঙ্কায়
পৃথ্বীর বন্ধন ভিত্তি নিশ্চিহ্ন করিতে বিপুল প্রয়াস

তব দিনে দিনে হয়েছে বর্ধিত। এই হাসি গান,
ক্ষণিকের অনিশ্চিত বুদ্বুদের মতো ; নশ্বর জীবন
অনন্ত কালের তুচ্ছ কণিকার প্রায় হাসি ও ক্রন্দনে
ক্ষয় হয়ে যায় তাই ওরা কিছু নয়, তুমিও জানিতে,
'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান'
তবু তুমি শিল্পীর তুলিকা নিয়ে করেছ অঙ্কিত
সভ্যতার প্রত্যেক সম্পদ, সুন্দরের সুন্দর অর্চনা।
বিশ্বপ্রদর্শনী মাঝে উজ্জ্বল তোমার সৃষ্টিগুলি
পৃথিবীর বিরাট সম্পদ। স্রষ্টা তুমি, দ্রষ্টা তুমি
নূতন পথের। সেই তুমি আজ পথে পথে,
প্রয়াণের অস্পষ্ট পরিহাসে আমাদের করেছ
উন্মাদ। চেয়ে দেখি চিতা তব জ্বলে যায় অসহ্য
দাহনে, জ্বলে যায় ধীরে ধীরে প্রত্যেক অন্তর।
তুমি কবি, তুমি শিল্পী, তুমি যে বিরাট, অভিনব
সবারে কাঁদায়ে যাও চুপি চুপি একী লীলা তব॥

বিদায়

গান

ঝুলন-পূর্ণিমাতে
নীরব নিঠুর মরণ'সাথে
কে তুমি ওগো মিলন-রাখী
বাঁধিলে হাতে ?

শ্রাবণদিনে উদাস হাওয়া ,
কাঁদিল একী,
পথিক রবির চলে যাওয়া
চাহিয়া দেখি,
ব্যাকুল প্রাণে সজলঘন
নয়ন পাতে ॥
বিদায় নিতে চায় কে ওরে
বাঁধরে তারে বজ্রডোরে
আলোর স্বপন ভেঙেছে মোর
আঁধার যেথায় শ্রাবণ-ভোর
ঘুম টুটে মোর সকল-হারা
এই প্রভাতে ॥

প্রণতি

সমবেত গান

নমো রবি, সূর্য দেবতা
জয় অগ্নি-কিরণময় জয় হে
সহস্র-রশ্মি বিভাসিত,
চির অক্ষয় তব পরিচয় হে ।
জয় ধ্বান্ত-বিনাশক জয় সূর্য
দিকে দিকে বাজে তব জয়-তূর্য
অনুক্ষণ কাঁদে মন, অকারণ অকারণ

কোথা তুমি মহামঙ্গলময় হে ।
কোথা সৌম্য শান্ত তব দীপ্ত ছবি
কোথা লাবণ্যপুঞ্জ হে ইন্দ্র রবি,
তুমি চিরজাগ্রত তুমি পুণ্য
রবিহীন আজি কেন মহাশূন্য
যুগে যুগে দাও তব আশিস অভয় হে ॥

হরতাল

হরতাল

রেলে 'হরতাল' 'হরতাল' একটা রব উঠেছে! সে খবর ইঞ্জিন, লাইন, ঘণ্টা, সিগন্যাল এদের কাছেও পৌঁছে গেছে। তাই এরা একটা সভা ডাকল। মস্ত সভা। পূর্ণিমার দিন রাত দুটোয় অস্পষ্ট মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর নীচে সবাই জড়ো হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বিশালবপু সভাপতি ইঞ্জিন মশাই এলেন। তাঁর লেট হয়ে গেছে। লম্বা চেহারার সিগন্যাল সাহেব এলেন হাত দুটো লট্‌পট্ করতে করতে, তিনি কখনো নীল চোখে, কখনো লাল চোখে তাকান। বন্দুক উঁচোনো সিপাইদের মতো সারি বেঁধে এলেন লাইন-ক্লিয়ার করা যন্ত্রের হাতলেরা। ঠকাঠক ঠকাঠক করতে করতে রোগা রোগা লাইন আর টেলিগেরাফের খুঁটিরা মিছিল করে সভা ভরিয়ে দিল। ফাজলামি করতে করতে ইস্‌টিশানের ঘণ্টা আর গার্ড সাহেবের লাল-সবুজ নিশানেরাও হাজির। সভা জমজমাট। সভাপতি শুরু করলেন:

"ভাই সব, তোমরা শুনেছ মানুষ মজুরেরা হরতাল করছে। কিন্তু মানুষ মজুরেরা কি জানে যে তাদের চেয়েও বেশী কষ্ট করতে হয় আমাদের, এইসব ইঞ্জিন-লাইন-সিগন্যাল-ঘণ্টাদের? জানলে তারা আমাদের দাবিগুলিও কর্তাদের জানাতে ভুলত না। বন্ধুগণ, তোমরা জানো আমার এই বিরাট গতরটার জন্যে আমি একটু বেশী খাই, কিন্তু যুদ্ধের আগে যতটা কয়লা খেতে পেতুম এখন আর ততটা পাই না, অনেক কম পাই। অথচ অনেক বেশী মানুষ আর মাল আমাদের টানতে হচ্ছে যুদ্ধের পর থেকে। তাই বন্ধুগণ, আমরা এই ধর্মঘটে সাহায্য করব। আর কিছু না হোক, বছরের পর বছর একটানা খাটুনির হাত থেকে কয়েক দিনের জন্যে আমরা রেহাই পাব। সেইটাই আমাদের লাভ হবে। তাতে শরীর একটু ভাল হতে পারে।

প্রস্তাব সমর্থন করে ইঞ্জিনের চাকারা বলল: ধর্মঘট হলে আমরা এক-পাও নড়ছি না, দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকব সকলে।

সিগন্যাল সাহেব বলল: মানুষ-মজুর আর আমাদের বড়বাবু ইঞ্জিন মশাইরা তবু কিছু খেতে পান। আমরা কিছুই পাই না, আমরা খাঁটি মজুর। হরতাল হলে আমি আর রাস্তার পুলিশের মতো হাত 'ওঠান-নামান মানবো না; চোখ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে পড়ে থাকব।

লাইন ক্লিয়ার করা যন্ত্রের হাতল বলল: আমরাও হরতাল করব। হরতালের সময় হাজার ঠেলাঠেলিতেও আমরা নড়ছি না। দেখি কি করে লাইন ক্লিয়ার হয়।

লাইনেরা বলল: ঠিক্ ঠিক্, আমরাও নট নড়ন-চড়ন, দাদা।

ইস্টিশানের ঘণ্টা বলল: সে সময় আমায় খুঁজেই পাবে না কেউ। ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াব। লাল-সবুজ নিশান বন্ধুরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ট্রেন ছাড়বে কি করে?

সভাপতি ইঞ্জিন মশাই বললেন: আমাকে বড়বাবু ইঞ্জিন মশাই বলে আর সম্মান করতে হবে না। আমি তোমাদের, বিশেষ করে আমার অধীনস্থ কর্মচারী চাকাদের কথা শুনে এতই উৎসাহিত হয়েছি যে আমি ঠিক করেছি অনশন ধর্মঘট করব। এক টুকরো কয়লাও আমি খাব না, তাহলেই সব অচল হয়ে পড়বে।

এদিকে কতকগুলো ইস্টিশানের ঘড়ি আর বাঁশি এসেছিল কর্তাদের দালাল হয়ে সভা ভাঙবার জন্যে। সভার কাজ ঠিক মতো হচ্ছে দেখে বাঁশিগুলো 'টিক্ টিক্ করে টিট্‌কিরী মেরে হট্টগোল করতে লাগল। অমনি সবাই হৈ হৈ করে তেড়ে মেড়ে মারতে গেল ঘড়ি আর বাঁশিদের। ঘড়িরা আর কী করে, প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি ছ'টা বাজিয়ে দিল।' অমনি সূর্য উঠে পড়ল। দিন হতেই সকলে ছুটে চলে গেল যে যার জায়গায়। সভা আর সেদিন হল না।

লেজের কাহিনী

একটি মাছি একজন মানুষের কাছে উড়ে এসে বলল: তুমি সব জানোয়ারের মুরুব্বি, তুমি সব কিছুই করতে পার, কাজেই আমাকে একটি লেজ করে দাও।

মানুষটি বললে: কি দরকার তোমার লেজের?

মাছিটি বললে: আমি কি জন্যে লেজ চাইছি? যে জন্যে সব জানোয়ারের লেজ আছে—সুন্দর হবার জন্যে।

মানুষটি তখন বলল: আমি তো কোনো প্রাণীকেই জানি না যার শুধু সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে। তোমার লেজ না হলেও চলবে।

এই কথা শুনে মাছিটি ভীষণ ক্ষেপে গেল আর সে লোকটিকে জব্দ করতে আরম্ভ করে দিল। প্রথমে সে বসল তার আচারের বোতলের ওপরে, তারপর নাকে সুড়সুড়ি দিল, তারপর এ-কানে ও-কানে ভন্‌ভন্‌ করতে লাগল। শেষকালে লোকটি বাধ্য হয়ে তাকে বললে: বেশ, তুমি উড়ে উড়ে বনে, নদীতে, মাঠে যাও, যদি তুমি কোনো জন্তু, পাখি কিংবা সরীসৃপ দেখতে পাও যার কেবল সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে, তার লেজটা তুমি নিতে পার। আমি তোমায় পুরো অনুমতি দিচ্ছি।

এই কথা শুনে মাছিটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে জানলা দিয়ে সোজা উড়ে চলে গেল।

বাগান দিয়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল একটা গুটিপোকা পাতার ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। সে তখন গুটিপোকার কাছে উড়ে এসে চেঁচিয়ে বলল: গুটিপোকা! তুমি তোমার লেজটা আমাকে দাও, ওটা তো কেবল তোমার সুন্দর হবার জন্যে।

গুটিপোকা: বটে? বটে? আমার মোটে লেজই হয় নি, এটা তো আমার পেট। আমি এটাকে টেনে ছোট করি, এইভাবে আমি চলি। আমি হচ্ছি, যাকে বলে, বুকে-হাঁটা প্রাণী।

মাছি দেখল তার ভুল হয়েছে, তাই সে দূরে উড়ে গেল।

তারপর সে নদীর কাছে এল। নদীর মধ্যে ছিল একটা মাছ আর একটা চিংড়ি। মাছি মাছটিকে বলল: তোমার লেজটা আমায় দাও, ওটা তো কেবল তোমার সুন্দর হবার জন্যে আছে।

মাছ বলল: এটা কেবল সুন্দর হবার জন্যে আছে তা নয়, এটা আমার দাঁড়। তুমি দেখ, যদি আমি ডান-দিকে বেঁকতে চাই তাহলে লেজটা আমি বাঁ-দিকে বেঁকাই আর বাঁ-দিকে চাইলে ডান-দিকে বেঁকাই। আমি কিছুতেই আমার লেজটি তোমায় দিতে পারি না।

মাছি তখন চিংড়িকে বলল: তোমার লেজটা তাহলে আমায় দাও, চিংড়ি!

চিংড়ি জবাব দিল: তা আমি পারব না। দেখ না, আমার পা-গুলো চলার পক্ষে কি রকম সরু আর দুর্বল, কিন্তু আমার লেজটি চওড়া আর শক্ত। যখন আমি জলের মধ্যে এটা নাড়ি, তখন এ আমায় ঠেলে নিয়ে চলে। নাড়ি-চাড়ি, নাড়-চাড়ি—আর যেখানে খুশি সাঁতার কেটে বেড়াই। আমার লেজও দাঁড়ের মতো কাজ করে।

মাছি আরো দূরে উড়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে মাছি একটা হরিণকে তার বাচ্চার সঙ্গে দেখতে পেল। হরিণটির ছোট্ট একটি লেজ ছিল—ক্ষুদে নরম, সাদা লেজ।

অমনি মাছি ভন্‌ভন্ করতে আরম্ভ করল: তোমার ছোট্ট লেজটি দাও না হরিণ!

হরিণ ভয় পেয়ে গেল।

হরিণ বললে: কেন ভাই? কেন? যদি তোমায় আমি লেজটা দিই, তাহলে আমি যে আমার বাচ্চাদের হারাব।

অবাক হয়ে মাছি বললে: 'তোমার লেজ তাদের কি কাজে লাগবে?

হরিণ বললে : বাঃ, কী প্রশ্নই না তুমি করলে ! ধর, যখন একটা নেকড়ে আমাদের তাড়া করে—তখন আমি বনের মধ্যে ছুটে গিয়ে লুকোই আর ছানারা আমার পিছু নেয়। কেবল তারাই আমায় গাছের মধ্যে দেখতে পায়, কেন না আমি আমার ছোট্ট সাদা লেজটা রুমালের মতো নাড়ি, যেন বলি : এই দিকে, বাছারা, এই দিকে। তারা তাদের সামনে সাদা মতো একটা কিছু নাড়তে দেখে আমার পিছু নেয়। আর এইভাবেই আমরা নেকড়ের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচি।

নিরুপায় হয়ে মাছি উড়ে গেল।

সে উড়তে লাগল—যতক্ষণ না সে একটা বনের মধ্যে গাছের ডালে একটা কাঠঠোক্‌রাকে দেখতে পেল।

তাকে দেখে মাছি বলল : কাঠঠোক্‌রা, তোমার লেজটা আমায় দাও। এটা তো তোমার শুধু সুন্দর হবার জন্যে।

কাঠঠোকরা বললে : কী মাথা-মোটা তুমি ! তাহলে কি করে আমি কাঠ ঠুক্‌রে খাবার পাব ? কি করে বাসা তৈরী করব বাচ্চাদের জন্যে ?

মাছি বলল : কিন্তু তুমি তো তা তোমার ঠোঁট দিয়েই করতে পার !

কাঠঠোক্‌রা জবাব দিল : ঠোঁট কেবল ঠোঁটই। কিন্তু লেজ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না। তুমি দেখ, কিভাবে আমি ঠোক্‌রাই।

কাঠঠোক্‌রা তার শক্ত লেজ দিয়ে গাছের ছাল আঁকড়ে ধরে গা দুলিয়ে এমন ঠোক্কর দিতে লাগল যে তার থেকে ছালের চোকলা উড়তে লাগল।

মাছি এটা না মেনে পারল না যে, কাঠঠোক্‌রা যখন ঠোক্‌রায় তখন সে লেজের ওপর বসে। এটা ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না। এটা তার ঠেক্‌নার কাজ করে।

মাছি আর কোথাও উড়ে গেল না। মাছি দেখতে পেল সব প্রাণীর লেজই কাজের জন্যে। বে-দরকারী লেজ কোথাও নেই—বনেও না, নদীতেও না। সে মনে মনে ভাবল—বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। "আমি লোকটাকে সোজা করবই। যতক্ষণ না সে আমায় লেজ করে দেয় আমি তাকে কষ্ট দেব।"

মানুষটি জানলায় বসে বাগান দেখছিল। মাছি তার নাকে এসে বসল। লোকটি নাক ঝাড়া দিল, কিন্তু ততক্ষণে সে তার কপালে গিয়ে ব'সে পড়েছে। লোকটি কপাল নাড়ল—মাছি তখন আবার তার নাকে।

লোকটি কাতর প্রার্থনা জানাল: আমায় ছেড়ে দাও, মাছি।

ভন্‌ভন্‌ করে মাছি বলল: কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না। কেন তুমি আমায় অকেজো লেজ আছে কি না দেখতে পাঠিয়ে বোকা বানিয়েছ। আমি সব প্রাণীকেই জিগ্‌গেস করেছি—তাদের সবার লেজই দরকারী।

লোকটি দেখল মাছি ছাড়বার পাত্র নয়—এমনই বদ এটা। একটু ভেবে সে বলল: মাছি, মাছি! দেখ, মাঠে গরু রয়েছে। তাকে জিগ্‌গেস করো তার লেজের কী দরকার।

মাছি জানলা দিয়ে উড়ে গিয়ে গরুর পিঠে বসে ভন্‌ভন্‌ করে জিগ্‌গেস করল: গরু, গরু! তোমার লেজ কিসের জন্যে?—তোমার লেজ কিসের জন্যে?

গরু একটি কথাও বলল না—একটি কথাও না। তারপর হঠাৎ সে তার লেজ দিয়ে নিজের পিঠে সপাৎ করে মারল—আর মাছি ছিটকে পড়ে গেল।

মাটিতে পড়ে মাছির শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল—পা দুটো উঁচু হয়ে রইল আকাশের দিকে।

লোকটি জানলা থেকে বলল: এ-ই ঠিক করেছে মাছির।

মানুষকে কষ্ট দিও না, প্রাণীদেরও কষ্ট দিও না। তুমি আমাদের কেবল জ্বালিয়ে মেরেছ।

[সোভিয়েট শিশুসাহিত্যিক ভি, বিয়াঙ্কির "টেইল্‌স্‌" গল্পের অনুবাদ।]

৩

ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা

একটি লোকের একটা ষাঁড়, একটা গাধা আর একটা ছাগল ছিল। লোকটি বেজায় অত্যাচার করত তাদের ওপর। ষাঁড়কে দিয়ে ঘানি টানাত, গাধা দিয়ে মাল বওয়াত আর ছাগলের সবটুকু দুধ দুয়ে নিয়ে বাচ্চাদের কেটে কেটে খেত, কিন্তু তাদের কিছুই প্রায় খেতে দিত না। কথায় কথায় বেদম প্রহার দিত।

তিনজনেই সব সময় বাঁধা থাকত, কেবল রাত্তির বেলায় ছাগল-ছানাদের শেয়ালে নিয়ে যাবে ব'লে গোয়ালঘরের মাচায় ছাগলকে না বেঁধেই ছানাদের সঙ্গে রাখা হত।

একদিন দিনের বেলায় কি ক'রে যেন ষাঁড়, গাধা, ছাগল তিনজনেই ছাড়া অবস্থায় ছিল। লোকটিও কি কাজে বাইরে গিয়ে ফিরতে দেরি ক'রে ফেলল। তিনজনের অনেক দিনের খিদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই গাধা সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ভাল ভাল জিনিস খেতে আরম্ভ করল। ষাঁড়টা কিছুক্ষণের মধ্যেই সাফ করে ফেলল লোকটির চমৎকার তরকারির বাগানটা। ছাগলটা আর কী করে, কিছুই যখন খাবার নেই, তখন সে বারান্দায় মেলা একটা আস্ত কাপড় খেয়ে ফেলল মনের আনন্দে।

লোকটি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে তাজ্জব ব'নে গেল। তারপর

চেলাকাঠ দিয়ে এমন মার মারল তিনজনকে যে আশপাশের পাঁচটা গ্রাম জেনে গেল লোকটির বাড়ি কিছু হয়েছে। সেদিনকার মতো তিনজনেরই খাওয়া বন্ধ করে দিল লোকটি।

রাত হতেই মাচা থেকে টুক ক'রে লাফিয়ে পড়ল ছাগল। তারপর গাধা আর ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করল: গাধা ভাই, ষাঁড় ভাই, জেগে আছ।

দুজনেই বলল : হ্যাঁ, ভাই!

ছাগল বলল : কি করা যায়?

ওরা বলল : কী আর করব, গলা যে বাঁধা!

ছাগল বলল : সেজন্যে ভাবনা নেই, আমি কি-না খাই? আমি এখুনি তোমাদের গলার দড়ি দুটো খেয়ে ফেলছি। আর খিদেও যা পেয়েছে!

ছাগল দড়ি দুটো খেয়ে ফেলতেই তিনজনের পরামর্শ-সভা শুরু হয়ে গেল।

তারা পরামর্শ করে একটা 'সমিতি' তৈরী করল। ঠিক হল আবার যদি এইরকম হয়, তাহলে তিনজনেই একসঙ্গে লোকটিকে আক্রমণ করবে। ষাঁড় আর গাধা দুজনে একমত হয়ে ছাগলকে সমিতির সম্পাদক করল। কিন্তু গোল বাধল সভাপতি হওয়া নিয়ে। ষাঁড় আর গাধা দুজনেই সভাপতি হতে চায়। বেজায় ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। শেষকালে তারা কে বেশী যোগ্য ঠিক করবার জন্যে, সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেল। ছাগলকে রেখে গেল লোকটির ওপর নজর রাখতে। মোড়ল ছিল লোকটির বন্ধু। গাধাটা চেঁচামেচি করে ঘুম ভাঙাতেই বাইরে বেরিয়ে মোড়ল চিনল এই দুটি তার বন্ধুর ষাঁড় আর গাধা। সে সব কথা শুনে বলল: বেশ, তোমরা এখন আমার বাইরের ঘরে খাও আর বিশ্রাম কর, পরে তোমাদের বলছি কে যোগ্য বেশী। ব'লে সে তার গোয়ালঘর দেখিয়ে দিল। দুজনেরই খুব খিদে। তারা গোয়ালঘরে ঢুকতেই মোড়ল গোয়ালের শিকল

তুলে দিয়ে বলল : মানুষের বিরুদ্ধে সমিতি গড়ার মজাটা কি, কাল সকালে তোমাদের মনিবের হাতে টের পাবে।

এদিকে অনেক রাত হয়ে যেতেই ছাগল বুঝল ওরা বিপদে পড়েছে, তাই আসতে দেরি হচ্ছে। সে তার ছানাদের নিয়ে প্রাণের ভয়ে ধীরে ধীরে লোকটির বাড়ি ছেড়ে চলে গেল বনের দিকে।

সকাল হতেই খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল চারিদিকে। লোকটি এক সময়ে খবর পেল ষাঁড় আর গাধা আছে তার মোড়ল-বন্ধুর বাড়ি। অমনি দড়ি আর লাঠি নিয়ে ছুটল সে মোড়লের কাছে, জানোয়ার আনতে।

'মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই' এই কথা ভাবতে ভাবতে খালি পেটে ষাঁড় আর গাধা পালাবার মতলব আঁটছিল। এমন সময় সেখানে লোকটি হাজির হল। তারপর লোকটির হাতে প্রচণ্ড মার খেতে খেতে ফিরে এসে গাধা আর ষাঁড় আবার মাল বইতে আর ঘানি টানতে শুরু করল আগের মতোই। কেবল ছাগলটাই আর কখনো ফিরে এল না। কারণ অনেক মহাপুরুষের মতো ছাগলটারও একটু দাড়ি ছিল।

উপদেশ : নিজের কাজের মীমাংসা করতে অন্যের কাছে কখনো যেতে নেই।

দেবতাদের ভয়

[পাত্র-পাত্রী : ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারদ, অগ্নি, বরুণ ও পবন]

ইন্দ্র : কি ব্যাপার ?

ব্রহ্মা : আমার এত কষ্টের ব্রহ্মাণ্ডটা বোধহয় ছারখার হয়ে গেল। হায়—হায়—হায় !

নারদ : মানুষের হাত থেকে স্বর্গের আর নিস্তার নেই মহারাজ, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ইন্দ্র : আঃ, বাজে বকবক না করে আসল ব্যাপারটা খুলে বলুন না, কি হয়েছে?

ব্রহ্মা : আর কী হয়েছে! অ্যাটম বোমা!—বুঝলে? অ্যাটম বোমা।

ইন্দ্র : কই, অ্যাটম বোমার সম্বন্ধে কাগজে তো কিছু লেখে নি?

নারদ : ও আপনার পাঁচ বছরের পুরনো মফঃস্বল সংস্করণ কাগজ। ওতে কি ছাই কিছু আছে নাকি?

ইন্দ্র : অ্যাটম বোমাটা তবে কি জিনিস?

ব্রহ্মা : মহাশক্তিশালী অস্ত্র! পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে।

ইন্দ্র : আমার বজ্রের চেয়েও শক্তিশালী?

নারদ : আপনার বজ্রে তো শুধু একটা তালগাছ মরে, এতে পৃথিবীটাই লোপাট হয়ে যাবে।

ইন্দ্র : তাইতো, বড় চিন্তার কথা। এই রকম অস্ত্র আমরা তৈরী করতে পারি না? বিশ্বকর্মা কি বলে?

নারদ : বিশ্বকর্মা বলছে তার সেকেলে মালমশলা আর যন্ত্রপাতি দিয়ে ওসব করা যায় না। তা ছাড়া সে যা মাইনে পায় তাতে অত খাটুনি পোষায়ও না।

ইন্দ্র : তবে তো মুস্কিল! ওরা আমার পুষ্পকরথের নকল করে এরোপ্লেন করেছে, আর বজ্রের নকল করে অ্যাটম বোমাও করল। এবার যদি হানা দেয় তা হলেই সেরেছে। আচ্ছা অগ্নি, তুমি পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে দিতে পার না?

অগ্নি : আগে হলে পারতুম। আজকাল দমকলের ঠেলায় দম আটকে মারা যাই যাই অবস্থা।

ইন্দ্র : বরুণ! তুমি ওদের জলে ডুবিয়ে মারতে পার না?

বরুণ : পরাধীন দেশ হলে পারি। এই তো সেদিন চট্টগ্রামকে ডুবিয়ে দিলুম। কিন্তু স্বাধীন দেশে আর মাথাটি তোলবার জো নেই। কেবল ওরা বাঁধ দিচ্ছে।

ইন্দ্র : পবন?

পবন : পরাধীন দেশের গরিবদের কুঁড়েগুলোই শুধু উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে লাভ কি?

ইন্দ্র : আমাদের তৈরী মানুষগুলোর এত আস্পর্ধা? দাও সব স্বর্গের মজুরদের পাঁচিল তোলার কাজে লাগিয়ে—।

নারদ : কিন্তু তারা যে ধর্মঘট করেছে।

ইন্দ্র : ধর্মঘট কেন? কি তাদের দাবি?

নারদ : আপনি যেভাবে থাকেন তারাও সেইভাবে থাকতে চায়।

ইন্দ্র : (ঠোঁট কামড়িয়ে) বটে? মহাদেব আর বিষ্ণু কি করছেন?

ব্রহ্মা : মহাদেব গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছেন আর বিষ্ণু অনন্ত শয়নে নাক ডাকাচ্ছেন।

ইন্দ্র : এঁদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। আচ্ছা, মানুষগুলোকে ডেকে বুঝিয়ে দিতে পার যে এতই যখন করছে তখন ওরা একটা আলাদা স্বর্গ বানিয়ে নিক না কেন?

নারদ : তা তো করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া নাকি ওদের কাছে স্বর্গ, খাওয়া-পরার কষ্ট নাকি কারুর সেখানে নেই। সবাই সেখানে নাকি সুখী।

ইন্দ্র : কিন্তু সেখানে কেউ তো অমর নয়।

ব্রহ্মা : নয়। কিন্তু মরা মানুষ বাঁচানোর কৌশলও সেখানে আবিষ্কার হয়েছে। অমর হতে আর বাকি কী?

ইন্দ্র : তা হলে উপায়?

ব্রহ্মা : উপায় একটা আছে। ওদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটিটা যদি বজায় রাখা যায় তা হলেই ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে মারা পড়বে, আমরাও নিশ্চিন্ত হব।

ইন্দ্র : তা হলে নারদ, তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি চলে যাও সটান পৃথিবীতে। সেখানে লোকদেব বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের বিষ ঢুকিযে দাও। তা হলেই—তা হলেই আমাদের স্বর্গ মানুষের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

নারদ : তথাস্তু। আমার ঢেঁকিও তৈবী আছে।

[নারদের প্রস্থান]

রাখাল ছেলে

সূর্য যখন লাল টুকটুকে হয়ে দেখা দেয় ভোরবেলায়, রাখাল ছেলে তখন গরু নিয়ে যায় মাঠে। আর সাঁঝের বেলায় যখন সূর্য ডুবে যায় বনের পিছনে, তখন তাকে দেখা যায় ফেরার পথে। একই পথে তার নিত্য যাওয়া-আসা। বনের পথ দিয়ে সে যায় নদীর ধারের সবুজ মাঠে। গরুগুলো সেখানেই চ'রে বেড়ায়। আর সে বসে থাকে গাছের ছায়ায় বাঁশিটি হাতে নিয়ে, চুপ করে চেয়ে থাকে নদীর দিকে, আপন মনে ঢেউ গুনতে গুনতে কখন যেন বাঁশিটি তুলে নিয়ে তাতে ফুঁ দেয়। আর সেই সুর শুনে নদীর ঢেউ নাচতে থাকে, গাছের পাতা দুলতে থাকে আর পাখিরা কিচির-মিচির করে তাদের আনন্দ জানায়!

একদিন দোয়েল পাখি তাকে ডেকে বলে :

॥ গান ॥

ও ভাই, রাখাল ছেলে !
এমন সুরের সোনা বলো কোথায় পেলে ।
আমি যে রোজ সাঁঝ-সকালে,
বসে থাকি গাছের ডালে,
তোমার বাঁশির সুরেতে প্রাণ দিই ঢেলে ॥

তোমার বাঁশির সুর যেন গো নির্ঝরিণী
তাই শোনে রোজ পিছন হতে বনহরিণী ।
চুপি চুপি আড়াল থেকে
সে যায় গো তোমায় দেখে
অবাক হয়ে দেখে তোমায় নয়ন মেলে ॥

রাখাল ছেলে অবাক হয়ে দেখে সত্যিই এক দুষ্টু হরিণী লতাগুল্মের আড়াল থেকে মুখ বার করে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে তার দিকে । সে তাকে বললে :

ওগো বনের হরিণী !
তুমি রইলে কেন দূরে দূরে,
বিভোর হয়ে বাঁশির সুরে,
আমি তো কাছে এসে বসতে তোমায়
নিষেধ করি নি ।

হরিণীর ভয় ভেঙে গেল, সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এল রাখাল ছেলের কাছে । সে তার পাশটিতে এসে চোখে চোখ মিলিয়ে শুনতে লাগল তার বাঁশি । অবোধ বনের পশু মুগ্ধ হল বাঁশির তানে । তারপর প্রতিদিন সে এসে বাঁশি শুনত, যতক্ষণ না তার রেশটুকু মিলিয়ে যেত বনান্তরে ।

হরিণীর মা-র কিন্তু পছন্দ হল না তার মেয়ের এই বাঁশি-শোনা ! তাই সে মেয়েকে বললে :

ও আমার দুষ্টু মেয়ে,
রোজ সকালে নদীর ধারে যাস কেন ধেয়ে।
ভুল ক'রে আর যাস্‌নেরে তুই শুনতে বাঁশি
ওরা সব দুষ্টু মানুষ মন ভুলাবে মিষ্টি হাসি
বুঝি বা ফাঁদ পেতেছে ওরা তোকে একলা পেয়ে ॥

তখন হরিণী তার মা-কে বুঝোয় :

না গো মা, ভয় ক'রো না
সে তো মানুষ নয়।
সে যে গো রাখাল ছেলে,
আমি তার কাছে গেলে
বড্ড খুশি হয় ॥

এমনি ক'রে সুরের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে হরিণী। রাখাল ছেলে হরিণীকে শোনায় বাঁশি, আর হরিণী রাখাল ছেলেকে শোনায় গান :

তোমার বাঁশির সুর যেন গো
নদীর জলে ঢেউয়ের ধ্বনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন জাগায়
মাতায় বনের দিনরজনী।
সকাল হলে যখন হেথায় আস
বাঁশির সুরে সুরে আমায় গভীর ভালবাসো—
মনের পাখায় উড়ে আমি
স্বপনপুরে যাই তখনি ॥

কিন্তু হরিণীর নিত্যি স্বপনপুরে যাওয়া আর হল না। একদিন এক শিকারী এল সেই বনে। দূর থেকে সে অবাক হয়ে দেখল একটি রাখাল ছেলে বিহ্বল হয়ে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে আর একটি বন্য হরিণী তার পাশে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে। কিন্তু শিকারীর মন ভিজল না সেই স্বর্গীয় দৃশ্যে, সে এই সুযোগের অপব্যয় না করে বধ করল হরিণীকে। মৃত্যুপথযাত্রী হরিণী তখন রাখাল ছেলেকে বললে—বাঁশিতে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সেই তুমি, বোধহয় মানুষ বলেই, আমার মৃত্যুর কারণ হলে। তবু তোমায় মিনতি করছি :

বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু
আমার মরণকালে,
মরণ আমার আসুক আজি
বাঁশির তালে তালে।
যতক্ষণ মোর রয়েছে প্রাণ
শোনাও তোমার বাঁশরির তান
বাঁশির তরে মরণ আমার
ছিল মন্দ-ভালে।
বনের হরিণ আমি যে গো
কারুর সাড়া পেলে,
নিমেষে উধাও হতাম
সকল বাধা ঠেলে।
সেই আমি বাঁশরির তানে
কিছুই শুনি নি কানে
তাই তো আমি জড়ালেম এই
কঠিন মরণ-জালে॥

বাঁশি শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে হরিণীর মৃত্যু হল। সাথীকে হারিয়ে রাখাল ছেলে অসীম দুঃখ পেল। সে তখন কেঁদে বললে :

বিদায় দাও গো বনের পাখি !
বিদায় নদীর ধার,
সাথীকে হারিয়ে আমার
বাঁচা হল ভার।
আর কখনো হেথায় আসি
বাজাব না এমন বাঁশি
আবার আমার বাঁশি শুনে
মরণ হবে কার।

বনের পাখি, নদীর ধার সবাই তাকে মিনতি করল—তুমি যেও না।

যেও না গো রাখাল ছেলে
আমাদেরকে ছেড়ে
তুমি গেলে বনের হাসি
মরণ নেবে কেড়ে,
হরিণীর মরণের তরে
কে কোথা আর বিলাপ করে
ক্ষণিকের এই ব্যথা তোমার
আপনি যাবে সেরে।

দূর থেকে শুধু রাখাল ছেলে বলে গেল :

ডেকো না গো তোমরা আমায়
চলে যাবার বেলা,
রাখাল ছেলে খেলবে না আর
মরণ-বাঁশির খেলা॥

পত্রগুচ্ছ

এক

বেলেঘাটা

৩৪ হরমোহন ঘোষ লেন,

শ্রীরুদ্রশরণম্- - কলিকাতা।

পরম হাস্যাস্পদ, অরুণ,[১]—আমার ওপর তোমার রাগ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, আর আমিও তোমার রাগকে সমর্থন করি। কারণ, আমার প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই, বিশেষত তোমার স্বপক্ষে আছে যখন বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ। কিন্তু চিঠি না-লেখার মতো বিশ্বাসঘাতকতা আমার দ্বারা সম্ভব হত না, যদি না আমি বাস করতাম এক বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে—তবুও আমি তোমাকে রাগ করতে অনুরোধ করছি। কারণ কলকাতার বাইরে একজন রাগ করবার লোক থাকাও এখন আমার পক্ষে একটা সান্ত্বনা, যদিও কলকাতার ওপর এই মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো কিছু ঘটে নি, তবুও কলকাতার নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সব কটা লক্ষণই বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো আমি প্রত্যক্ষ করছি।······

······ম্লানায়মান কলকাতার ক্রমস্তব্ধমান[২] স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর মাঝে-মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। এই হল কলকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এ চিঠি পৌঁছবে কি না; জানি না ডাকবিভাগ ততদিন সচল থাকবে কি না। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন

—সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে। প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক-একটি দিন যেন মহাকালের এক-একটি পদক্ষেপ, আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে বাসরঘরের নববধূর মতো এক নতুন পরিচয়ের সামীপ্যে। ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর, অরুণ?

কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম, একটা রহস্যময়ী নারীর মতো, ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার জীবনের এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ-নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে; তার স্পর্শে আমি জেগেছি, তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এ পৃথিবীতে থাকব না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যে কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি! সত্যি অরুণ, বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে।

আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম!……এই আমার আজকের সান্ত্বনা। তুমি চলে যাবার দিন আমার দেখা পাও নি কেন জান? শুধু আমার নির্লিপ্ত উদাসীনতার জন্যে। ভেবে দেখলাম কোনো লাভ নেই সেই দেখা করায়, তবু কেন মিছিমিছি মন খারাপ করব?……

কিন্তু সেদিন থেকে আর চিঠি লেখবার সুযোগ পাই নি। কারণ উপক্রমণিকা[৩] ভরিয়ে তুলল আমাকে তার তীব্র শারীরিকতায়—তার বিদ্যুৎময় ক্ষণিক দেহ-ব্যঞ্জনায়, আমি যেন যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালাম, স্তব্ধতায় স্পন্দিত হতে লাগলাম প্রতিদিন। দৃষ্টি দিয়ে পেতে চাইলাম তাকে নিবিড় নৈকট্যে। মনে হল আমি যেন সম্পূর্ণ হলাম তার গভীরতায়। তার দেহের প্রতিটি ইঙ্গিত কথা কয়ে উঠতে লাগল আমার প্রতীক্ষমান মনে। একি চঞ্চলতা আমার স্বাভাবিকতার? ওকে দেখবার তৃষ্ণায় আমি অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম বহুদর্শনেও। না-দেখার ভান করতাম ওকে দেখার সময়ে। অর্থাৎ এ ক'দিন আমার মনের শিশুত্বে দোলা লেগেছিল গভীরভাবে। অবিশ্যি একবার দুলিয়ে দিলে সে দোলন থামে বেশ একটু দেরি করেই,—তাই আমার মনে এখনও চলছে সেই আন্দোলন। তবু কী যে হয়েছিল আমার, এখনও বুঝতে পারছি না; শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, আমার মনের অন্ধকারে ফুটে উঠেছিল একটি রৌদ্রময় ফুল। তার সৌরভ আজও আমায় চঞ্চল করে তুলেছে থেকে-থেকে। ওর চলে যাবার দিন দেখেছিলাম ওর চোখ, সে চোখে যেন লেখা ছিল "হে বন্ধু বিদায়, তোমাকে আমার সান্নিধ্য দিতে পারলাম না, ক্ষমা কর।" সে ক'দিন কেটেছিল যেন এক মূর্ছার মধ্যে দিয়ে, সমস্ত চেতনা হারিয়ে গেছল কোনও অপরিচিত সুরলোকে। তোমরা একে পূর্বরাগ আখ্যা দিতে পার, কিন্তু আমি বলব এ আমার দুর্বলতা। তবে এ থেকে আমার অনুভূতির কিছু উন্নতি সাধন হল। কিন্তু এ ঘটনার পর আমি কোনও প্রেমের কবিতা লিখি নি, কারণ প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে ন্যক্কারজনক বলে মনে হয়।

আমার কথা তো অনেক বললাম, এবার তোমার খবর কি তাই বল। থিয়েটারের রিহার্সাল পুরোদমে চলছে তো?......তারপর সঙ্গে নিয়ত দেখা হচ্ছে নিশ্চয়ই? তার মনোভাব তোমার প্রতি

প্রসন্ন, অন্যথায় প্রসন্ন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তোমার প্রেমের মৃদুশীতলধারায় তার নিত্যস্নানের ব্যবস্থা কর, আর তোমার সান্নিধ্যের উষ্ণতায় তাকে ভরিয়ে তুলো।

তুমি চলে যাবার পর আমি তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যর 'বনশ্রী', প্রবোধের 'কলরব,' মণীন্দ্রলাল বসুর 'রক্তকমল' ইত্যাদি বইগুলি পড়লাম। প্রত্যেকখানিই লেগেছে খুব ভাল। আর অনাবশ্যক চিঠির কলেবব বৃদ্ধির কি দবকার? আশা করি তোমরা সকলে, তোমাব মা-বাবা-ভাই-বোন ··· ইত্যাদি সকলেই দেহে ও মনে সুস্থ। তুমি কি লিখলে-টিখলে? তোমার মা গল্প-সল্প কিছু লিখছেন তো? তাহলে আজকের মতো লেখনী কিন্তু চিঠির কাগজের কাছে বিদায নিচ্ছে।

২৮শে পৌষ, '৪৮

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

দুই

বেলেঘাটা

কলকাতা

৩৪, হরমোহন ঘোষ লেন

—ফাগুনের একটি দিন।

অরুণ,

তোর অতি নিরীহ চিঠিখানা পেয়ে তোকে ক্ষমা করতেই হল. কিন্তু তোর অতিরিক্ত বিনয় আমাকে আনন্দ দিল এইজন্যে যে, ক্ষমাটা তোর কাছ থেকে আমারই প্রাপ্য; কারণ তোর আগের 'ডাক-বাহিত'

চিঠিটার জবাব আমারই আগে দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, উল্টে আমাকেই দেখছি ক্ষমা করতে হল। তোর চিঠিটা কাল পেয়েছি, কিন্তু পড়লুম আজকে সকালে; কারণ পরে ব্যক্ত করছি। বাস্তবিক, তোর দুটো চিঠিই আমাকে প্রভূত আনন্দ দিল। কারণ চিঠির মতো চিঠি আমাকে কেউ লেখে না এবং এটুকু বলতে দ্বিধা করব না যে, তোর প্রথম চিঠিটাই আমার জীবনের প্রথম একখানি ভাল চিঠি, যার মধ্যে আছে সাহিত্য-প্রধানতা। তোর প্রথম চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি তোর মতোই অলসতায় এবং একটু নিশ্চিন্ত নির্ভরতাও ছিল তার মধ্যে। এবারে চিঠি লিখছি এইজন্যে যে, এতদিন ভয় পেয়ে পেয়ে এবার মরিয়া হয়ে উঠেছি মনে মনে।

কাল বিকেলে তোর বাবা ঠিকানা খুঁজে খুঁজে অবশেষে তোর চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তোর মা-র কাছে। কিন্তু তুই বোধ হয় এ খবর পাস নি যে, তোদের আগের সেই লতাচ্ছাদিত, তৃণশ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে। যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়, যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, কত বিরস দুপুর, কত উজ্জ্বল প্রভাত, কত চৈতালি হাওয়ায়-হাওয়ায় রোমাঞ্চিত রাত্রি, তোর কত উষ্ণ কল্পনায়, নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল আপাত নিষ্প্রয়োজনতায়। তোর মা এতে পেয়েছেন গভীরতম বেদনা, তাঁর ঠিক আপন জায়গাটিই যেন তিনি হারালেন। এক আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন এক নিকটতম আত্মীয় সুদূর হয়ে উঠল প্রকৃতির প্রয়োজনে। শত শত জন-কোলাহল-মথিত ইস্কুল বাড়িটি আজ নিস্তব্ধ নিঝুম। সদ্য বিধবা নারীর মতো তার অবস্থা। তোদের অজস্র-স্মৃতি-চিহ্নিত তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন তোদেরই স্পর্শের জন্য উন্মুখ; সেখানে এখনও বাতাসে বাতাসে পাওয়া যায় তোদের স্মৃতির

সৌরভ। কিন্তু সে আর কতদিন?" তবু বাড়িটি যেন আজ তোদেরই ধ্যান করছে।

তোদের নতুন বাড়িটায় গেলুম। এ বাড়িটাও ভাল, তবে ও-বাড়ির তুলনায় নয়। সেখানে রাত প্রায় পৌনে এগারোটা পর্যন্ত তোর বাবা এবং মা-র সঙ্গে প্রচুর গল্প হল। তাঁদের গত জীবনের কিছু-কিছু শুনলাম; শুনলাম সুন্দরবনের কাহিনী। কালকের সন্ধ্যা কাটল একটি পবিত্র, সুন্দর কথালাপের মধ্যে দিযে, তারপর তোর বাবা-মা, তোর ছোট ভাই আব আমি গিয়েছিলাম তোদের সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে এবং এইজন্যেই ঐ সম্বন্ধে আমাব এত কথা লেখা। দেখলাম স্তব্ধ বিস্মযে চেয়ে চেয়ে, সদ্যবিয়োগ-ব্যথাতুরা বিরহিণীর মতো বাড়িটার এক অপূর্ব মুহ্যমানতা। তারপর ফিরে এসে হল আরও কথা। কালকের কথাবার্তায় আমার তোর বাবা এবং মা-র ওপর আরও নিবিড়তম শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। (কথাটা চাটুবাদ নয়)। তোদের (তোর এবং তোর মা-র) দুজনের লেখা গানটা পড়লুম; বেশ ভাল। কালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম 'পাঁচটি ফাগুনসন্ধ্যা ও একটি কোকিল'[৪] গল্পটি। আজ দুপুরে সেটি পড়লুল। বাস্তবিক, এ রকম এবং এ ধরনের গল্প আমি খুব কম পড়েছি (ভালর দিক থেকে), কারণ ভাব এবং ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। পাঁচটি ফাগুনসন্ধ্যার সঙ্গে একটি কোকিলের সম্পর্ক একটি নতুন ধরনের জিনিস। গল্পটা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য।

যাই হোক, এখন তোর খবর কি? তুই চলে আয় এখানে, কাল তোদের বাড়িতে তোর অভাব বড় বেশী বোধ হচ্ছিল, তাই চলে আয় আমাদের সান্নিধ্যে। অজিতের সঙ্গে পথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তোর কথা সে জিজ্ঞাসা করে। ভূপেন[৫] আজ এসেছিল—একটা চিঠি দিল তোকে দেবার জন্যে—আর একটু আগে তাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম বাড়ির পথে। উপক্রমণিকার মোহ প্রায় মুছে আসছে।

শ্যামবাজার প্রায়ই যাই। তুই আমাকে তোদের ওখানে যেতে লিখেছিস, আচ্ছা চেষ্টা করব।

চিঠিটা লিখেই তোর মা-র কাছে যাব। বাস্তবিক, তোর মা তোর জীবনে স্বর্গীয় সম্পদ। তোর জীবনে যা কিছু, তা যে তোর এই মা-কে অবলম্বন করেই—এই গোপন কথাটা আজ জেনে ফেলেছি। তুই কিসের ঝগড়া পাঠালি, বুঝতে পারলুম না। তুই চলে আয়, আমি ব্যাকুল স্বরে ডাকছি, তুই চলে আয়। প্রীতি-টিতি নেওয়ার ব্যাপার যখন আমাদের মধ্যে নেই, তখন বিদায়।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

তিন

বেলেঘাটা,

২২শে চৈত্র, ১৩৪৮।

সবুরে মেওয়াফল-দাতাসু,

অরুণ, তোর কাছ থেকে চিঠির প্রত্যাশা করা আমার উচিত হয় নি, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। বিশেষত তোর যখন রয়েছে অজস্র অবসর—সেই সময়টা নিছক বাজে খরচ করতে বলা কি আমার উচিত? সুতরাং তোর কাছ থেকে চিঠি প্রাপ্তির দুরাশা আমায় বিচলিত করে নি।

কোনো একটা চিঠিতে আমার ব্যক্তিগত অনেক কিছু বলার থাকলেও আজ আমি শুধু আমার পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দেব। প্রথমে দিচ্ছি কলকাতার বর্ণনা—কলকাতা এখন আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত, নাগরিকরা পলায়ন-তৎপর। নাগরিকরা যে পলায়ন-তৎপর তার

প্রধান দৃষ্টান্ত তোমার মা, যদিও তিনি নাগরিক নন, নিতান্ত গ্রামের। তবু এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কত দ্রুত সবাই করছে প্রস্থান আর শহরটি হচ্ছে নির্জন। তবে এই নির্জনতা হবে উপভোগ্য—কারণ এর জনাকীর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত, সুতরাং এর নব্য পরিচয়ে আমরা একটা অচেনা কিছু দেখার সৌভাগ্যে সার্থক হব। আর কলকাতার ভীষণতার প্রয়োজন এই জন্যে যে, এত আগন্তুকের স্থান হয়েছিল এই কলকাতায়, তার ফলে কলকাতা কাদের তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন বিদেশী এলে সে বুঝতেই পারবে না, যতক্ষণ না তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে দেশটা কাদের। কারণ, যা ভীড়—তাতে মনে হয় দেশটা সকলের না-হোক, শহরটা সার্বজনীন।

আজকাল রাত একটায় যদি কলকাতা ভ্রমণ কর তাহলে তোমার ভয়ঙ্কর সাহস আছে বলতে হবে। শুধু চোর-গুণ্ডার নয়, কলকাতার পথে এখন রীতিমত ভূতের ভয়ও করা যেতে পারে। সন্ধ্যার পর কলকাতায় দেখা যায় গ্রাম্য বিষণ্ণতা। সেই আলোকময়ী নগরীকে আজকাল স্মরণ করা কঠিন ; যেমন একজন বৃদ্ধা বিধবাকে দেখলে মনে করা কঠিন তার দাম্পত্য-জীবন। আর বিবাহের পূর্বে বিবাহোন্মুখ বধূর মতো কলকাতার দেখা দিয়েছে প্রতীক্ষা—অন্য দেশেরা বিবাহিতা সখীর মতো দেখবে ঘটিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

আজ আমার ভাইয়েরা চলে গেল মুর্শিদাবাদ—আমারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমি গেলাম না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দুঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি-সংকুল, রোমাঞ্চকর, পরম মুহূর্তের সন্ধানে। তবু আমার ক্লান্তি আসছে, ক্লান্তি আসছে এই অহেতুক বিলম্বে।

এ ক'দিন তোর মা-র সান্নিধ্য লাভ করলুম গভীরভাবে এবং আর যা লাভ করলুম তা এই চিঠিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। অনেক

আলোচনায় অনেক কিছুই জানলাম যা জানার দরকার ছিল আমার। আর তোর বাবার সরল স্নেহে আমি মুগ্ধ। আমার খবর আর কী দেব? তবে উপক্রমণিকাকে আমি একেবারে মুছে ফেলেছি মন থেকে, তার জায়গায় যে আসন নিয়েছে তার পরিচয় দেব পরের চিঠিতে। ভূপেন বিরহ-বিধুর মন নিয়ে ভালই আছে এবং কলকাতাতেই আছে। তাকে অন্তত একখানা চিঠি দিস—এতদিন পরে। ঘেলু[৬] এখানে নেই, কয়েক দিনের জন্যে ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জায়গায় গেছে ভ্রমণোদ্দেশে, সুকুমার রায়ের বাড়ি। তোর খবর সমস্ত আমার জানা, সুতরাং কোনো প্রশ্ন করব না। আমার এই চিঠির উত্তর যতদিন পরে খুশি দিস—তবে না-দিলেও ক্ষতি নেই। ইতি—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

চার

বেলেঘাটা—চৈত্র সংক্রান্তি '৪৮
কলকাতা।

প্রভূতআনন্দদায়কেষু—

অরুণ, তোর আশাতীত, আকস্মিক চিঠিতে আমি প্রথমটায় বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম—আর আরও পুলকিত হয়েছিলাম আর একটুকরো কাগজে কয়েক টুকরো কথা পেয়ে। তারপর কৃতসংকল্প হলাম পত্রপাঠ চিঠির জবাব দিতে। আজ খুব বেশী বাজে কথা লিখব না,—আর আমার চিঠি সাধারণত একটু উচ্ছ্বাসবর্জিতই, সুতরাং আজকে প্রধান কথাটি বলতে, সাধারণ জবাবগুলো একটু সংক্ষেপে সারব। এতে আপত্তি করলে চলবে না।

তুই যে খুব সুখে আছিস তা বুঝতেই পারছি, আর তোর অপূর্ব দিনগুলির গন্ধ পেলাম তোর চিঠির মধ্যে দিয়ে। তুই আমাকে তোদের কাছে যেতে লিখেছিস, কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে কলকাতার ভয়ঙ্কর দিনগুলো হারিয়ে ফেলি। তবে আশা রইল, বৈশাখ মাসেই হয়তো লাভ করব তোর সামীপ্য। তবে তা দ্বিতীয় সপ্তাহে কিনা বলতে পারি না। আর তোদের ওখানে যাবার একটা 'নীট খরচ' যদি জানিয়ে দিতে পারিস, তবে আমার কিছু সুবিধা হয়। তোব একাকীত্ব ভাল লাগে না এবং ভাল লাগে না আমারো এই প্রাণস্পর্শহীন আত্মমগ্নতা। তবে একাকীত্ব অনুকূল নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করার পক্ষে। একাকী মানুষ যা চিন্তা করে সেইটাই তার নিজের চিন্তা। নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের প্রকৃতিকে পায়। সেই জন্যেই, একাকীত্বের একটা উপকারিতা আছে বলে আমার মনে হয়। তা দীর্ঘ হলেও ক্ষতি নেই।

তোর কথামত অজিতকে[৭] শুধু জানিয়েছি তোকে লেখার কথা। আর কাজগুলো সবই ধীরে সুস্থে সম্পন্ন করব—সন্দেহ নেই। তোর চিঠি পড়তে-পড়তে একটা জায়গায় থমকে গিয়াছিলাম আমার চিঠির প্রশংসা দেখে, কারণ তোর কাছে আমার চিঠির মূল্য হয়তো কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের কাছে প্রশংসনীয় জেনে নিজের সম্বন্ধে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল, বিশেষত আমার মতো জলীয়, লঘুপাক চিঠিগুলো যদি প্রশংসা পেতে থাকে, তবে চিঠির ভালত্ব বিচার করা কঠিন হয়ে পড়বে মনে হচ্ছে। আমার সমগ্র জীবনের লেখা তোদের ওখানে নিয়ে যাওয়া অসাধ্য-সাধন সাপেক্ষ। কারণ লেখা আমি সঞ্চয় করি না কখনও, যেহেতু লেখবার জন্য আমিই যখন যথেষ্ট, তখন আমার সঙ্গে একটা অহেতুক বোঝা থাকা রীতিমত অন্যায়। তবে প্রকৃতির প্রয়োজন বাঁচিয়ে যেগুলো এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত, সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।

তুই আমাকে গ্রহ-বিচ্ছিন্ন উল্কার সঙ্গে তুলনা করেছিস—কিন্তু গ্রহটা কু-গ্রহ, যেহেতু তার আগ্রহ আমায় নিক্ষেপ করা কোনো এক প্রশংসা-মুখর ক্ষেত্রে। যাই হোক, তোর এই চিঠিটা যেন নতুন জন্মের আভাস দিয়ে গেল। এখন শোন, যে "আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করছে দান" তার পরিচয় :—এই পরিচয়পত্রের প্রারম্ভেই তোর কাছে ক্ষমা চাইছি, তোর কাছে একদিন ছলনার প্রয়োজন হয়েছিল বলে। কিন্তু আর নয়, এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আর কপটতার আশ্রয় নিলুম না এই জন্যই যে, কথাটা গোপন হলেও ব্যথাটা আর গোপন থাকতে চায় না, তোর কাছে—উলঙ্গ, উন্মুক্ত হয়ে পড়তে চায়। এ-ব্যাপারটা আমার প্রাণের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, তোর কাছেও তা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের বেগে সংযমের কঠিনতা গলে তা পানীয়রূপে প্রস্তুত হল তোর কৌতূহলে। তুই এ-প্রেমে ফেনায়িত কাহিনী-সুরা কি পান করবি না?—এই সুরার মূল্য যে শুধু সহানুভূতি ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

…কে তুই চিনিস,—যদি 'না চিনি না' বলিস তবে তাকে চিনিয়ে দিচ্ছি, সে উপক্রমণিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সর্বোপরি সে আমার আবাল্যের সঙ্গিনী, সঙ্গিনী ঠিক নয়, বান্ধবী। যখন আমরা পরস্পরের সম্মুখে উলঙ্গ হতে দ্বিধা বোধ করতুম না, সেই সুদূর শৈশব হতে সে আমার সাথী। সব কিছু মনে পড়ে না, তবু এইটুকু মনে পড়ে যে, আমরা একত্র হলে আনন্দ পেতুম এবং সে আনন্দ ছিল নানারকমের কথা বলায়। একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, আমাদের উভয়ের দেখা হত, কোনো কারণে প্রায়ই। সে আমায় শ্রদ্ধা করত এবং আমার সান্নিধ্যে খুশি হত। একবার আমাদের উভয়কেই … যেতে হয়, সেখানেই আমরা আরো অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ি এবং আমি সেখানে থেকেই লাভ করি ওর সান্নিধ্যের আকর্ষণ। তখন আমার বয়স ১১,

তার ৯। তারপর আমাদের দেখা হতে লাগল দীর্ঘদিন পরে পরে।··

সেখানে আমি ঘনঘন যেতে লাগলুম। ···ওর আকর্ষণে অবিশ্যি নয়। বাস্তবিক আমাদের সম্পর্ক তখনও অন্য ধরনের ছিল, সম্পূর্ণ অকলঙ্ক, ভাই-বোনের মতোই।

তখন ওকে নিয়ে যেতাম পার্কে বেড়াতে, উপক্রমণিকার বাড়ি ওকে পৌঁছে দিতাম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। একত্রে আহার করতাম, পাশাপাশি শুয়ে বই পড়ে শোনাতাম ওকে, রাত্রেও পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতাম। ঘুমের মধ্যে ওর হাতখানি আমার গায়ে এসে পড়ত, কিন্তু শিউরে উঠতাম না, ওর নিঃশ্বাস অনুভব কবতাম বুকের কাছে। তখনো ভালবাসা কি জানতাম না আর ওকে যে ভালবাসা যায় অন্যভাবে, এতো কল্পনাতীত। কোনো আবেগ ছিল না, ছিল না অনুভূতির লেশমাত্র।

শেষে একদিন, যখন সবে এসে দাঁড়িয়েছি যৌবনের সিংহদ্বারে, এমনি একদিন, দিনটার তারিখ জানি না, পাশাপাশি শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ভোর হচ্ছে আর সেই ভোরের আলোয় দেখলাম পার্শ্ববর্তিনীর মুখ। সেই নবপ্রভাতের পাণ্ডুর আলোয় মুখখানি অনির্বচনীয়, অপূর্ব সুন্দর মনে হল। কেঁপে উঠল বুক, যৌবনের পদধ্বনিতে। হঠাৎ দেখি ও চাইল আমার দিকে চোখ মেলে, তারপর পাশ ফিরে শুল। আর আমি যেন চোরের মতো অপরাধী হয়ে পড়লাম ওর কাছে। লজ্জায় সেই থেকে আর কথা বলতে পারলাম না—আজ পর্যন্ত। · জিজ্ঞাসা করল, সুকান্ত কথা বলছে না কেন আমার সঙ্গে? ···বহুবার চেষ্টা করল আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে—কিন্তু আমারই বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল ওর ওপর, কেন জানি না। (আমার বয়স তখন ছিল ১৩।১৪)। এই বিতৃষ্ণা ছিল বহুদিন পর্যন্ত। আমিও কথা বলি নি।

তারপর গত দু বছর আস্তে আস্তে যা গড়ে উঠেছে, সে ওর প্রতি আমার প্রেম। নতুন করে ভালবাসতে সুরু করলাম ওকে। বহুদিন থেকেই উপক্রমণিকাকে নিয়ে ···রা আমাকে ঠাট্টা করত। আমার কাছে হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করল, উপক্রমণিকাকে তোর সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। আমি আপত্তি করলেও খুব বেশী আপত্তি করলাম না এই জন্যে যে, ভেবে দেখলাম, আমার এই নব যৌবনে ভাল একজনকে যখন বাসতেই হবে তখন ···র চেয়ে বৈধ উপক্রমণিকাকে হৃদয়দান, সুতরাং সম্মত হওয়াই উচিত। কেন জানি না, ···নিজে আমাদের মিলন সংঘটনের দায়িত্ব নিল। উপক্রমণিকাও একবার আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হয়েও রাজী হল না। আমিও দু'তিন বার ওর প্রেমে পড়ে শেষে মোহমুক্ত হলাম তুই চলে যাবার পর। অর্থাৎ সম্প্রতি কয়েক মাস। এখন ···কেই সম্পূর্ণ ভালবাসি। ···কে যে ভালবাসা যায় তা জানলাম, ···প্রতি আমার এক নির্দোষ চিঠি এক বৌদির কাছে সন্দেহিত হওয়ায়। চিঠিটার উচ্ছ্বাস ছিল সন্দেহ নেই, তাতে ছিল ওর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। কিন্তু তাতে সন্দেহ করা যায় দেখে বুঝলুম আমি ওকে ভালবাসতে পারি। যদিও আমার বোন ছিল না বলে ওর ভাইফোঁটা নিয়েছি দু'বার, আমাদের কথা বন্ধ হওয়ার পরও। আমি ওকে এখন ভালবাসি পরিপূর্ণ ও গভীরভাবে। ওর কথা আরও লিখব পরের চিঠিতে। আজ এই পর্যন্ত। এখন অন্যান্য খবর দিচ্ছি, শৈলেন[৮] ও মিণ্টু[৯] দুজনেই কলকাতা ছেড়েছে বহুদিন। আর বারীনদার[১০] B. A. Examination ১লা মার্চ। সুতরাং তিনি ব্যস্ত আছেন পড়াশুনায়। ইতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পুনশ্চ :—উপক্রমণিকার পরিবর্তে যে দেবীর শুভপ্রতিষ্ঠার কথা লিখেছিস, তিনি দেবী হতে পারেন, কিন্তু সৌভাগ্যবতী

আখ্যা দিয়েছিস তাঁকে কি জন্যে? আমি যে তাঁর উপযুক্ত নই।

সু. ভ.

এই চিঠির উত্তর সত্বর দিবি, আমিও তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেব। আজ তোদের ওখানে নববর্ষ—সুতরাং তার প্রীতি গ্রহণ কর।

পাঁচ

বেলেঘাটা

১৭।৪।৪২

আশানুরূপেষু,

অরুণ, আজ আবার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হল তোকে। আজকের চিঠিতে আমার কথাই অবিশ্যি প্রধান অংশ গ্রহণ করবে। এ জন্য ক্ষুব্ধ হবি না তো? কারণ আজকে আমি তোকে জানাব আমার সমস্যার কথা, আমার বিপ্লবী অন্তর্জগতের কথা। এই চিঠির আরম্ভ এবং শেষ ···র কথাতেই পরিপূর্ণ থাকবে। একবার যখন আদি-অন্ত জানতে কৌতূহল প্রকাশ করেছিস, তখন তোর এ-চিঠি ধৈর্য ধরে পড়তেই হবে এবং আমার জন্যে মতামত আর উপদেশ পাঠাতে হবে।

আজকে এইমাত্র ···র কথা ভাবছিলুম, ভাবতে-ভাবতে ভাবলুম তোকেই ডাকা যাক পরামর্শ এবং সমস্যা-সমাধানের জন্যে। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করব, আমার এই প্রেমের ওপর আস্থা ও সহানুভূতি তোর মনের কোণে বাসা বেঁধেছে কি? যদি না-বেঁধে থাকে, তবে এই চিঠি পড়া এখানেই বন্ধ করতে পারিস। যদিও তুই

একবার আমাকে কৌতূহল জানিয়ে আমার মনের চোরা কুঠরীর দ্বার ইতিমধ্যেই ভেঙে দিয়েছিস, তবুও তোকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার এই সমস্যার ওপর তোর কিছুমাত্র দরদ জেগেছে কি না। যদি জেগে থাকে তবে শোন:

আমার প্রধান সমস্যা, আমি আজও জানি না ও আমায় ভালবাসে কি না। কতদিন আমি ভেবেছি, ওর কাছে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব, এই কথার উত্তর চাইব; কিন্তু সাহস হয় নি। একদিন এগিয়েও ছিলাম, কিন্তু ওর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কথা বলবার শক্তি হারিয়ে গেছল, অসাড়তা লাভ করেছিল চেতনা।

ভাল ও আমায় বাসে কি না জানি না, তবে সমীহ করে, এটা ভালরকম জানি।

আমার সন্দেহ হয়, হয়তো ও আমায় ভালবাসে এবং আমি যে ওকে ভালবাসি এটা ও জানে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে অনুভব করি ওর প্রেমহীনতা।

বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা বড় অভিনব। হয়তো আমি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দেখি সেই সিঁড়ি দিয়েই ও নামছে, অবতরণকালীন ওর ক্ষণিক দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে আমার বুকে স্নিগ্ধমধুর শিহরণ জাগিয়ে যায়। একটু আনন্দ, কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় মুষড়ে পড়ি। একটি ঘরে অনেক লোক, তার মধ্যে আমি যখন কথা বলি, তখন যদি দেখি ও আমার মুখের দিকে চেয়ে আমারই কথা শুনছে, তাহলে আমার কথা বলার চাতুর্য বাড়ে আরও বেশি, আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি, এমনি ওর প্রতি আমার প্রেম। কিন্তু বড় ব্যথা।

বছর খানেক আগে আমার ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ঘটেছিল এবং আমিও সে সুযোগ অপব্যয়িত করি নি। অবিশ্যি ইতিপূর্বেই ·· র চেষ্টায় অস্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা আমাদের করতে হয়েছিল। ঘটনাটা তোকে একবার বলেছি, তবু বলছি আর একবার: একটা

সভা-মতো করা হল, তাতে উপস্থিত থাকল …। সেই সভায় আমাদের কথা বলতে হল। প্রথমে সে তো লজ্জায় কথা বলতেই চায় না, শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল, সিগারেট খাওয়ার অপকারিতা কী? আমি এতক্ষণ উদাস হয়ে (অর্থাৎ ভান করে) ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলুম, এইবার অতিকষ্টে জবাব দিতে থাকলুম। কিন্তু সেদিন আর আলাপ এগোয় নি।

এদিকে আমি উপলব্ধি করলুম ওর সঙ্গে কথা বলার অমৃতময়তা। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার কথা বলার তৃষ্ণা অসীম হয়ে দেখা দিল এবং সে তৃষ্ণা আজও দূরীভূত হয় নি।

এর মাস খানেক পরে এল আর এক সুযোগ। আমাদের বেলেঘাটায় এল ও, কোনো কারণে। সারাদিন ও রইল কিন্তু কোনো কথা বললাম না ওর সঙ্গে। কিন্তু সন্ধ্যার পর এমন এক সময় এল যখন আমরা দুজনেই একটি ঘরে একা পড়ে গেলাম। দুজনেই শুনছিলাম রেডিও। রেডিওতে গান হচ্ছিল, "প্রিয় আজো নয়, আজো নয়।" কিন্তু গানটাকে আমি লক্ষ্য করি নি এবং লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না। কারণ কাছে, অতি কাছে ও বসেছিল, বোধহয় অন্যদিকে চেয়ে নিবিষ্ট মনে গানই শুনছিল, আর আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম ওকে, অত্যন্ত সুন্দর পোশাক-সজ্জিতা ওকে আমার বড় ভাল লাগল। ভেবে দেখলাম এক ঘরে থেকেও দুজনে কথা না বলা লোকচক্ষে নিতান্ত অশোভন। তাই অনেকক্ষণ ধরে মনে বল সঞ্চয় করে ডাকলুম—"…"! কিন্তু গলা দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ কম্পিত স্বর বেরুল, ও তা শুনতে পেল না। এবার বেশ জোর দিয়েই ডাকলুম, ও তা শুনতে পেল। চমকে উঠে আমার দিকে চাইল। এবং আমিও এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত মুখস্থ করা কথাটা কোনো রকমে বলে ফেললাম, 'ইচ্ছে হলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পার।"

ও মাথা নিচু করলে, কিছুই বললে না। মনে হল ও যেন রীতিমত ঘামছে। সেদিন আমার জীবনের শুভদিন ছিল, প্রাণভরে সেদিন ওর কথা পান করেছিলাম। তারও মাস খানেক পরে এসেছিল শেষ শুভদিন—সেদিন আমাদের কলকাতার প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। মোটরে করে আমরা উপক্রমণিকার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর ইচ্ছা ছিল, আমার সঙ্গে ও সেদিন উপক্রমণিকার আলাপ করিয়ে দেবে। সৌভাগ্যবশত মোটরটা আমাদের সেখানে নামিয়েই ফিরে যায়। আর আমরাও ফিরতি পথে দুজনের সঙ্গ অনুভব করলুম। সেদিন নেশা লেগে গিয়েছিল ওর সঙ্গে চলতে, কথা বলতে। মনে করে দেখ, কলকাতার রাজপথে একজন সুন্দরী-সুবেশা মেয়ের পাশে-পাশে চলা কি কম সৌভাগ্যের কথা! ওর পাশে চলে, ওর এত কাছে থেকে, যে আনন্দ সেদিন আমি পেয়েছি, তা আমার বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকল। ও এখন বিমান আক্রমণের ভয়ে চলে গেছে সুদূর ···তে। আর আমি তাই বিরহ-বিধুর হয়ে তোকে চিঠি লিখছি আর ভাবছি রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন,—

"কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া
দূরে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া।"

আমার দ্বিতীয় সমস্যা আরও ভয়ঙ্কর। যদি আমার আত্মীয়রা জানতে পারে এ কথা, তবে আমার লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। বিশেষত, আমার বিশ্বাসঘাতকতায় ··· নিশ্চয়ই আমার সংস্পর্শ ত্যাগ করবে। অতএব এখন আমার কি করা কর্তব্য চিঠি পাওয়া মাত্র জানাস।

ইতি—

সুকান্ত ভট্টাচার্য।

পুনশ্চ—মা-কে বলিস এবার আর তাঁকে লিখলাম না বটে, কিন্তু শীগ্‌গিরই একখানা বৃহৎ লিপি তাঁর সমুখে উপনীত হবে। আর তিনি নিশ্চয়ই তার বপু দেখে চমকে যাবেন।

ছয়

সৎসঙ্গশরণম্

শ্রীশ্রীশ্রী১০৮ অর্ণব-স্বামী[১১] গুরুজীমহারাজ সমীপেষু,

শতশত সেলামপূর্বক নিবেদন,

পরমারাধ্য বাবাজী, আপনার আকস্মিক অধঃপতনে আমি বড়ই মর্মাহত হইলাম। ইতোমধ্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, তখন মানসপটে এই চিন্তাই সমুপস্থিত হইয়াছিল যে ইহা সাময়িক মত্ততা মাত্র; কিন্তু অধুনা উপলব্ধি করিতেছি আমার ভ্রম হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ইহাই অনুমিত হইতেছে যে কাহারও সুমন্ত্রণায় আপনি এই পথবর্তী হইয়াছেন। অতএব আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃদ্ধ পিতা এবং অসুস্থা মাতার প্রতি ঐহিক কর্তব্যসকল পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া কোন নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পারলৌকিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহমার্গ সাধনা করিতেছেন? এক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই যে, অচিরে এই সৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক আপনার এই অস্বাভাবিকতা বর্জন করিয়া স্বীয় কর্তব্য-করণে প্রবৃত্ত হউন। আপনার পিতাঠাকুরের নির্দেশমত আপনার কলিকাতায় আসিয়া থাকাই আমার অভিপ্রায়। এ স্থানেও সৎসঙ্গের

অনটন হইবে না, উপরন্তু আমার মতো অসতের সহিত দুই-চারিটা কথোপকথনের সুবিধাও মিলিবে, অবশ্য ইহা আমারই সৌভাগ্যজনক হইবে। যদিচ এ আশা নিতান্তই অকল্পেয়, তথাপি চিন্তা করিতে দোষ কি? আমার দুইখানি পত্রে যে সকল আবেগময় গোপন কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরের আশা বিসর্জন দিয়াছি; কিন্তু এ পত্রের বিস্তৃত উত্তর না পাইলে ইহাই আমার শেষ চিঠি জানিবেন।

ইতি—

দাসানুদাস,

সেবক—শ্রীসুকান্ত।

সাত

অরুণ,

প্রথমে বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে রাখছি। এরপর একে একে প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথমে কথা হচ্ছে জীবু 'কবিতা' শেষ পর্যন্ত দিল না—চেয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও। তবে আগের ক'খানা রেখে দিয়েছি, সামনের সপ্তাহ থেকে সেগুলি ক্রমান্বয়ে পাঠাবার সঙ্কল্প রইল। আর পেনুর ওখানে গেলাম না নিজের নিতান্ত অনিচ্ছায়, বইখানা ওর অজ্ঞাতসারে ওকে দান করলুম, তুই বরঞ্চ ওকে আর একখানা চিঠি ডাক মারফৎ পাঠাস। সুভাষের কাছে যাই-যাই করে যাওয়া হয় নি, তবে যাবার ইচ্ছা আছে। এখানে সপ্তমীর দিন সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর রাত্রে ভয়াবহ ঝড় সমস্ত কলকাতায় অল্পবিস্তর ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছিল*। কাল শ্যামবাজারে গিয়ে প্রভূত আনন্দ পেলুম ওদের উচ্ছল সাহচর্যে—শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর সঙ্গে

কোলাকুলি কালকের দিনের স্মরণীয় ঘটনা। আজ দুপুরে আমাদের উপন্যাসখানা[১২] শ্যামবাজারে নিয়ে গিয়েছিলুম—তোর অংশটুকুর ওরা খুব প্রশংসা করল, আমি এখনো হাত দিই নি, এর পরের পরিচ্ছেদ লিখছে ঘেলু। তোর ঘরটায় আজকাল আমাদের অফিস বসছে। আচ্ছা তোর সেই মেয়েটিকে মনে আছে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা? সহসা শ্যামবাজারে তাঁর সঙ্গে দেখা, আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের একটি বই ছিল, সেটি দিয়ে লাভ করলুম মোমবাতির আলোর মতো তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহার। তোর শরীর ভাল আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলুম, ফিরছিস কবে? ভাইবোনেরা ভাল আছে? বাবা-মাকে আমার বিজয়ার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাস—তাঁরা বোধ করি ভাল আছেন? আমার বই বেরোবে, তবে নতেদা-রা[১৩] দার্জিলিং থেকে ফিরে না-এলে নয়।

—সুকান্ত। রাত ১০-১৫

২০শে অক্টোবর ১৯৪২

আট

৮।১১।৪২

অরুণ,

তোর খবর শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমার পুরো একখানা চিঠি পরে পাঠাচ্ছি। যথাসত্বর তোদের সার্বজনীন কুশল প্রার্থনা করি।[১৪]

—সু

নয়

২০, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড

২৮শে ডিসেম্বর : ১৯৪২

—বেলেঘাটা—

সোমবার, বেলা ২টো।

অরুণ !

দৈবাক্রমে এখনও বেঁচে আছি, তাই এতদিনকার নৈঃশব্দ্য ঘুচিয়ে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি—অপ্রত্যাশিত বোমার মতোই তোর অভিমানের 'সুরক্ষিত' দুর্গ চূর্ণ করতে। বেঁচে থাকাটা সাধারণ দৃষ্টিতে অনৈসর্গিক নয়, তবুও তা দৈবক্রমে কেন, সে রহস্য ভেদ করে কৃতিত্ব দেখাব তার উপায় নেই, যেহেতু সংবাদপত্র বহু পূর্বেই সে কাজটি সেরে রেখেছে। যাক, এ সম্বন্ধে নতুন করে আর বিলাপ করব না, যেহেতু গত বছরে এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতা যথেষ্টই ছিল, ইচ্ছা হলে পুরনো চিঠির তাড়া খুঁজে দেখতে পারিস। এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময়ে বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিল না। তাই বর্ণনার বিলাস আর ভাষার আড়ম্বর প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, এখন তো বর্তমান বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এটা একরকম ভরসারই কথা। গুজবের আধিপত্যও আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। তোরা এখানকার সঠিক সংবাদ পেয়েছিস কিনা জানি না। তাই আক্রমণের একটা ছোটখাটো আভাস দিচ্ছি। প্রথম দিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিন হাতীবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে—(এই দিনকার আক্রমণ সবচেয়ে ক্ষতি করে), চতুর্থ দিন ড্যালহৌসি অঞ্চলে —(এইদিন তিন ঘণ্টা আক্রমণ চলে আর নাগরিকদের সবচেয়ে ভীতি উৎপাদন করে, পরদিন কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়) আর পঞ্চম

দিনে অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়। কালকের আক্রান্ত স্থান আমার এখনও অজ্ঞাত। ১ম, ৩য় আর ৫ম দিন বাড়িতে কেটেছে, কৌতূহলী আনন্দের মধ্যে দিয়ে। ২য় দিন বালীগঞ্জে মামার বাড়িতে মামার[১৫] সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কেটেছে, ৪র্থ দিন সদ্য স্থানান্তরিত দাদা-বৌদির[১৬] সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে কেটেছে সবচেয়ে ভয়ানক ভাবে। সেদিনকার ছোট্ট বর্ণনা দিই, কেমন? সেদিন সকাল থেকেই মেজাজটা বেশ অতিমাত্রায় খুশি ছিল, একটা সাধু সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, 'সেই চিঠি গোপনকারিণী' বৌদির কাছে, কারণ কয়েক দিন আগে দাদার নতুন বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে নিজের পৌরুষের ওপর ধিক্কার এসেছিল, তাই ঠিক করলাম, নাঃ, আজ বৌদির সঙ্গে আলাপ করে ফিরবই, যে বৌদির সঙ্গে আগে এত প্রীতি ছিল, যার সঙ্গে কতদিন লুকোচুরি খেলেছি, সাঁতার কেটেছি, রাতদিন এবং বহু রাতদিন বকবক করেছি, সেই বৌদির সঙ্গে কি আর সামান্য দরজা খোলার ব্যাপার নিয়ে রাগ করে থেকে লাভ আছে? অবিশ্যি এতখানি উদারতার মূলে ছিল সেদিনকার কর্মহীনতা, যেহেতু Examination হয়ে গেছে, রাজনৈতিক কাজও সেদিন খুব অল্পই ছিল, সুতরাং মহানুভব (!) সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর বৌদির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। প্রথমে, দাদা না-থাকায় বৌদিই প্রথম্ কথা কয়ে লজ্জা ভেঙে দিয়ে অনেক সুবিধা করে দিলেন, তারপর ক্রমশ অল্পে-অল্পে বহু কথা কয়ে, অন্তরঙ্গ হয়ে, বৌদির স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনে পরিতোষ লাভ করে, তারপর কিছু রাজনৈতিক কাজ ছিল, সেগুলো সেরে সন্ধ্যায় বৌদির ওখানে পুনর্গমন করলুম এবং সদ্য আলাপের খাতিরে বৌদির পরিবেশিত চা পান করে আবার বকবক করতে লাগলুম। ৮॥টার সময় বাড়ি যাব ভেবে উঠলাম এবং সেদিন সেখানে থাকব না শুনে বৌদি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু দাদা এসে পড়ায় সেদিন আর বাড়ি ফেরা হল না।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর, ৯-১০ এমনি সময় সেদিনকার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটল, বৌদি সহসা বলে উঠলেন, বোধহয় সাইরেন বাজছে; রেডিও চলছিল, বন্ধ করতেই সাইরেনের মর্মভেদী আর্তনাদ কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দাদা তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নীচে নিয়ে গেলেন এবং উৎকণ্ঠায় ছুটোছুটি, হৈ-চৈ করে বাড়ি মাৎ করে দিলেন। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু স্তব্ধ। আর সুরু হয়ে গেল দাদার 'হায়', 'হায়', বৌদির থেকে থেকে সভয় আর্তনাদ, আর আমার অবিরাম কাঁপুনি। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহ্বল মুহ্যমানতায়, নৈরাশ্যে বিঁধে-বিঁধে যেতে থাকল, আর অবিশ্রান্ত এরোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জন, মেসিনগানের গুলি আর সামনে পিছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত কলকাতা একযোগে কান পেতে ছিল সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্পর্কে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। দ্রুতবেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পড়ে আর দেহে মনে চমকে উঠি, এমনি করে প্রাণপণে প্রাণকে সামলে তিনঘণ্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না। অথচ বিমান আক্রমণ তেমন কিছু হয় নি, যার জন্য এতটা ভয় পাওয়া উচিত। কালকের আক্রমণে অবশ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিলাম।

বোমার ব্যাপার বর্ণনা করতে দু'পাতা লাগল। কাগজের এত দাম সত্ত্বেও আরও দু'পাতা লিখছি। তোর শেষ চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের[১৭] সঙ্গে 'আলাপ করা' ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলি, কিন্তু তার আগেই বোধহয় একদিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে P. C. Joshi-র এক বক্তৃতা-সভায় সুভাষ নিজেই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং আমার "কোনো বন্ধুর প্রতি" কবিতাটির প্রশংসা করে দুঃখের সঙ্গে জানায় কবিতাটি তার পকেট থেকে হারিয়ে গেছে নচেৎ তা ছাপা হত। তারপর অনেকদিন পরে

সুভাষের কথামতো একটা সংকলন গ্রন্থের জন্য রচিত কবিতা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা সেখানে থেকে সুভাষের অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম, স্বর্ণকমলের[১৮] সঙ্গেও বেশ গল্প জুড়ে ছিলাম। সেদিন সুভাষ আমার এত প্রশংসা করেছিল যা সহসা চাটুকারিতা বলে ভ্রম হতে পারত, সুভাষও আমাকে বই ছাপাতে বললে। তোর কবিতাটির ব্যবস্থা তোর চিঠির ইচ্ছামতোই হয়েছে। সংকলন গ্রন্থটি 'এক সূত্রে' নাম নিয়ে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, প্রেমেন্দ্র, অজিত দত্ত, সমর সেন, অচিন্ত্য, অন্নদাশঙ্কর, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ বাংলার ৫৫ জন কবির কবিতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে আমার একটি কবিতাও সসংকোচে স্থান পেয়েছে। ভাল কথা, জীবুর একখানা 'কবিতা' তোর কাছে ছিল, কিন্তু তোর বাবার কাছ থেকে সেখানা এখনও পাই নি, তাই অপর ক'খানাও দেওয়া হয় নি;—অত্যন্ত লজ্জার কথা! এবার 'আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা' মেয়েটির কথা বলছি। তোকে চিঠিতে জানান ঘটনার পর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাকে দেখেই বিস্ময়ে উচ্ছ্বাসে মর্মরিত হয়ে উঠলেন। আমিও আবেগের বন্যায় একটা নমস্কার ঠুকে দিলাম, তিনিও প্রতিনমস্কার করে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' সঙ্গে এনেছিলাম তাঁকে দেবার জন্যে, সেখানা দিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম এবং অনেকক্ষণ গল্প করার পর বিদায় নিয়েছিলাম। সেদিন তাঁর প্রতি কথায় বুদ্ধিমত্তা, সৌহার্দ্য এবং সারল্যের গভীর স্পর্শ পেয়েছিলাম এবং বিদায় নেবার পর পথ চলতে-চলতে বারবার মনে হয়েছিল, সেদিন যে কথোপকথন আমাদের মধ্যে হয়েছিল তার মতো মূল্যবান কথোপকথনের সুযোগ আমার জীবনে আর আসে নি। মেয়েটি স্নিগ্ধতার একটি অপরূপ বিকাশ, তাঁর মধ্যে শহুরে চটুলতা, কুটিলতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র

আবিলতার কোনো আভাস পেলাম না। অথচ তাঁর মধ্যে সুরুচি ও সংস্কৃতির অভাব নেই, সর্বোপরি পরিপূর্ণতার এক গভীর নীরবতা গ্রাম্য আবেষ্টনীর মতো সর্বদা বিরাজমান। তবুও সেদিন সুস্থ হয়ে কথা বলতে পারি নি। যেহেতু আমি পুরুষ, তিনি নারী।

এইবার আমার প্রেম-কাহিনীর শেষ অধ্যায় বিবৃত করছি। কিছুদিন আগে, কতদিন আগে তা মনে নেই—বোধহয় দু'মাস হবে, একদিন ··· কে ··· দের বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়েছিল। পথে নেমে বহুক্ষণ চলতে থাকলুম গুনগুন করতে করতে, যতদূর মনে পড়ে "চাঁদ উঠেছিল গগনে"। প্রায় অর্ধেক রাস্তা সকৌতুকে আমাদের অবস্থা অনুভব করার পর ভাবলুম, আর নয়, ব্যাপারটাকে এইখানেই শেষ করে দেওয়া যাক। একটা দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: একটা কথা বলব? প্রথমবার শুনতে পেল না। দ্বিতীয় বার বলতেই, মৃদু হেসে, ঔদ্ধত্যভরে, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বললাম: কিছুদিন আগে আমার একখানা চিঠি পেয়েছিলে? ভ্রূকুটি হেনে ও বললে: কলকাতায়? আমি বললুম: না, বেনারসে। ও মাথা নেড়ে প্রাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করল। আবার একটু দম নিয়ে বললাম: অত্যন্ত অসতর্ক অবস্থায়, আবেগের মাথায় পাগলামি করে ফেলেছিলাম। সেজন্য আমি এখন অনুতপ্ত এবং এইজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। ও তখন অত্যন্ত ধীরভাবে বিজ্ঞের মতো বললে—না-না, এজন্যে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই, ঐ রকম মাঝে-মাঝে হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলবার পর জিজ্ঞাসা করলুম: আচ্ছা আমার চিঠিখানার জবাব দেওয়া কি খুব অসম্ভব ছিল? ও অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললে: উত্তর তো আমি দিয়েছিলাম। আমি তখন অত্যন্ত ধীরে-ধীরে বললাম, চিঠিখানা তাহলে আমার বৌদির হস্তগত হয়েছে। ও বিষণ্ণ হেসে বললে: তাহলে তো বেশ মজাই হয়েছে। কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে কাটল। তারপর ও হঠাৎ বললে: আচ্ছা এ রকম

দুর্বলতা আসে কেন? অত্যন্ত বিরক্তিকর প্রশ্ন। বললাম: ওটা কাব্যরোগের লক্ষণ। মানুষের যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন কোনো একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচতে সে উৎসুক হয়, তাই এই রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। তোমার চিঠি না পেয়ে আমার উপকারই হয়েছিল, আমি অন্য কাজ পেয়েছিলাম। ধর, তোমার চিঠিতে যদি সন্তোষজনক কিছু থাকত, তাহলে হয়তো আমার কাব্যের ধারা তোমাকে আশ্রয় করত। ও তাড়াতাড়ি শুধরে নিল, চিঠিটা কিন্তু সন্তোষজনক ছিল না। আমি বললুম: আমার কাব্যের ধারাও সঠিক পথে চলেছে। এরপর ... বাড়ি এসে পড়েছিল।

এখন তোর খবর কি? শরীর কেমন? গ্রাম্য জীবন কি ধাতস্থ হয়েছে? তোর বাবা যে কবে এখান থেকে গেলেন, আমি জানতেও পারি নি। তোর ভাই-বোন-বাবা-মা'র কুশল সংবাদ সমেত একখানা চিঠি, যদি খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তো পাঠাস; নতুবা দেরি করে পাঠাস নি। কারণ বোমারু বিমান সর্বদাই পৃথিবীর নশ্বরতা ঘোষণা করছে। তোর উপন্যাসখানার বাকী কত?

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

দশ

20, Narkeldanga Main Road
Calcutta
15. 2. 43

প্রীতিভাজনেষু,

আমি কিছুদিন আগে একটা বিপুলবপু চিঠিতে অজস্র বাজে কথা লিখে পাঠিয়েছিলাম—নেহাৎ চিঠি লেখার জন্যেই। সেখানা হস্তগত

হয়েছে শুনে নির্ভয় হলাম। ও চিঠির উত্তর না-পাওয়া আমায় বিচলিত করে নি, যেহেতু ঐ চিঠিটার উত্তর দেবার মতো মূল্য ছিল না। আমার খবর আমি এক কথায় জানাচ্ছি—পরিবর্তনহীনভাবে রাজনীতি নিয়ে কালক্ষয় করছি। তোরা একটা 'পত্রিকা'[১৯] বার করছিস। ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, হাতের-লেখা পত্রিকা বার করবার মতো মনের অপরিপক্কতা তোর আজো আছে? কথাটা নীরস হলেও একথা বলবই যে, এই ধরনের 'খই ভাজায়' এই দুর্দিনে কাগজ ও সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। নিজের সম্বন্ধে তোর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে, নিজেকে নানাভাবে সংশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং সেইজন্যে পত্রপাঠ কলকাতায় এসে বাবার সাহায্য নেওয়া। কথাটা গুরুমশাইয়ের উপদেশ অথবা বাবার নিবেদনের মতো তিক্ত ও অনাবশ্যক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি। কথাটার তাৎপর্য আমি মর্মে-মর্মে অনুভব করছি এবং যথাসাধ্য সে সম্বন্ধে চেষ্টা ও আয়োজন করছি। অতএব আমার কথাটা ভাল করে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি, মা এবং ভাই-বোন সহ তুই ভাল আছিস; তোর প্রীতিপ্রাপ্তরা ভাল আছে, চিঠির উত্তর চাই না।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

এগারো

20, Narkeldanga Main Road
3. 3. 43

প্রিয়বরেষু,

অরুণ! তোর কাছ থেকে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ চিঠি ইতিপূর্বে আর কখনও পাই নি। তার কারণ বিবৃত করছি। প্রথমত চিঠিটা নৈহাটি, দৌলৎপুর, ডোঙ্গাঘাটা, পাঁজিয়া—এই চার জায়গায় fountain pen, pencil এবং কলমে লেখা বলে এত বিচিত্র! দ্বিতীয়ত সমস্ত চিঠিটায় একজন কেজো লোকের ব্যস্ততার সাড়া পাওয়া গেল। তৃতীয় কারণ, চিঠিটার অপ্রত্যাশিততা।

চিঠির উত্তর দিতে তোকে নিষেধ করেছিলাম, তবুও তোর চিঠি পেয়ে আশান্বিত হয়ে পড়ে দেখলাম চিঠিটা নেহাৎ নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ Official। যদিও সংশিক্ষা সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ আছে, তবুও সেটা গৌণ—মুখ্য হচ্ছে 'ত্রিদিব'। এজন্যে আমি দুঃখিত হই নি বরং কৌতুক অনুভব করেছি। অবিশ্যি খামখানাই এজন্যে দায়ী।

'ত্রিদিবে'র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা গভীর হল যশোহরের সংকীর্ণতা থেকে সারা বাংলাদেশেই এর পরিব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণ দেখে। পত্রিকাটি নতুন লেখক ও শিল্পীদের প্রাণরসে পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়ে একদিন সারা বাংলার ক্ষুধা মেটানোর জন্যে পরিবেশিত হবে, সূচনা দেখে এ-অনুমান করা খুব সম্ভবত আমার অদূরদর্শিতায় পর্যবসিত হবে না।

তুই যে আমার আন্তরিকতায় দিন-দিন সন্দিহান হচ্ছিস, ক্রমশ তার পরিচয় পাচ্ছি। কারণ ও প্রমাণ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে দেখাব। তুই কবে আসছিস—এইটা জানবার জন্যে উৎসুক আছি। আর এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী। তুই বোধহয় কোনো কার্যব্যপদেশে এখানে আসছিস, তার কারণ তুই অধুনা কাজের লোক

হয়ে পড়েছিস, কিন্তু আমি চাই বেশ কিছু সময় হাতে নিয়ে তুই আসবি।

তোর সন্ধলব্ধ দিদি আর কাকীমার সম্বন্ধে রীতিমত কৌতূহল দেখা দিয়েছে। আর, কিছু পরিচয় পেলাম তোর সূক্ষ্ম বর্ণনায়, তারা যে সাহিত্য-রসিক তার নমুনা পাওয়া গেল পাঠস্পৃহা থেকে।

তোদের (থুড়ি) আমাদের 'ত্রিদিব' সম্বন্ধে একটা বড় সত্য অনুমান করছি যে, আমরা এই পাপ-দুঃখ-কষ্ট আকীর্ণ ধরণীর নগণ্য লোক কর্মদোষে 'ত্রিদিবে'র দর্শন পাচ্ছি না। আশা করি তোর সঙ্গলাভের পুণ্যে হয়তো পাপস্খলন হবে এবং তখন এক সংখ্যার দর্শনলাভও হবে।

তুই লিখেছিস, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' (স্বভাব নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে একটা সত্যি কথা বলেছিস দেখে তৃপ্ত হলুম), সত্যিই তোর স্বভাবের এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে দুটো বাজে লেখা তুলে দিয়ে স্বচ্ছন্দে নিজের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করে নিশ্চিন্ত হলি? ভাল!

আব একটা গুরুতর কথা। তুই নিজে না 'সম্পাদক' হয়ে কোন এক সুনীল বসুকে 'সম্পাদক' করেছিস কেন? তোর চেয়ে যোগ্য লোক ডোঙাঘাটা তথা সারা যশোরে আছে নাকি? এটা একটা আশাভঙ্গের কথা।

কবিতা পাঠাচ্ছি। 'আহ্নিক' বলে যে কবিতাটা লিখেছিলাম সেটা দিতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু সেটা এখন পাচ্ছি না, পেলে পরে পাঠাব। এখন অন্য একটা লেখা (দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক[২০]) পাঠালুম। বইয়ের লিস্ট[২১] পাঠালুম—তবে সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত পরে পাঠাব। চিঠির উত্তরের পরিবর্তে তোকে পেতে চাই। তোদের সকলের কুশল কামনা করি।

চিঠিখানা চেষ্টা করে বড় করলুম না, আর তোর যে-যে অনুরোধ, তার সব পালন করা হয়েছে। ইতি—

—সুকান্ত

আরো একটু—চিঠিখানা ৩রা মার্চ লেখা হলেও, পোস্ট অফিসে পয়সা নিয়ে গিয়েও নানা কারণে বিতাড়িত হয়েছিলাম দিন কয়েক। তা ছাড়া শুনলাম, তুই নাকি আবার সফরে বেরিয়েছিস। তাই মনে হচ্ছে, পত্রপাঠ চিঠিটা পাঠাতে না-পারলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। আর কবিতা যেটা পাঠালুম সেটা প্রধানত অতিরিক্ত সহজবোধ্য বলেই আমার মতে (বোধহয় তোর মতেও) অত্যন্ত খারাপ, সেজন্যে দুঃখ করিস নি। সবুরে মেওয়া ফলবে। তুই আজকাল ছবিটবি আঁকছিস আশা করি, কবিতা বোধহয় খুব ভাল লিখছিস।

সু
কা
ন্ত।

বারো

অরুণ!

নানা রকম সঙ্কটের জন্য তোর চিঠিটার জবাব দিই নি, পরে একটা বড় চিঠি পাঠাব। তুই এখানে আসবি বলেছিলি, কিন্তু তার কোনো উদ্যোগ দেখছি না। অবিলম্বে তোর এখানে এসে স্থায়ীভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করা দরকার। তুই তোর পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বাবার অবর্ণনীয় এবং অবিরাম পরিশ্রমের কথা ভুলে, তাঁর চিঠির উত্তর না দিয়ে, স্বচ্ছন্দে 'ত্রিদিব' নিয়ে কাল কাটাচ্ছিস? তাঁর প্রতি এতবড় অকৃতজ্ঞতা অসহনীয়।[২২]

সুকান্ত

তেরো

চিঠিটার উত্তর দিতে বেশ একটু দেরি হল, বোধহয় কুড়ি-বাইশ দিন, কিন্তু সেজন্যে আমি এতটুকু দুঃখিত নই—যেহেতু আর্থিক প্রতিকূলতা (শুধু অর্থনৈতিক অরাজকতার জন্যে নয়, পারিবারিক আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন) ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে আমাকে, এমন কি আমার ভবিষ্যৎকে পর্যন্ত। অবিশ্যি আর কিছু পরিবর্তন পরিবারের আর কোথাও হয় নি, কেবল আমার পৃথিবীতেই দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। বেশ স্কুলে যাচ্ছিলাম, রাজনীতির চর্চা করছিলাম, এমন সময় এল কালবৈশাখীর মতো বিনা নোটিশে এক ঝড়, যা আমার চোখে ধুলো ছিটিয়ে দিল, আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম, আর সে বিভ্রান্তির ঘোর এখনো কাটে নি। যাক, চিঠির প্রথমেই করুণ রসের অবতারণা করা অরসিকের পরিচয়। আমার অবস্থা অনেকটা কবি বলে যে গল্পটা লিখেছিলাম সেই গল্পটার নায়কের মতো হয়েছে, আশা করি এ দুর্দিন দূরীভূত হবে।

সম্পাদনার জন্যে তোর চেয়ে যোগ্য লোক আছে কিনা, তোদের বর্তমান যশোরে, (অর্থাৎ যেখানে অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত[২৩] উপস্থিত নেই) এ প্রশ্ন তুলে তোকে আঘাত দিয়েছি জেনে আমিও প্রত্যাঘাত পেলাম। তোর ভুল বোঝবার এই অপচেষ্টা দেখে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত হল। আমার উচিত ছিল মনোজ বসু কোন ছার, মাইকেলকে স্মরণ করা। তাঁরা 'ত্রিদিব' সম্পাদনা করতে পারুন, আর নাই পারুন, জন্ম তো নিয়েছেন যশোহরে।

ভাল কথা, এর আগে যে চিঠিটা তোর বাবার চিঠির সঙ্গে গেছে সেটা অনেকটা ফজলুল হকের মতোই বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে লেখা, সুতরাং তার রসহীনতায় ক্ষুব্ধ হ'স নি। তবে চিঠির কথাগুলো অত্যন্ত সার কথা, একবার ভাল করে ভেবে দেখিস।

আর গল্প বা প্রবন্ধ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে যে, ওগুলো অন্তত এখন

অর্থাৎ সাময়িকভাবে, পাঠান সম্ভবপর নয়, কারণ আমার পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তবে কবিতা পাঠাতে পারি, যা চাস।

মামাকে[২৪] গল্প লিখতে বলেছি, সে লিখে চলেছে ; শেষ হলেই পাঠিয়ে দেবে। আর মহিলা লেখিকা সংগ্রহ করেছি একজন, তিনি অসুস্থ, সুস্থ হলেই লেখা দেবেন। মহিলা লেখিকা সংগ্রহ করতে গিয়ে এক মজার কাণ্ড করেছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে, ভূপেনের এক বৌদি আছেন, অত্যন্ত ভালমানুষ। তাকে একদিন এমন চেপে ধরেছিলাম সাঁড়াশির মতো লেখা আদায়ের জন্য, যে তিনি কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছিলেন। কারণ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নাছোড়-বান্দার মতো ব্যাকুল হয়ে লেখা চাইছিলাম, পরিশেষে পায়ে ধরার যখন আয়োজন করলাম তখন দেখি তার অবস্থা শোচনীয়, কাজেই আখমাড়াই কলের মতো অলেখিকার কাছ থেকে লেখা আদায়ের দুশ্চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।

তোর ত্রিদিবের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে জেনে সুখী হলাম, কিন্তু তার তুলনায় তোর যদি ঐ সঙ্গে ঐ রকম উন্নতি হত তবে আহ্লাদে আটখানা হতাম। তুই কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, এমন কি লেখাপড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলি? তোর চিঠি থেকে অনুমান করা যায় তুই ত্রিদিবের সঙ্গে খুব বেশী জড়িত নোস্। অথচ এত ব্যস্ত কেন? কিছুই বোঝবার উপায় নেই ; এ সবের রহস্য এক তুই জানিস আর জানে তোর ত্রিদিব। আমরা মর্ত্যের লোক ত্রিদিবের ব্যাপার কী বুঝব?

আর একটা ব্যাপারে বিস্মিত ও বিচলিত হলাম, তুই নাকি আমাকে বিভাগীয় সম্পাদক করেছিস? এ ব্যাপারে কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের বাঁশের মাথায় হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রান্নার গল্প অত্যন্ত অন্যায়-ভাবে মনে পড়ে গেল। এর মধ্যে কোনো নতুনতর অভিসন্ধি আছে নাকি? না, এ বন্ধুত্ব বজায় রাখবার অভিনব কৌশল?

অমূল্যদার শোকে আমিও দুঃখিত হলাম এবং তা মৌখিক নয়।

অমূল্যদার সঙ্গে দেখা হলে বলিস, তিনি যদি কখনো কলকাতায় আসেন আমার সঙ্গে যেন দেখা করেন, তাঁকে আমার ঠিকানা দিস।

তুই লিখেছিস, আমার লেখা না পেলে তোর কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে, যখন লিখেছিস, তখন হয়তো ঐ অবস্থা ছিল, এখন সে দুর্ভিক্ষ কেটে গেছে। এই ভেবে ভরসা করে ব্যয়ের নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করলুম।

এই মাসের 'পরিচয়ে' আমার কবিতা আর গত সংখ্যা (অর্থাৎ ত্রিংশ সংখ্যা) 'অরণি'তে আমার গল্প বেরিয়েছে। 'পরিচয়' বোধহয় তোদের ওখানে কেউ নেয় না, কিন্তু 'অরণি' নেয় জানি, সুতরাং ঐ সংখ্যা 'অরণি' জোগাড় করে তুই পড়িস এবং মাকে পড়াস আর এই চিঠির উত্তরে গল্পটা সম্বন্ধে মূল্যবান মতামত জানাস।

পরিশেষে এই বলে বিদায় নিচ্ছি যে, একদিকে বাইরের খ্যাতি, সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করছি, অন্যদিকে ·· ··· ··· আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। আমার শিক্ষা জীবনের ওপর এতবড় আঘাত আর আসে নি, তাই বোধহয় এত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে এই স্বাভাবিকতাকে, তাই সমস্ত শিরা—শিরার রক্তে রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিবাদ !

চিঠির উত্তর দিস।[২৫] ইতি—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[২৭শে চৈত্র ১৩৪৮]

১২ অনন্তপুর, পোঃ হিনু, রাঁচি

চোদ্দ

অরুণ,

অনেক ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে অনেক অবিশ্বাস আর অসম্ভবকে অগ্রাহ্য করে শেষে সত্যিই রাঁচি এসে পৌঁছেছি। আসার পথে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখি নি, কেবল পূর্ণিমার অস্পষ্ট আলোয় স্তব্ধ গভীর বরাকর নদীকে প্রত্যক্ষ করেছি।

তখন ছিল গভীর রাত—(বোধহয় রাত শেষ হয়েই আসছে) আর সেই রাত্রির গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই মৌন মূক বরাকরের জলে। কেমন যেন ভাষা পেয়েছিল সব কিছুই। সেই জল আর অদূরবর্তী একটা বিরাট গম্ভীর পাহাড় আমার চোখে একটা ক্ষণিক স্বপ্ন রচনা করেছিল।

বরাকর নদীর এক পাশে বাঙলা, অপর পাশে বিহার আর তার মধ্যে স্বয়ং-স্ফূর্ত বরাকর ; কী অদ্ভুত, কী গম্ভীর ? আর কোনো নদী (বোধহয়, গঙ্গাও না) আমার চোখে এত মোহ বিস্তার করতে পারে নি।

আর ভাল লেগেছিল গোমো স্টেশন। সেখানে ট্রেন বদল করার জন্যে শেষ রাতটা কাটাতে হয়েছিল। পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা সেখানে উপলব্ধি করেছি। স্তব্ধ স্টেশনে সেই রাত আমার কাছে তার এক অস্ফুট সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে রইল চিরকাল।

তারপর সকাল হল। অপরিচিত সকাল। ছোট ছোট পাহাড়, ছোট-ছোট বিশুষ্কপ্রায় নদী আর পাথরের কুচি-ছিটানো লালপথ, আশেপাশে নাম-না-জানা গাছপালা ইত্যাদি দেখতে দেখতে ট্রেনের পথ ফুরিয়ে গেল।

তারপর রাঁচি রোড ধরে বাস-এ করে এগোতে লাগলুম। বাসের কী শিংভাঙা গোঁ! সে বিপুল বেগে ধাবমান হল পাহাড়ী পথ ধরে। হাজার-হাজার ফুট উঁচু দিয়ে চলতে-চলতে আবেগে উছলে উঠেছি

আর ভেবেছি এ-দৃশ্য কেবল আমিই দেখলুম ; এই বেগ আর আবেগ কেবল আমাকেই প্রমত্ত করল ! হয়তো অনেকেই দেখেছে এই দৃশ্য, কিন্তু তা এমন করে অভিভূত করেছে কাকে ?

রাঁচি এসে পৌঁছলাম। আমরা যেখানে থাকি, সেটা রাঁচি নয়, রাঁচি থেকে একটু দূরে— এই জায়গার নাম ডুরাণ্ডা। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণস্রোতা সুবর্ণরেখা নদী। আর তারই কূলে দেখা যায় একটা গোরস্থান। যেটাকে দেখতে-দেখতে আমি মাঝে মাঝে আত্মহারা হয়ে পড়ি। সেই গোরস্থানে একটা বটগাছ আছে, যেটা শুধু আমার নয় এখানকার সকলের প্রিয়। সেই বটগাছের ওপরে এবং তলায় আমার কয়েকটি বিশিষ্ট দুপুর কেটেছে।

গত শুক্রবার সকাল থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দে কেটেছে—কারণ, এই সময়টা আমরা দলে ভারি ছিলাম। রবিবার দুপুরে আমরা রাঁচি থেকে ১৮ মাইল দূরে 'জোন্‌হা প্রপাত' দেখতে বেরুলাম। ট্রেনে চাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল বৃষ্টি নামল এবং ট্রেনে বৃষ্টির আনন্দ আমার এই প্রথম। দুধারে পাহাড়-বন ঝাপসা করে, অনেক জলধারার সৃষ্টি করে বৃষ্টি আমাদের রোমাঞ্চিত করল।

কিন্তু আরো আনন্দ বাকী ছিল—প্রতীক্ষা করে ছিল আমাদের জন্যে জোন্‌হা পাহাড়ের অভ্যন্তরে। বৃষ্টিতে ভিজে অনেক পথ হাঁটার পর সেই পাহাড়ের শিখরদেশে এক বৌদ্ধ-মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন্দির-রক্ষক এসে আমাদের দরজা খুলে দিল। মন্দিরের সৌম্য গাম্ভীর্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম নিঃশব্দে, ধীর পদক্ষেপে। মন্দির-সংলগ্ন কয়েকটি লোহার দুয়ার এবং গবাক্ষবিশিষ্ট কক্ষ ছিল। সেগুলি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ফুল তুললাম, মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি করলাম। সেই ধ্বনি পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছলো না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশী। আমরা তাই মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। তারপর গেলাম অদূরবর্তী প্রপাত দেখতে।—গিয়ে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে, চৈতন্যকে অভিভূত করল। এতদিনকার অভ্যস্ত গতানুগতিক বৃষ্টির ওপর এ একটা সত্যিকারের প্রলয় হিসেবে দেখা দিল। মুগ্ধ সুকান্ত তাই একটা কবিতা না-লিখে পারল না। সে-কবিতা আমার কাছে আছে, ফিরে গিয়ে দেখাব। জোন্‌হা যে দেখেছে, তার ছোটনাগপুর আসা সার্থক। যদিও হুড্রু খুব বিখ্যাত প্রপাত, কিন্তু হুড্রুতে 'প্রপাত' দর্শনের এবং উপভোগের এত সুবিধা নেই—একথা জোর করেই বলব। এবং জোন্‌হা যে দেখেছে সে আমার কথায় অবিশ্বাস করবে না। জোন্‌হা সব সময়েই এত সুন্দর, এত উপভোগ্য, তা নয়; এমন কি আমরা যদি তার আগের দিনও পৌঁছতাম তা হলেও এ-দৃশ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম নিশ্চিত।

প্রপাত দেখার পর সন্ধ্যার সময় আমরা বুদ্ধদেবের বন্দনা করলাম। তারপর গল্পগুজব করে, সবশেষে নৈশ-ভোজন শেষ করে আমরা সেই স্তব্ধ নিবিড় গহন অরণ্যময় পাহাড়ে জোন্‌হার দূর-নিঃসৃত কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

জোন্‌হা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে-আছড়ে ফেলতে লাগল কঠিন পাথরের ওপর, আঘাত-জর্জর জলধারার বুকে জেগে রইল রক্তের লাল আর রুদ্ধ ঘরে শোনা যেতে লাগল আমাদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস। প্রহরীর মতো জেগে রইল ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপণ বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ভাবনা ঢেলে দিলাম সেই বিরাটের পায়ে।

পরদিন আর একবার দেখলাম রহস্যময়ী জোন্‌হাকে। তার সেই উচ্ছল রূপের প্রতি জানালাম আমার গভীরতম ভালবাসা। তারপর ধীরে-ধীরে চলে এলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আসবার সময় যে-বেদনা

জেগেছিল, বিদায়ের জন্যে তা আর ঘুচল না—সেইদিনই দুপুরে আমাদের দলের অর্ধেককে বিদায় দিয়ে সেই বেদনা দীর্ঘস্থায়ী হল। জোন্হার ফিরতিপথে, ফেরার সময় মনে-মনে প্রার্থনা করেছিলাম, আমাদের এই যাত্রা যেন অনন্ত হয়। কিন্তু পথও ফুরাল, আর আমরাও জোন্হাকে ফেলে, সেই আশ্রয়দাতা বুদ্ধমন্দিরকে ফেলে রাঁচি চলে এলাম। এ-থেকে বুঝলাম, কোনো কিছুর আসাটাই স্বপ্ন—আর যাওয়াটা কঠোর বাস্তব। খুব কম জিনিসই কাছে আসে; কিন্তু যায় প্রায় সব কিছুই। জোন্হাই তার বড় প্রমাণ।

রাঁচি ফেরার পর আমাদের দলের অর্ধাঙ্গ হানি হওয়ায় আনন্দও প্রায় সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। তবু এরই মধ্যে দুদিন রাঁচি-পাহাড়ে গেছি এবং উল্লসিত হয়েছি। এই পাহাড় থেকে রাঁচি শহরকে দেখায় ভারি সুন্দর। মনে হয়, 'লিলিপুটিয়ান'রা গড়েছে তাদের সাম্রাজ্য। শহরের মধ্যে একটি 'লেক' আছে, আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃশ্যপটও ঘন-ঘন বদলায়, এবং শহরের সৌন্দর্যের জন্যে আমার মনে হয় লেকটিই অনেকখানি দায়ী।

রাঁচি পাহাড়ের মাথায় আছে একটি ছোট্ট শিবের মন্দির। সেই মন্দিরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় ছোটনাগপুরের দিগন্ত যেন পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আর আছে একটি গুহা, সেটিও কম উপভোগ্য নয়। আর সব মিলিয়ে দেখা যায় রাঁচির অখণ্ড সত্তাকে, যা একমাত্র রাঁচিপাহাড় থেকেই দেখা সম্ভব।

'ডুরাণ্ডার বাঁধ' বলে একটি জিনিস আছে, যেটিতে আমি একদিন স্নান করেছি এবং এক সন্ধ্যায় যাকে হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি দিয়ে অনুভব করেছি। এটিকে পুকুর বলাই ভাল, বড় জোর দীঘি। কিন্তু সবাই একে 'লেক' বলে থাকে। যাই হোক, জলাশয় হিসেবে এটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আর, তা ছাড়া ডুরাণ্ডার পথ, মাঠ, বন সবই ভাল। এক কথায়, ভাল এখানকার সবই। কেবল

ভাল নয় এখানকার প্রতিবেশী, বাজারের দূরত্ব আর মিলিটারীদের আধিপত্য।

এখানে এখন মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। যদিও বৃষ্টিটা এখানে ঠিক খাপ খাচ্ছে না, তবুও এই বৃষ্টি কাল অসাধ্য সাধন করেছে—ক্ষীণ-স্রোতা সুবর্ণরেখার বুকে এনেছে যৌবন। তার কল্লোলময় জলোচ্ছ্বাসে তার স্রোতের বেগে আর ঢেউয়ের মাতামাতিতে আমরা শিহরিত হয়েছি। কারণ, কাল সকালেও সুবর্ণরেখার মাঝখানে দাঁড়ালে পায়ের পাতা ভিজত না।

যাই হোক, রাঁচির অনেক কিছুই এখনো দেখি নি। কিন্তু যা-দেখেছি তাতেই পরিতৃপ্ত হয়েছি—অর্থাৎ রাঁচি আমার ভাল লেগেছে। যদিও রাঁচির বৈচিত্র্য ক্রমশ আমার কাছে কমে আসছে, আর আজকাল সব দিনগুলোর চেহারাই প্রায় একরকম ঠেকছে। অতএব বিদায়—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পুনশ্চ :—আমার ফিরতে বেশ দেরি হবে। ততদিন···ভাইকে তদারক করিস দয়া করে। কারণ, এখানকার প্রাকৃতিক আকর্ষণের চেয়ে পারিবারিক আকর্ষণ বেশি ; কবে যাব, তার ঠিক নেই। 'বন্যা'র কাজ কতদূর ? চিঠির উত্তর দিস।[২৬]

সু. ভ.

পনেরো

শ্যামবাজার, কলকাতা

অরুণ,

আমি এখনও এখানেই আছি। অথচ 'আমি কেমন আছি' এই খবরটা নেবার যে তোর দরকার হয় না, এইটাই আমাকে বিস্মিত করেছে। যদিও বুঝি যে এর পেছনে রয়েছে তোর Duty-র প্রতিকূলতা। (তোর কোনো অসুখ হয় নি তো?) তাই তোর ঔদাসীন্যকে সহজেই ক্ষমা করা যায়।

যাই হোক, কাল (২২।১২।৪৩) তুই তোর 'Duty' ৩টেয় শেষ করে অন্যান্য কাজ আধ ঘণ্টায় সেরে ৪টের মধ্যে এখানে আসবি বাসে চেপে। সঙ্গে Govt. Art School-এ Exhibition দেখতে যাবার মতো গাড়িভাড়াও আনিস। তোর অসুখ না-হয়ে থাকলে আশা করি, আমার এ-অনুরোধ পালিত হবে।

২১।১২।৪৩ —সুকান্ত

ষোল

অরুণ!

বিয়ের দিন[২৭] সকাল বেলায় তোর চিঠি পেলাম। তোর কথা মতো শুধু বিশ্বনাথকে 'জনযুদ্ধ' দেওয়ার সুযোগ পেলাম না বিয়ের কাজের চাপে।* অন্য অনুরোধগুলো রাখবার চেষ্টা করব।

এই চিঠির প্রধান আলোচ্য বিষয় বিয়ে এবং বিয়েও হয়ে গেল দুদিন হল। আজ ফুলশয্যা। বিয়েটা আমার ভাল লাগে নি, বরং খুব নিরানন্দেই কেটেছে। বিশেষ করে আদর এবং সম্মান পাওয়ায়

অভ্যস্ত আমি, মোটেই সম্মান পাই নি কোথাও, ভাঁড়ের মতো আমার অবস্থা।

বিয়ের দিন বিকেলে এসে·· রাত্রিতে ফিরে গিয়েছিল। আবার কাল সন্ধ্যায় এসে 'যাই-যাই' করেও রয়ে গেছে। এইমাত্র ও এই ঘরে শুয়ে লেনিনের জীবনী পড়তে পড়তে উঠে গেল। (ওর নম্রতায় আমি মুগ্ধ!) ও আবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল! তারপর চলে গেল। আমার ডানপাশে খাটের ওপর ঘুমিয়ে নববধূ (মন্দ নয়)। মেঝেতে মেজবৌদি[১৪] এবং ভূপেন। বেলা প্রায় পাঁচটা। এই আবহাওয়ায় লেখা খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। কয়েক দিন বিয়ের জন্যে পার্টির কাজের কামাই হয়ে গেল। হয়তো তোদের ওখানে যেতে পারব না ছুটি না পেয়ে। না গেলে কি ক্ষমা করতে পারবি না?

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৯।৬।৪৪

আমি যাই আর না-যাই ১৫ তারিখের মধ্যে তুই কলকাতায় ফিরিস। ১৫ই A. I. S. F. Conference!

সতেরো

দোস্ত,

কয়েকটা কারণে আমার তোর ওখানে যাওয়া হল না। যেমন

(১) কিশোর বাহিনীর দুধের নতুন আন্দোলন শুরু হল।

(১৪ই জুনের 'জনযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য।)

(২) ১৫ই জুন A. I. S. F. Conf.

(৩) কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয় নি। ছাপাব।

(৪) ১৩ই জুন I. P. T. A.-এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে।

(৫) ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরী মিটিং।

(৬) কিশোর বাহিনীর ৪নং চিঠি এ-সপ্তাহে লিখতে হবে।

(৭) ১৬ই জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত।

(৮) এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

তোদের ওখানকার কিশোর বাহিনীকে আমায় ক্ষমা করতে বলিস। নতুন আন্দোলনের জন্যে রমাকৃষ্ণ[২৯] আমায় ছাড়লো না। তোর মা আমায় ক্ষমা করবেন না জানি, কিন্তু তুই এ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কি রকম ব্যবহার করবি সেটাই লক্ষণীয়।

তুই অনেকদিন কলকাতা ছেড়েছিস। লক্ষ্মীবাবু[৩০] এবং আমার মতে তোর এখন ফেরার সময় হয়েছে। ১৫ তারিখের মধ্যে তোর কলকাতা আসা পার্টির বাঞ্ছনীয়।[৩১]

আঠারো

অরুণ,

মনে আছে তো আজ কিশোর-বাহিনীর শারদীয় উৎসব? অশোক[৩২] যেতে চায়, ওকে নিয়ে তুই চারটের মধ্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পৌঁছস, আমি একটু ঘুরে যাব কিনা।[৩৩]

—সুকান্ত

উনিশ

বেনারস সিটি

অরুণ,

যে-ম্যালেরিয়া তোকে প্রায় নির্জীব করে তুলেছে, আমি এখানে আসার পঞ্চম দিনে তারই কবলে পড়ে সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করার পথে—তাই এতদিন চিঠি দিই নি। আজ অন্নগ্রহণ করলুম। তুই এখন কোথায়? কোডারমায় না কলকাতায়? দুদিন মাত্র সুযোগ পেয়েছিলাম কাশী দেখবার, তাতেই অনেকখানি দেখে নিয়েছি। কাশী ভাল লাগছে না: অনেকদিন পর ফিরে পাওয়া তামার পয়সার মতো ম্লান লাগছে। আর শরীর এখন খুবই দুর্বল, কারণ এ-কদিন সাংঘাতিক কষ্ট গেছে। তোকে রীতিমত কষ্ট করেই লিখতে হচ্ছে। আর লিখতে পারছি না। সকলের কুশলসহ এই চিঠির আশু বিস্তৃত জবাব চাই।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

২৮।১০।৪৪

পুনশ্চ:

হঠাৎ এখানে অন্নদার[৩৪] সঙ্গে দেখা হয়েছিল। খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

কুড়ি

S. B.
C/o Haradas Bhattacherjee
279 Agastya Kundu
Benares City
২০. ১১. ৪৪

অরুণ,

তোর চিঠি অনেকদিন হল পেয়েছি, পেয়ে তোকে হতাশই করলুম। অর্থাৎ উত্তর দিতে দেরিও করলুম অথচ কাশীর বর্ণনামূলক ব্যক্তিগতভাবে চিঠিটা লিখলুম না। লিখলুম না এইজন্যে যে, কাশীর একটানা নিন্দে করতে আর ইচ্ছে করছে না : ওটা মুখোমুখিই করব, তাই আপাতত স্থগিত রাখলুম।

শুনে বোধহয় দুঃখিত হবি যে, আমি আবার অসুখে পড়েছি ; তবে এবারে বোধহয় অল্পের ওপর দিয়ে যাবে। তা ছাড়া যদি ভাল হয়ে উঠতে পারি, তা হলে আশা করা যায়, আগামী ২৯ তারিখে তোর সঙ্গে কলকাতায় আমার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু বেলেঘাটায় ফিরে যেতে আশঙ্কা হচ্ছে। কেননা বেলেঘাটাই এখন ম্যালেরিয়া-সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর আমি ম্যালেরিয়ার রোগী হয়ে কি সেখানে প্রবেশ করতে পারি? বিশেষত আমি যখন ম্যালেরিয়া-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে আর রাজী নই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তুই চিরকেলে ম্যালেরিয়া রোগী, তুই কি করে এখনো টিকে আছিস? (অবিশ্যি এখনো কিনা—ঠিক বলতে পারছি না)।

কেবল ম্যালেরিয়ার কথাই বলে চলেছি, এখন কাশীর কথা কিছু বলি।

কাশীর আমি প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখেছি। ভাল লেগেছে কেবল ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধঘটনাজড়িত প্রাসাদের প্রত্যক্ষ

বাস্তবতা, আর রাজা মানসিংহ স্থাপিত Observatory মানমন্দির। অবিশ্যি বিখ্যাত বেণীমাধবের ধ্বজা থেকে কাশী শহর খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু সেটা বেণীমাধব বা কাশীর গুণ নয়, দূরত্বের গুণ। কাশীর গঙ্গা এবং উপাসনার মতো স্তব্ধ তার শ্যামল পরপার, এ দুটোই উপভোগ্য। কাশী শহর হিসেবে খুব বড় সন্দেহ নেই; বিশেষত আজকের দিনে আলো-ঝলমল শহর হিসেবে। অর্থাৎ এখানে 'ব্লাক-আউট' নেই। আর পথে পথে এখানে দেখা যায় লোকের ভিড় কলকাতার মতোই।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'ছাত্র-নিবাস-মূলক' বিশ্ববিদ্যালয়। আর দেখলাম গান্ধীজী পরিকল্পিত ভারতমাতার মন্দির। দুটোতেই ভাল লাগার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও ধর্মের লেবেল আঁটা বলে বিশেষ ভাল লাগল না। আর সবচেয়ে ভাল লাগল সারনাথ। তার ঐতিহাসিকতায়, তার নির্জনতায়, তার স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, তার ইটপাথরে খোদিত কর্মগাথায় সে মহিমময়।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখন জ্বর আবার আসছে!

●

একুশ

কলকাতা

২০।১।৪৫

অরুণ,

তোর খবর কি? এক মাস তোর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই অবিশ্যি দেখা-সাক্ষাৎ করাটা তোর কাছে অধুনা অবান্তর।

আমি কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে বার দুই-তিন বেলেঘাটায় গেছি তোর খোঁজে। যাই হোক, তোর খবরের জন্যে আমি কি রকম উৎসুক তা 'রিপ্লাই কার্ড' দেখেই আশা করি আন্দাজ করতে পারবি, এর পর যেন আর উত্তর দিতে দেরি করিস নি। অসুখ করে নি তো? কেননা, আমি ইতিমধ্যে আবার অসুখে পড়েছিলাম। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য আমার দুশ্চিন্তা ও অবহেলার সীমা নেই, যদিচ তোড়জোড় করছি খুব। তাই উত্তর দিতে অবহেলা করে আর দুশ্চিন্তা বাড়াস নি। কলকাতায় কবে ফিরবি? বাড়ির অন্য সব কে-কেমন আছে জানাস।

—সুকান্ত

বাইশ

কলকাতা

১. ২. ৪৫

অরুণ,

কাল-পরশু-তরশু, যেদিন হয় শৈলেনের কাছ থেকে সংস্কৃত নোটখানা নিয়ে বেলা পাঁচটার মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিস। বেলেঘাটার ভূষীদা'দের[৩০] কি বক্তব্য জেনে আসিস, আমি তার কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করব। দেখাটা ৪—৫টার মধ্যে হলেই ভাল হয়। মনে রাখিস, অন্যথা অক্ষমনীয়।

—সুকান্ত

তেইশ

অরুণ,

কবিতা পাঠালুম। সেদিন[৩৬] লাঞ্ছনা কমই হয়েছিল। কেননা সে সন্ধ্যায় সহপাঠিনীও ফাঁকি দিয়ে আমার মুখরক্ষার সুবিধা করে দিয়েছিল। আমার সাম্প্রতিক মনোভাব শোচনীয়। অবস্থাটা কবিতায় বলি ঃ

কেবল আঘাত দেয় মূর্খ চতুর্দিক,
তবুও এখনো আমি নিষ্ক্রিয় নির্ভীক,
ভারাক্রান্ত মন আজ অবিশ্রান্ত যায়,
তবু নিকটস্থ ফুল সুগন্ধে মাতায়।

— সু

চব্বিশ

২১।৯।৪৫

অরুণচন্দ্র !

কলকাতায় এত কাণ্ড, এত মিটিং অথচ তোর পাত্তা নেই, বাড়িতে এসে সেখানেও নেই, পাত্তাটা কোথায় মিলবে ?

সুভাষ আগামী বুধবার এখানে আসতে রাজী হয়েছে। তার জন্য আয়োজন করতে থাক। আমার তাড়া থাকায় আমি চললাম।

—সুকান্ত

২·৫৫ মিঃ দুপুর।

পঁচিশ

(ক)

৮ই, ডেকার্স লেন : 'স্বাধীনতা'

২৪ ৮. ৪৬

প্রিয় বয়স্য,

তোর আবেগের কারণটা ঠিক বুঝলাম না, কেমন যেন হেঁয়ালী। এই হেঁয়ালীকে ব্যঙ্গ করব, না সহানুভূতি জানাব তাও বুঝছি না। আমি খুলনা যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছি এক মুহূর্তের লজ্জায়। কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী[৩৭] নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, আমি হঠাৎ 'না' বলে ফেলেছিলাম। যাই হোক, তুই তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর চিঠির থলি এখুনি ঘাড়ে করে বেরুব। 'কার্টুন' ভাল হলে পাঠাস। ভূপেনের লেখা মন্দ হয় নি। 'কবিতা' পত্রিকায় এবারও তোর আর আমার লেখা প্রকাশিত হয় নি। যেতে পারলুম না বলে দুঃখ করিস নি।

—সুকান্ত

(খ)

স্বামী অরুণাচল মহারাজ সমীপেষু,

বাবাজী!

আপনি গাঁজার ঘোরে ভুল দেখিয়াছেন। আপনার 'নাম-চিহ্ন' নকল করা হয় নাই। ছবিটি বিখ্যাত শিল্পী অহিনকুল মুখোপাধ্যায়ের[৩৮] আঁকা। নামচিহ্ন অনেকটা আপনার ন্যায় হইলেও স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং ডায়ালেকটিকাল আদালতের[৩৯] কী ভয় দেখাইতেছেন! ব্যাপারটি মেটাফিজিকস[৪০] তাই বুঝিতে পারেন নাই[৪১]।

দুর্বিনীত : সুকান্ত শর্মা

ছাব্বিশ

"তোমার হলো শুরু : আমার হলো সারা"

২০, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ দুপুর,
কলিকাতা

অরুণ,

তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। ভেবেছিলাম খুব দুরবস্থার মধ্যে আছিস, চিঠি পেয়ে বুঝলাম, মা-র কোলে সুখেই দিনাতিপাত করছিস এবং মনের আহ্লাদে স্মৃতির জাবর কাটছিস—সুতরাং আমি এখন নির্ভয়।

তোর তৃতীয় (! ?) প্রেমের ইতিবৃত্ত পড়লাম, প'ড়ে খুশিই হলাম। —বরাবরই তোর এই নূতনত্বের প্রীতি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এবারও দিল। ভয় নেই তোর এই ব্যাপারে আমি তোকে নিরুৎসাহ করতে চাই না।

কারণ তোর মতো বঞ্চিত জীবনে এই রকম নায়িকার আবির্ভাব বরাবর হওয়া দরকার। যদিও এ জাতীয় প্রেমোপাখ্যানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমি বরাবর অতি-সতর্কতার দরুন সন্দিহান, তবুও এর উপকারিতাকে আমি অস্বীকার করি না। তবে, এই ব্যাপারে উৎসাহ দিতে গিয়েও আমি তোকে একটা প্রশ্ন করছি—এইভাবে এগোলে জীবনের জটিলতা কি আরো বেড়ে যাবে না? অবশ্য ভাল-মন্দ বিবেচনার ভার তোর ওপর এবং পারিপার্শ্বিক বিচারও তুই-ই করবি, সুতরাং আমার এ বিষয়ে বলা অনর্থক।

চিঠির সমালোচনা করতে বলেছিস, কিন্তু সমালোচনা করার বিশেষ কিছুই নেই। ভাষা সংযত এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল, চিঠিতে আবেগ কম, তথ্য বেশী এবং চিঠিটা বিরাট হয়েও বিরক্তিকর তো

নয়ই বরং কৌতূহলোদ্দীপক। একমাত্র "উপলব্ধি" বানান ছাড়া আর সব বানানই শুদ্ধ। হাতের লেখা তেমন ভাল নয়।

বিষয়বস্তু: একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম··· ? ··· হোক আর ছাই না-ই হোক, মেয়েটির যে অনেক গুণ আছে সে পরিচয় পেয়েছি; ··· কেমন জানতে পারি নি। অবশ্য সে যদি ···হয় তবে রূপ বর্ণনার প্রয়োজন নেই, কারণ সেটা অজ্ঞাত নয়। একটি মেয়ের প্রেম এই চিঠির বৈশিষ্ট্য, তাই এই চিঠি সরস এবং উত্তেজনাময়। মানুষ চিরকালই প্রেমের গল্প পড়তে ভালবাসে। সেই হিসাবে দেখলেও চিঠিটা Interesting. সবকিছু ছাপিয়ে এই চিঠিতে ফুটে উঠেছে তোর ভবিষ্যৎ; যে ভবিষ্যৎ হয়তো সুখের অথবা বঞ্চনার হবে; যে ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার অথবা মুক্তির হবে। বন্ধু হিসাবে আমি তোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত। সমালোচক হিসাবে সন্দিগ্ধ। সুতরাং এ বিষয়ে আমার মতামতের কোনো দাম নেই। তোদের কবিতা "দ্বৈত" যেমন ছেলেমানুষিতে ভরা, তেমনি চমৎকার পন্থা পরস্পরের মন জানার। তোর আর্থিক সুরাহা যদি হয় তবে আমিই সর্বাপেক্ষা খুশী হব। নিঃস্বার্থ খুশী।

তোর শরীর খারাপ লিখেছিস অথচ ভাল হওয়ার ব্যাপারে "জিদবশত" সিদ্ধহস্ত, এই গর্বও প্রকাশ করেছিস। তাই আমি তোর শরীর খারাপের ব্যাপারে চিন্তিত, গর্বের ব্যাপারে মুচকি-হাসিত। আমি কেবল কামনা করছি মনেপ্রাণে সুস্থ হয়ে ওঠ; সত্যিকারের শিল্পী হয়ে ওঠ। তোর বিজয় ঘোষিত হোক।

আমার খবর: শরীর মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এইটাই মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির সময় (ভয় নেই, আঘাতটা প্রেমঘটিত নয়)। আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার

হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার ভবিষ্যৎ আকাশ। গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাই নি ভালমতো। একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু "পরিবর্তনও" ঘটে নি আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি; তাই ভেতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে উঠেই গত তিন মাস ধরে খাটছি। বুঝতে পারি নি স্বাস্থ্যের অযোগ্যতা। হঠাৎ গত সপ্তাহে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় শয্যা নিলুম। একটু দাঁড়াতে পেরেই গত দেড় মাস ধরে··· ··· ··· জন্যে অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসাবে···কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা! আর পেলুম চারদিনের জন্যে পার্টি হাসপাতালের "ওষুধপথ্যিহীন" কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনো হই নি। আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মীসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে! দুই সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মীসত্তাই জয়ী হতে চলেছে; কিন্তু কি করে ভুলি, দেহে আর মনে আমি দুর্বল: একান্ত অসহায় আমি? আমার প্রেম সম্পর্কে সম্প্রতি আমি উদাসীন। অর্থোপার্জন সম্পর্কেই কেবল আগ্রহশীল। কেবলই অনুভব করছি টাকার প্রয়োজন। শরীর ভাল করতে দরকার অর্থের, ঋণমুক্ত হতে দরকার অর্থের; একখানাও জামা নেই, সেজন্যও যে বস্তুর প্রয়োজন তা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং অর্থের অভাবে কেবলই নিরর্থক মনে হচ্ছে জীবনটা।

আমাদের উপন্যাসটা চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল এবং সেজন্যে আমাদের তিনজনের অভিশাপ যদি কেউ পায় তো সে অরুণাচল বসুই পাবে। সে যদি জোর করে ত্রিভুজের মধ্যে মাথা না গলাতো তা হলে এমনটি হ'ত না। তোর বদলে···কে লিখতে দেওয়া হয়েছিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তিন সপ্তাহ আগে তাকে খাতা দেওয়ার পর

আজো সে কিছুই লেখে নি এবং বোধহয় খাতাও ফেরত দেয় নি ভূপেনকে। তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সে আমায় পাগল করে রেখেছিল, দেখা হলে কৈফিয়ৎ দিল: আমার আশ্রয় নেই তাই লিখতে পারি নি, গৃহহীন আমি Advance অফিসেই রাত্তির কাটাই।

দেবব্রতের খবর রাখি না অনেকদিন হল। তুই যে ঝি দিতে চাস্ তা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। বাবা-দাদা উভয়েই আগ্রহ দেখিয়েছে। যদি "তার" পাথেয় একান্তই যোগাড় না হয় তা হলে আমাকে লিখিস, পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

—সুকান্ত

৩১শে জ্যৈষ্ঠ ৫৩।

সাতাশ

10 Rawdon Street
Calcutta.

বন্ধুবৎসলেষু

....

....

—সুকান্ত

২৭।৬।৪৬

আঠাশ

৩।৭।৪৬

অরুণ,

তুই কবে আসছিস ? আমার চতুর্দিকে দুর্ভাগ্যের ঝড়। এ-সময় তোর উপস্থিতি আমার পক্ষে নির্ভরযোগ্য হবে। তোর খবর ভাল তো ?

আমাদের ঝি চলে গেছে। আসার সময় তুই যে ঝি দিবি বলেছিলি, তাকে আনা চাই-ই। আমার ১৩৫২-র বৈশাখের 'পরিচয়'-খানাও আনিস। আর সবার খবর ভাল। মা-র খবর কী ?

—সুকান্ত

ঊনত্রিশ

বুধবার, সকাল ১১টা

অরুণ,

তোকে কাল যে ওষুধটা পাঠিয়েছি ভাত খাওয়ার পর দু'চামচ করে খাচ্ছিস তো ? ওটা তোর পক্ষে অমোঘ ওষুধ। দিন-তিনেকের মধ্যেই জ্বর বন্ধ হয়ে যাবে, আশা করছি।

তোর কথামতো তোর জন্যে দুখানা টিকিট এনে ফেলেছি। তা ছাড়া আরো দুটো টিকিট এনেছি···তোর ভক্তদের কাছে বিক্রি করার জন্যে। টিকিট চারটে পাঠালাম (দাম প্রতিটি এক টাকা)। ডাক্তার আমাকে শয্যাগত করে রেখেছে, কাজেই তুই একমাত্র ভরসা। যেমন করে হোক, টিকিট চারটে বিক্রি করে শনিবারের মধ্যে দামগুলো আমার বাড়িতে পোঁছে দিবি। এটা হুকুম নয়, অনুরোধ।

তা ছাড়া শনিবার তোর বাড়িতে 'চতুর্ভুজ' বৈঠকের কথা ছিল। সেটা আমার বাড়িতেই করতে হবে। আমি নিরুপায়। ভূপেনকে সেই অনুরোধ জানিয়েই আজ চিঠি দেব। আশা করছি, তুই আমার অবস্থাটা বুঝবি।[৪৩]

—সুকান্ত

ত্রিশ

অরুণ,

সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে যে-করে হোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়িতে আসিস। এই রকম জরুরী দরকার খুব কম হয়েছে এ পর্যন্ত। মনে রাখিস ;

অত্যন্ত জরুরী[৪৪]

—সুকান্ত

একত্রিশ

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭

সকাল

অরুণ,

আমি পরশু শ্যামবাজার যাচ্ছি। কাজেই দু-একটা কাজের ভার তোকে দিচ্ছি, আগামীকাল রাত্তিরের মধ্যে কাজগুলো করে তুই আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কাল দেখা করবি। কাজগুলো হচ্ছে

(১) শিশির চ্যাটার্জির[৪৫] কাছ থেকে 'খবর' ইত্যাদি কবিতাগুলো জোর করে আনবি।

(২) দেবব্রতবাবুর[৪৬] কাছ থেকে আমার ছড়ার বইয়ের পাণ্ডুলিপি যে-করে হোক সংগ্রহ করা চাই।

(৩) যে জিনিসটার জন্যে তোকে নিত্য তাগাদা দিচ্ছি, পারিস তো সেটাও আনিস।

কাজগুলো খুবই জরুরী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওপরের তিনদফা জিনিসগুলো হস্তগত করে আমার সঙ্গে দেখা করবি। অনেক সুখবর আছে।

—সুকান্ত

বত্রিশ

যাদবপুর.টি-বি-হাসপাতাল

অরুণ!

সাতদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি। বড় একা-একা ঠেকছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলে কেউ এলে

আনন্দে অধীর হয়ে পড়ি। মেজদা[৪৭] নিয়মিত আসে, কিন্তু সুভাষ নিয়মিত আসে না। কাল মেজবৌদি-মাসিমাকে[৪৮] নিয়ে মেজদা এসেছিল। চলে যাবার পর মন বড় খারাপ হয়ে গেল। বাস্তবিক শ্যামবাজারের ঐ পরিবেশ ছেড়ে এসে রীতিমত কষ্ট পাচ্ছি।

তুই কি এখনো দাঙ্গার অবরোধের মধ্যে আছিস? না কলকাতায় যাতায়াত করতে পারছিস? যাই হোক, সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবি। দেখা করবার সময়—বিকাল চারটে থেকে ছ'টা। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে করে আসতে পারিস, কিম্বা ৮এ বাসে। এখানে 'লেডী মেরী হার্বার্ট ব্লক' এক নম্বর বেডে আছি। আশা করি আমার চিঠি পাবি। দেখা করতে দেরি হলে চিঠি দিস।[৪৯]

৮।৪।১৯৪৭ —সুকান্ত

তেত্রিশ

শ্রদ্ধাস্পদাসু,[৫০]

মা, আপনার ছোট্ট মৌচাকটি আমার হস্তগত হল। কিন্তু কৃপণতার জন্য দুঃখ পেলাম।

আপনি আমায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। আপনার আগ্রহ আমায় লজ্জা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না বলে। আপনার আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারব বলে মনে হয় না। আমার মুর্শিদাবাদ যাবার ইচ্ছে নেই। তবে ঝাঁঝায় যাবার কথা হচ্ছে দাদা-বৌদির—সেখানে যেতে পারি। তবে আপনাদের ওখানকার আমন্ত্রণ সেরে।

সেদিন আপনাদের ট্রেইনখানা আমার সামনে দিয়ে গেল, পিছন

থেকে অমূল্যবাবুকে দেখেছিলাঃ., আর দেখেছিলাম আপনার কয়েকজন সহযাত্রীকে, কিন্তু আপনাকে দেখলাম না দুঃখের বিষয়। …কিছুদিন মনে হ'ত, আজ সন্ধ্যায় কোথাও যেতে হবে না! আজকাল সে-ভাব থেকে মুক্ত। আপনারা নিশ্চয়ই ভাল আছেন? আপনি আমার,—থাক কিছুই জানাব না

—এমন একজন যে আপনার বাবা হতে পারবে না; কারণ, তার বড় ভয়, পাছে সে বাবা হলে বাবার কর্তব্য হতে বিচ্যুত হয়। আর আপনার 'অরুণ-বাবা'টি তো মেয়ের আবদারে নাকি কলের পুতুল ব'নে আছে। সুতরাং উল্টোটাই হোক। আপনার কৃপণতার প্রতিশোধ নিলুম, ছোট চিঠি দিয়ে। ইতি—

—সুকান্ত

চৌত্রিশ

শ্রদ্ধাস্পদাসু,[৫১]

বিস্তারিত বর্ণনা আগামী পত্রে প্রাপ্তব্য। আপনি এবং আপনার পুত্র আশা করি কুশলময়। অরুণকে বলবেন আমার চিঠির জবাব দিতে, তার ব্যাপার দুঃখপ্রদ। আমরা কুশলে। ইতি

—সুকান্ত

পঁয়ত্রিশ

কলকাতা

শ্রদ্ধাস্পদাসু,[৫২]

মা, প্রথমেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েরাখা ভাল। কারণ অপরাধ আমার অসাধারণ—বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আপনার স্বপক্ষে। আর আমার প্রতিবাদ করবার কিছুই যখন নেই, তখন এই উক্তি আপনার কাছে মেলে ধরছি যে, পারিবারিক প্রতিকূলতা আমাকে এখানে আবদ্ধ করে রেখেছে; নইলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমার অপরাধ যে হয়েছে, সেটা অনস্বীকার্য। তবু উপায় যখন নেই, তখন ক্ষমা ভিক্ষা করা ছাড়া আর আমার গতি রইল না। বাড়ির কেউ আমায় এই ছুর্দিনে চোখের আড়াল করতে চায় না। অথচ এখানটাও যে নিরাপদ নয়, সেটা ওরা বুঝতে পারে এবং পেরেও বলে, মরতে হলে সবাই একসঙ্গে মরব। কী যুক্তি! আসল ব্যাপার হচ্ছে সমূলে বিনাশ হলেও আমি যেন না এই সংসার-বৃক্ষচ্যুত হই।

···যেখানে যাই সেখানেই দেখি কুশ্রীতা মলিনতা— এক ছুর্নিবার গ্লানিতে আমি ডুবে আছি। আপনাকে এত কথা বলছি এর কারণ আপনার কাছে সান্ত্বনা, আশ্বাস চাই বলে; আপনার আশীর্বাদ চাই যাতে এই দূষিত আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারি। আজকাল আপনাকে খুব বেশী করে—ঠিক এই সময়ে আপনার পবিত্র সান্নিধ্য পেলে আমি নিজেকে এতটা অসহায় মনে করতুম না—এই কথা ভেবে মনে পড়ে। চিঠি লেখার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই।

বাস্তবিক, আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই···কোনো গহন অরণ্যে কিংবা অন্য যে-কোন নিভৃততম প্রদেশে; যেখানে কোনো মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট-মনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা, আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এতোরও দরকার নেই, নিদেনপক্ষে আপনাদের ওখানে যেতে

পারলেও গভীর আনন্দ পেতাম, নিষ্কৃতির বন্য আনন্দ; সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার নিবিড় অসহযোগ চলছে। এই পার্থিব কৌটিল্য আমার মনে এমন বিস্বাদনা এনে দিয়েছে, যাতে আমার প্রলোভন নেই জীবনের ওপর।...এক অননুভূত অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করেছে। সমস্ত পৃথিবীর ওপর রুক্ষতায় ভরা বৈরাগ্য এসেছে বটে, কিন্তু ধর্মভাব জাগে নি। আমার রচনাশক্তি পর্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে মনের এই শোচনীয় দুরবস্থায়। প্রত্যেককে ক্ষমা করে যাওয়া ছাড়া আজ আর আমার অন্য উপায় নেই। আচ্ছা, এই মনোভাব কি সবার মধ্যেই আসে এক বিশিষ্ট সময়ে?

যাক আর বাজে বকে আপনাকে কষ্ট দেব না। আমার আবার মনে ছিল না, আপনি অসুস্থ। আপনার ছেলে কি পাবনায় গেছে? তাকে একটা চিঠি দিলাম। সে যদি না গিয়ে থাকে, তবে সেখানা দেবেন এই বলে যে, 'এ-খানাই তোমার প্রতি সুকান্তর শেষ চিঠি।'—আচ্ছা, কিছুদিন আগে একখানা চিঠি (Post card) এসেছিল। চিঠিখানার ঠিকানার জায়গায় কাগজ মেরে দেওয়া হয়েছিল আর তার ওপর ঠিকানা লেখা ছিল। সেই চিঠিখানা বেয়ারিং হয়। সেখানা কি আপনাদের কারুর চিঠি? বেয়ারিং করার মুর্খতার জন্য চিঠিটা আমি না-দেখে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম; তবে সেখানা আপনাদের হলে অনুতাপের বিষয়। আমার আপনাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে সর্বক্ষণ, তবে সুযোগ পাওয়াই দুষ্কর। আর সুযোগ পেলেই আমায় দেখতে পাবেন আপনার সমক্ষে। চিঠির উত্তর দিলে খুশী হব। না দিলে দুঃখিত হব না। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। এখানকার আর সবাই ভাল। ইতি। শ্রদ্ধাবনত—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সর্বাগ্রে আপনার ও অপরের কুশল প্রার্থনীয়।—সুঃ ভঃ

ছত্রিশ

দোল-পূর্ণিমা
কলকাতা

শ্রদ্ধাস্পদাসু,[৫৩]

মা, আপনার পত্রাংশ ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে দেরি হল! কারণ, সেই সময়ে আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম।···আর দিনরাত পেটে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। এখন ওষুধ খেয়ে অনেকটা ভাল আছি।

শীগ্‌গিরই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হব। আপনি কেমন আছেন? অরুণ আমার কাছে মোটেই আসে না।

স্নেহাধীন
সুকান্ত

সাঁইত্রিশ

১১ডি, রামধন মিত্র লেন
পোঃ শ্যামবাজার
কলকাতা-৪

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

মা, আপনার চিঠি কয়েক'দন হল পেয়েছি। চিঠিতে বসন্তের এক ঝলক আভাস পেলাম। আপনার কথামতো পাতাটা সঙ্গে-সঙ্গেই রেখেছি, তবে বেটে-খাওয়া সম্ভব হল না। আবার আমার পেটের অসুখ ও পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তবে আজ একটু ভাল আছি।

দিন সাতেকের মধ্যেই হাসপাতালে যাব। সেখান থেকে পরে যাব আজমীর। অরুণ মধ্যে দিন-দুই এসেছিল। আপনার খবর কী?

২০।৩।৪৭ —সুকান্ত

আটত্রিশ

বেলেঘাটা

১।২।৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু—[৫৪]

আপনার এখান থেকে চলে যাবার দিন কথা দেওয়া সত্বেও কেন আপনার অফিসে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করি নি তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ এই চিঠি উপস্থিত করলাম। সেদিন রাত ৮-৩০ এমনি সময় যথাস্থানে গিয়ে শুনলাম আপনি চলে গেছেন। সুতরাং দুঃখিত মনে বাড়ি ফিরেছিলাম। তারপর কর্তব্যবোধে এই চিঠি লিখলাম। অরুণকে এবং মাকে নিশ্চয়ই আমার না-যাবার নিরুপায়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়েছেন। আর আমি চেষ্টা করছি যথাসত্বর আপনাদের সামনে উপনীত হতে। কিন্তু এরা আমাকে যেতে দিতে রাজী তো নয়ই, যাবার বিপক্ষে নানান অবান্তর ও হাস্যকর যুক্তি দর্শাচ্ছে; তবু চেষ্টা চালাচ্ছি। দরকার হলে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হব। অরুণ এবং মা উভয়কে জানাবেন তাঁদের অবিলম্বে পত্র দেব। আপনার অবস্থিতিতে আশা করি সব অমঙ্গল দূরীভূত হয়েছে। আপনাদের কুশল কাম্য। বিনীত—

সুকান্ত

উনচল্লিশ

বেলেঘাটা
১৬ই এপ্রিল
[১৯৩৯ ?]

ভূপেন,[৫৫]

একটা চিঠি লিখছি। অত্যন্ত অনিচ্ছায় কিংবা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে না হলেও খুব মন দিয়ে লিখছি না। একটা সুযোগের প্রলোভনে চিঠিটা লিখতে বাধ্য হলুম ; কেন জানি না। তোমাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে তাকে দমন করতে পারি না। তবুও লিখে তৃপ্তি পায় না মন আর লোভও বেড়ে যায়। এইতো চিঠি লিখলাম। আবার একটু পরে হয়তো তোমায় দেখতে ইচ্ছা করবে। আগুনের মধ্যে পতঙ্গ হয়তো ঝাঁপ দিতে চাইবে ; চঞ্চল মনের অঞ্চল হয়তো বসন্তের বাতাসে একটু দুলতে চাইবে ; মনের মাদকতা হয়তো একটু বাড়বে কিন্তু শীর্ণ শাখায় সে দোলা সুখের দিনগুলিকে ঝরিয়ে দেবে। আজকাল মাঝে মাঝে অব্যক্ত স্পৃহা সরীসৃপের মতো সমস্ত গা বেয়ে সুস্থ মনকে আক্রান্ত করতে চায়। আমি এ সমস্ত সহ্য করতে পারি না। আমার চারিদিকের বিষাক্ত নিঃশ্বাসগুলো আমাকেই দগ্ধ করতে ছুটে আসে আর তার সে রোমাঞ্চকর বিশ্বাস আমাকে লুব্ধ করে। আশার চিতায় আমার মৃত্যুর দিন সন্নিকট। তাই চাই আজ আমার নির্বাসন। তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই, তোমাদের ভুলতে চাই ; দীন হয়ে বাঁচতে চাই। তাই সুখের দিনগুলোকে ভুলে, তোমাদের কাছে শেখা মারণ-মন্ত্রকে ভুলে, ধ্বংসের প্রতীক স্বপ্নকে ভুলে মৃত্যুমুখী আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু পারব না, তা আমি পারব না ;—আমার ধ্বংস—অনিবার্য। আজ বুঝেছি কেন এত লোক দুঃখ পায়, সঠিক পথে চলতে পারে না। আলেয়া-যৌবন তার দিক্-ভ্রান্তি ঘটায়। হঠাৎ স্বপ্নাকাশে বাস্তবের মেঘগুলো জড়ো হয়ে দাঁড়ায় ভিড়

করে, হাতে থাকে বুভুক্ষার শাণিত-খড়্গ আর অক্ষমতার হাঁড়ি-কাঠে তাদের মাথা কাটা পড়ে। এই তো জীবন। প্রথম যৌবনের অলস অসতর্ক মুহূর্তে আমরাই আমাদের শ্মশানের চিতা সাজাই হাস্যমুখর দিনের পরিবেশনে। অশিক্ষিত আমাদের দেশে যৌবনে দুর্ভিক্ষ আসবেই। আর তারই বহ্নিময় ক্ষুধা আমাদের মনকে তিক্ত, অতৃপ্ত, বিকৃত করে তোলে। জীবনে আসে অনিত্যতা, জীবনীশক্তি যায় ফুরিয়ে, কাজে আসে অবহেলা, ফাঁকি আমরা তখনই দিতে শিখি আর তখনই আসে জীবনকে ছেড়ে চুপি চুপি সরে পড়বার দুরন্ত দুরভিসন্ধি।

আমার কর্মশক্তিও যাত্রার প্রারম্ভেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছে এই ধূলিধূসরিত কুয়াশাচ্ছন্ন পথেই। অবসাদের শূন্যতা জানিয়ে দেয় পথ অনেক কিন্তু পেট্রোল নেই। তোমরা দিতে পার এই পেট্রোলের সন্ধান? বহু দিন অব্যবহৃত ষ্টীয়ারিংএ মরচে পড়ে গেছে, সে আর নড়তে চায় না, ঠিক পথে চালায় না—আমাকে। তোমরা মুছিয়ে দিতে পার সেই মলিনতা, ঘুচিয়ে দিতে পার তার অক্ষমতা?

যাক্, আগের চিঠির উত্তর দাও নি কেন? পায়ে পড়ে মিনতি জানাই নি বলে, না আমার মতো অভাজনের এ আশাতিরিক্ত বলে? রবীনের চিঠির সঙ্গে চিঠি দিলাম তারই খরচায়। আমার চিঠির উত্তর না দাও রবীনেরটা দিও। আমাদের Examination ২৮শে এপ্রিল। প্রাইজ ১৯শে; সেদিন আসতে পার। খোকনকে[৫৬] আমায় চিঠি দিতে ব'লো। ঘেলুর খবর কী? ইতি

সুকান্ত

চল্লিশ

রেড-এড কিওর হোম
১২. ৯. ৪৬

ভূপেন,

…এবার আমার কথা বলি। তিন সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছি। গত এক সপ্তাহ ধরে পার্টির হাসপাতালে কাটাচ্ছি—আরো কতদিন কাটাতে হবে কে জানে। যদিও অঞ্চলটা পার্ক-সার্কাস তবুও দাঙ্গা সংক্রান্ত ভয় নেই।

একরকম বৈচিত্র্যহীন ভাবেই দিন কাটছে, যদিও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। অনন্ত সিং গণেশ ঘোষ ছাড়া পেয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন—সেই একটা বৈচিত্র্য। সেদিন ডাইনিং রুমে খাচ্ছি এমন সময় কমরেড জোশী সেই ঘরে ঢুকে আমাদের খাওয়া পরীক্ষা করলেন। এটাকেও বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে।

তবে কাল আমার জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন—'আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি।' অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন—আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোনো দিনই নিজেকে মনে করি নি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয় নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বরের এই সন্ধ্যা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

হাসপাতালের ছককাটা দিন ধীর মন্থর গতিতে কেটে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে সকালের ঝক্‌মকে রোদ্দুরকে দুপুরে দেবদারু গাছের পাতায় খেলা করতে দেখি। ঝিরঝির ক'রে হাওয়া বয় সারাদিন। রাত্তিরে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়, ডালহাউসী স্কোয়ারের অপিসে বসে কোনো দিনই অনুভব করতে পারবি না এই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এখন দুপুর—কিন্তু চারিদিকে এখন রাত্রির নৈঃশব্দ্য ; শুধু মাঝে মাঝে মোরগের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এটা রাত্রি নয়—দিন।

রেডিও, বই, খেলাধুলো—সময় কাটানোর অনেক উপকরণই আছে, আমার কিন্তু সবচেয়ে দেবদারু গাছে রোদের ঝিকিমিকিই ভাল লাগছে। উড়ে যাওয়া বাইরের খণ্ড খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে বাতাসকে মনে হয় খুবই উপভোগ্য। এমনি চুপ ক'রে বোধহয় অনেক যুগ অনেক শতাব্দী কাটিয়ে দেওয়া যায়।

যাক্, আর নয়। অসুস্থ শরীরের চিঠিতে আমার ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস এসে পড়ে, কিছু মনে করিস নি।

মেজদার মুখে শুনলাম—তুই নাকি প্রায়ই "স্বাধীনতা" কিনে পড়ছিস ? শুনে খুব আনন্দ হল। নিয়মিত "স্বাধীনতা" রাখলে আরো খুশী হবো…

—সুকান্ত

একচল্লিশ

Red-aid Cure Home
10 Rawdon Street
Park Stœeet P. O.
Calcutta-16

৩।১০।৪৬

ভূপেন

দারোয়ানজীকে ধন্যবাদ—ধন্যবাদ পোস্ট অফিসের কর্তৃপক্ষ আর পিওনকে। তোর ১লা তারিখের চিঠি আজ ৩রা তারিখে পেলাম।

কলকাতা কি স্বাভাবিক হচ্ছে ?

অসুখের মধ্যে চিঠি পেতে ও চিঠি লিখতে ভালই লাগে। যদিও আমার এখন একশ'র ওপর জ্বর তবুও বেশ উপভোগ্য লাগছে এই শুয়ে শুয়ে চিঠি লেখা।

তুই যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসিস নি এতে আমি খুশীই হয়েছি। আমি যখন তোকে চিঠিটা পাঠাই তখনো কলকাতার অবস্থা এত সাংঘাতিক হয় নি; খবরের কাগজও বন্ধ হয়ে যায় নি এমন অতর্কিতে।

আমি তোকে ডেকেছিলাম শুধুমাত্র তোর সান্নিধ্য পেতে নয়, সদ্যমুক্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। শিশুর মতো সরল ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচয় তোর পক্ষে আনন্দের হ'ত। আমার সঙ্গে তো এঁর রীতিমত বন্ধুত্বই হয়ে গেছে। বাস্তবিক এইসব বীরদের প্রায় প্রত্যেকেই শিশুর মতো হাসি-খুশি, সরল, আমোদপ্রিয়। এ ছাড়াও বিখ্যাত শ্রমিক এবং কৃষক নেতারা এখানে এখন অসুস্থ অবস্থায় জড়ো হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়ে দেবারই লোভ আমার ছিল। যাই হোক, কলকাতা সুস্থ না হলে আর তোর দেখা পেতে চাই না। ইতিমধ্যে

হয়তো আমিই হঠাৎ একদিন ছাড়া পাবার পর তোদের ওখানে গিয়ে হাজির হব। কিছুই বলা যায় না।

বেশ কাটছে এখানে। সবাই এখানে আপন হয়ে উঠছে, ভালবাসতে আরম্ভ করেছে আমাকে। ডাক্তার রোগী সবারই আনন্দ আমার সঙ্গে রসিকতায়! এক এক সময় মনে হয় বেশ আছি—শহরের রক্তাক্ত কোলাহলের বাইরে এই নির্জন, শ্যামল ছোট্ট একটু দ্বীপের মতো জায়গায় বেশ আছি। কিন্তু তবুও আমার শিকড় গজিয়ে উঠতে পারে নি, বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-সমৃদ্ধ হাতছানি সকাল সন্ধ্যায় ঝলক দিয়ে ওঠে তলোয়ারের মতো। এখন আছি বদ্ধ-দীঘির জগতে; সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে মাছের মতো, কর্মচাঞ্চল্যময় পৃথিবীর স্রোতে। সকালের আশ্চর্য অদ্ভুত রোদ্দুর কোনো কোনো দিন সারাদিন ধরে কেবলই মন্ত্রণা দেয় বেরিয়ে পড়তে; শহর-বন্দর ছাড়িয়ে অনেক দূরের গ্রামাঞ্চলের সবুজে মুখ লুকোতে দেয় অযাচিত পরামর্শ। সত্যিই অসহ্য লাগে কলকাতাকে মনের এইসব মুহূর্তে।

উপন্যাসের ব্যাপারে তোর দুঃসাহসিক ধৈর্য আমাকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করল।

পুজোয় কোথায় কোথায় লিখেছি জানতে চেয়েছিস? একমাত্র পুজোসংখ্যা 'স্বাধীনতা' ও 'পরিচয়' এবং কিশোরদের বার্ষিকী 'শতাব্দীর লেখা'য় লেখা বেরিয়েছে জানি। তা ছাড়া এইসব কাগজ ও সংকলনে লেখা বেরুনোর কথা আছে: (১) শারদীয়া বসুমতী (২) শারদীয়া আজকাল (৩) উজ্জয়িনী—সংকলন (৪) মেঘনা—সংকলন (৫) ক্রান্তি—সংকলন (৬) বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি সংকলন ও (৭) পুজোর 'রংমশাল'।

তুই কেমন আছিস কোনো চিঠিতেই তা জানাস না, তাই আর ও প্রশ্নটা করলুম না। তোদের এবারে পুজো কি রকম জমলো লিখিস।

খোকন এ রকম চুপচাপ কেন? আমার মামার পদ থেকে তো তাকে পদচ্যুত করা হয় নি। বিজয়ার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাসহ

সুকান্ত

বিয়াল্লিশ

রবিবার

সকাল ন'টা

[৪.১১:৪৬]

ভূপেন,

সেদিন যেমন কারো প্রভাবে বা ইঙ্গিতে প্ররোচিত না হয়েই নিজের বিবেকবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তোকে রাগিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম, আজো তেমনি বিবেকের পীড়নে এখন বাড়িতে বসে রয়েছি, যখন খোকনের ওখানে যাবার কথা।

ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও ক'দিন ধরে খুব ঘোরাফেরা করেছি এখানে ওখানে, যার ফলে কাল রাত্তিরে অনেকদিন পরে জ্বর এল। তাই আমাকে এখন সাবধান হতে হবে। ডাক্তারের কথামত পরিপূর্ণ বিশ্রামই আমার দরকার। তাই আবার বন্ধ করে দিলুম সুস্থ লোকের মতো ঘোরাফেরা।

আশা করছি, দু'ব্যাপারেই তুই আমাকে নির্দোষ মনে করবি।

—সুকান্ত

তেতাল্লিশ

Calcutta-11

৪।১২।৪৬

ভূপেন,

আমার রোগ এমন একটা বিশেষ সন্দেহজনক অবস্থায় পৌঁচেছে, যা শুনলে তুই আবার 'চোখে বিশেষ এক ধরনের ফুল' দেখতে পারিস। ডাক্তারের নির্দেশে সম্পূর্ণ শয্যাগত আছি। কাজেই আগামী 'চতুর্ভুজ বৈঠক' আমার বাড়িতে বসবে, অরুণের বাড়িতে নয়। আমি সেইমতো ব্যবস্থা করেছি। তুই শনিবার সোজা আমার বাড়িতেই আসবি।

আর একটা কথা : আমি খোকনকে চিঠি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, রোগের ঝামেলায় ; তুই দিয়েছিস তো ?

সুকান্ত

চুয়াল্লিশ

কলকাতা

এবারকার বসন্তের প্রথম দিন

মঙ্গলবার ১৩৫১

মেজ বৌদি,

চিঠিখানা পেয়েই মেজদা ও নতেদাকে যা যা কহতব্য ছিল বলেছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমাকে হাসতে হয়েছে—সেটা কাশী থেকে ফেরার জন্যে সংকোচ দেখে। আমার আর নতেদার নির্জনতা-প্রীতির গঙ্গাজল কখনো অপবিত্র হতে পারে না। আর,

আমরা নির্জনতাপ্রিয় একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। সাময়িকভাবে নির্জনতা ভাল লাগলে যে চিরকালই ভাল লাগবে এমন কথা আমরা বলি না। নতেদা যে নির্জনতাপ্রিয় নয়, অধুনা নতেদার প্রাত্যহিক সান্ধ্য-বৈঠকগুলোই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আর আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই। সুতরাং সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান। সংকোচ কাটিয়ে ওঠার জন্যে নেমন্তন্নের লাল চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

আমার কিছু নেবার আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি আমি একটি পোড়ামুখ বাঁদর চাই। কেননা ঐ জিনিসটার প্রাচুর্য কাশীতে এখনো যথেষ্ট। তা ছাড়া, স্মৃতি হিসাবেও জীবন্ত থাকবে। আর আমার সঙ্গেও মিলবে ভাল।

এদিকে মেজদার চেষ্টায় বাড়ি বদল হচ্ছে। এই পরিবর্তন খুব সময়োপযোগী হয় নি, এইটুকু বলতে পারি। আশা করি শ্বেত-স্নাত নতুন বাড়ি প্রত্যেকের কাছেই ভাল লাগবে।

শুনলাম আসন্ন বিচ্ছেদের ভয়ে কাশীস্থ সবাই নাকি ম্রিয়মান? হওয়া অনুচিত নয় এইটুকু বেশ বুঝতে পারি।

আজকাল ভালই আছি বলা উচিত, কিন্তু একেবারে ভাল থাকা আমাকে মানায় না। তাই ঘাড়ের ওপর উদ্গত একটা বিষফোড়ায় কষ্ট পাচ্ছি। পড়াশুনায় হঠাৎ কয়েকদিন হল ভয়ানক ফাঁকি দিতে শুরু করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাঁকিবাজ হিসাবে নাম ক্রয় করেছি। পড়াশুনা করে না হোক না করে যে ফার্স্ট হয়েছি এইটাই আমার গর্বের বিষয় হয়েছে।

অপি বারাণসী নগরে সব ভাল তো? এখানকার সবাই, বিশেষ করে মেজদা ডবল মামলার মামলেট খাওয়া সত্ত্বেও শরীরে ও মেজাজে

বেশ শরিফ। বিপক্ষের বেহুদার সুযোগ নিয়ে তাদের লবেজান করা হবে, একেবারে জেরবার না হওয়া পর্যন্ত সবাই নাছোড়বান্দা, সকলের কাছে তাদের খিল্লাৎ খুলে ভবিষ্যতের খিল বন্ধ করে দেওয়া হবেই।

ফ্যা-পকাইকে[৫৭] আমার শুভেচ্ছা ও তদীয় জনক-জননীকে চিঠিতে ভ'রে প্রণাম পাঠিয়ে দিলাম। সাবধান হারায় না যেন। আর জুজুল, টুটুল, গোবিন্দ[৫৮] (মার[৫৯]) বাহিনীর জন্যে তো দোরগোড়ায় ভালবাসার কামান পেতে রেখেইছি; তারা একবার এলে হয়।

কাশীতে চালান করা এই আমার বোধহয় শেষ চিঠি। সুতরাং একটা দীর্ঘ ইতি।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে

স্নেহানুগত

সুকান্ত

পঁয়তাল্লিশ

সময়োচিত নিবেদন,

আগামী····· তারিখে মদীয় পরীক্ষোৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে মহাশয়া ১১ডি রামধন মিত্র লেনস্থিত ভবনে আগমনপূর্বক উৎসব সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করিবেন।[৬০]

বিনীত

সু. ভ.

বিঃ দ্রঃ লৌকিকতার পরিবর্তে তিরস্কার প্রার্থনীয়।

ছেচল্লিশ

Jadabpur T. B. Hospital
L. M. H. Block.
Bed no-1.
P. O. Jadabpur College
24 Parganas.

বন্ধুবরেষু,

সাতদিন কেটে গেল এখানে এসেছি। বড় একা একা ঠেকছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলের প্রতীক্ষায় থাকি, যদি কেউ আসে। সুভাষদা নিয়মিত আসছেন না, কেবল আমার জ্যাঠতুতো দাদাই নিয়মিত আসছেন। আপনি কবে আমার সঙ্গে দেখা করছেন? এখানে এলে "লেডী মেরী হার্বার্ট" ব্লকে আমার খোঁজ করবেন, আমার বেডের নম্বর 'এক'। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে অথবা কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে ৮এ বাসে করে আসতে পারেন।[৬১]

৮।৬।৪৭ —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সাতচল্লিশ

৮-২ ভবানী দত্ত লেন
১২. ৫. ৪৪

প্রিয় বন্ধু,

তোমাদের প্রথম চিঠি পাই নি; তারপর দুটো চিঠি পেয়েছি। অনেক চিঠি জমেছিল তাই উত্তর দিতে দেরি হল। রাগ ক'রো না। তোমাদের কাজের রিপোর্ট খুব প্রশংসা করবার মতো। এমনি কাজ

করলেই একদিন তোমরা বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কিশোর বাহিনী হয়ে উঠবে। তোমরা মেম্বারের পয়সা মাথা পিছু এক আনা পাঠিয়ে দিলেই আমরা সভ্য কার্ড পাঠিয়ে দেব। তোমরা এই রকম নিয়মিত চিঠি দিও। তা হলে খুব আনন্দ পাব। তোমরা জানো না তোমাদের চিঠি পেলে আমাদের কত আনন্দ হয়। তবে উত্তর দিতে একটু দেরি হবেই। তোমাদের কিশোর বাহিনী সব নিয়ম মেনে চলে তো ?[৬২]

কিশোর অভিনন্দন
সুকান্ত ভট্টাচার্য,
কর্মসচিব।

আটচল্লিশ

বাংলার কিশোর বাহিনী

কেন্দ্রীয় অফিস
৮-২, ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা
৭. ১০. ৪৩

প্রিয় বন্ধু,

তোমরা কী ধরনের কাজ করবে জানতে চেয়েছ তাই জানাচ্ছি, তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া ও আচার ব্যবহার—চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার দিকেও নজর দেবে সেই সঙ্গে। তোমরা গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সব সময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে, নিজের পাড়ার বা গ্রামের

উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে। * আর এই সমস্ত কাজ দেখিয়ে অভিভাবকদের মন জয় করার চেষ্টা করবে।

কার্ড এখনও অনেক আছে। যে ক'খানা দরকার জানিও আর কার্ড পিছু এক আনা পাঠিয়ে দিও।

সব সময় চিঠি পাঠাবে।[৬৩]

কিশোর অভিনন্দন নিও

কর্মসচিব।

ঊনপঞ্চাশ

৪।৭।৪৬

প্রিয় কমরেড,

আপনার অভিযোগ যথার্থ। কিন্তু মফস্বল জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখকরা কিশোর সভায় লেখা দিতে চান না ; কি করব বলুন ?

কিশোর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আপাতত আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। রসিদ বই ফুরিয়ে গেছে।[৬৪]

অভিনন্দনসহ

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পত্রগুচ্ছ : পরিচিতি

১। কবিবন্ধু অরুণাচল বসু।

২। এই সময় অরুণাচল বসুর সঙ্গে অর্থহীন অথচ বেশ ভারী ভারী শব্দ বানানোর খেলা চলছিল সুকান্তর। তখন কোনো কোনো লেখক অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দকে বাংলায় চালু করার চেষ্টা করছিলেন—তার প্রতি এটা ছিল দু'জনের কটাক্ষ।

৩। একটি মেয়ের ছদ্মনাম।

৪। অরুণাচলের মা শ্রীযুক্তা সরলা বসুর লেখা একটি গল্প। পরে এটি "ছটি ফাগুন সন্ধ্যা" নামে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিটার মাথায় সুকান্তর হাতে আঁকা কাস্তে-হাতুড়ি আছে।

৫। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সুকান্তর মাসতুতো ভাই ও বন্ধু।

৬। শ্রীরমেন ভট্টাচার্য। ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জেঠতুতো ভাই ও সুকান্তর বন্ধু।

৭। বেলেঘাটার বন্ধু শ্রীঅজিত বসু।

৮। সহপাঠী বন্ধু শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সরকার।

৯। সহপাঠী বন্ধু শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। অগ্রজ শ্রীসুশীল ভট্টাচার্যের বন্ধু শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ। এঁর সাহচর্যে সুকান্ত সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১১। 'শ্রীঅর্ণব' অরুণাচলের তৎকালীন ছদ্মনাম। গৃহত্যাগ করায় কৌতুকচ্ছলে এই নামে সুকান্ত তাঁকে সম্বোধন করেছেন। এ-চিঠির প্রেরণ তারিখ ১৯৪২ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ।

১২। সুকান্ত, অরুণাচল, ভূপেন এবং সুকান্তর সমবয়সী ছোটমামা বিমল ভট্টাচার্য—এই চারজনে 'চতুর্ভুজ' নামে একটি বারোয়ারী উপন্যাস লিখছিলেন। চারজনে লিখতেন বলে ঐ উপন্যাস-পাঠের সাপ্তাহিক বৈঠকের নাম দেওয়া হয়েছিল 'চতুর্ভুজ'। এখানে সেই উপন্যাসেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। জেঠতুতো দাদা শ্রীমনোজ ভট্টাচার্য।

১৪। অরুণাচলের বাবার পোস্ট-কার্ডের পিছনের অংশে লেখা এই চিঠিতে অরুণাচলের অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সুকান্ত।

১৫। পূর্বোল্লিখিত ছোটমামা শ্রীবিমল ভট্টাচার্য।

১৬। বৈমাত্রেয় বড়ভাই মনোমোহন ভট্টাচার্য ও তাঁর পত্নী সরযূ দেবী।

১৭। কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, এই আলাপের আগে সুকান্তর জেঠতুতো দাদা ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলেজের বন্ধু মনোজ ভট্টাচার্যের সহায়তায়, এর এক বছর পূর্বেই অবশ্য সুকান্তর একবার প্রাথমিক সাক্ষাৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়।

১৮। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

১৯। গ্রামে থাকার সময় সেখানকার উৎসাহীদের নিয়ে অরুণাচল "ত্রিদিব" নামে পত্রিকা বার করেন। এখানে ঐ পত্রিকার উল্লেখ করা হয়েছে।

২০। সে সময় রাজনীতিতে অনুৎসাহী অরুণাচল উক্ত পত্রিকার জন্য একটি দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক কবিতা চেয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে সুকান্ত 'মুহূর্ত' কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন।

২১। ঐ গ্রামীণ পাঠাগারের জন্য অরুণাচলের অনুরোধে সুকান্ত এই বইয়ের তালিকা পাঠান। ঐ তালিকার তলায় লেখা আছে "এই চিঠির প্রেরণ তারিখ ২৬শে ফাল্গুন, ৪৯"।

২২। এই চিঠিটিও সুকান্ত লিখেছিলেন অরুণাচলের বাবার লেখা পোস্ট-কার্ডের পিছনে। অরুণাচলের বাবার ঐ-চিঠির তারিখ ইং ৪।৪।৪৩।

২৩। কবি শ্রীঅরুণ মিত্র এবং কবি ও সাংবাদিক সরোজকুমার দত্ত।

২৪। পূর্বোল্লিখিত ছোটমামা বিমল।

২৫। সম্বোধনহীন এই চিঠিটিও অরুণাচলকে লেখা।

২৬। এই চিঠিটি ১৯৪৩ সালের জুন মাসে লেখা।

২৭। সুকান্তর অগ্রজ শ্রীসুশীল ভট্টাচার্যের বিয়ের দিন।

২৮। সুকান্তর জেঠতুতো মেজদা শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যের স্ত্রী রেণু দেবী।

২৯। শ্রীরমাকৃষ্ণ মৈত্র—তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও বর্তমানে 'ইণ্ডিয়ান স্টাডিস পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট'-এর ব্যবস্থাপক সম্পাদক।

৩০। লক্ষ্মীবাবু চিত্রশিল্পী। ইনি কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলেন।

৩১। চিঠিতে সুকান্ত স্বাক্ষর ও তারিখ দিতে ভুলে গেছেন। পোস্ট-অফিসের শিলমোহরে তারিখ আছে ইং ১৩।৬।৪৪।

৩২। সুকান্তর অনুজ শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য।

৩৩। অরুণাচলের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে লিখে যাওয়া এই চিঠিটির তারিখ ইং ২৯।৭।৪৪।

৩৪। তৎকালীন ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য।

৩৫। পার্টিকর্মী শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ।

৩৬। পরীক্ষার ঠিক আগে অরুণাচলের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ায় বাড়ি ফিরে লাঞ্ছনার ভয় করেছিলেন সুকান্ত। সহপাঠিনী হলেন সেই মেয়েটি যাঁকে সুকান্ত ভালবাসতেন। পোস্ট-অফিসের শিলমোহরে এ-চিঠির তারিখ চিহ্নিত আছে ইং ২৮।২।৪৫।

৩৭। বর্তমান ত্রিপুরার সাম্যবাদী নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

৩৮। অরুণাচল স্বাধীনতা-র কিশোর সভা-য় নামের আদ্যক্ষর (অ) স্বাক্ষর করে কার্টুন আঁকতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে বিব্রত করবার জন্যেই সেই সই-সহ কিশোর সভা-র পাতায় একটি ছবি ছাপান সুকান্ত। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠি লিখলে, অরুণাচলকে সুকান্ত এই উত্তর দেন। এই অহিনকুল মুখোপাধ্যায় বলতে শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে বুঝতে হবে। কেননা ছবিটি তিনিই এঁকে দিয়েছিলেন।

৩৯। ডায়ালেক্‌টিকাল আদালত বলতে সুকান্ত যাঁকে ভালবাসতেন তাঁর কাছে নালিশের ভয় দেখিয়েছিলেন অরুণাচল। কারণ সুকান্তর সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক ছিল 'দ্বন্দ্ব-মধুর'।

৪০। তখন অরুণাচল ও সুকান্তর ভাব আদান-প্রদানে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দের অন্যতম এই 'মেটাফিসিক‌স্' শব্দটি। বেলেঘাটার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই বিভূতি বসু অরুণাচল-সুকান্তর সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনায় এই কথাটি খুব ব্যবহার করতেন। অতীত জীবনে বিপ্লবী, অকৃতদার ও বেশ কিছুটা আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এই মাস্টারমশাই।

৪১। বর্তমান চিঠিটি ও 'প্রিয় বয়স্য' সম্বোধনযুক্ত চিঠিখানি একই পোস্ট-কার্ডের উভয় পিঠে লেখা।

৪২। সুকান্ত তখন সাময়িক অসুস্থ হয়ে পার্টির হাসপাতাল 'রেড-এড কিওর হোমে'। একই শহরে থেকেও অরুণাচল দীর্ঘদিন তাঁকে দেখতে যেতে

পারেন নি। তাই সম্বোধনটির মাধ্যমে তাঁর বন্ধুবাৎসল্যকে খোঁচা দিয়ে এই ফাঁকা (ড্যাস্ চিহ্নিত) কার্ডের চিঠিটি লেখেন সুকান্ত।

৪৩। এই চিঠিটি অন্যের হাতে পাঠানো একটি হাত-চিঠি। তারিখ সম্ভবত ৩রা বা ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৬।

৪৪। বর্তমান চিঠিটিও ঐ একই সময়কার একটি হাত-চিঠি।

৪৫। অধ্যাপক শিশির চট্টোপাধ্যায়। এ-চিঠিটি সম্ভবত সুকান্ত অসুস্থ শরীরে অরুণাচলের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে লিখে রেখে যান।

৪৬। শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

৪৭। জেঠতুতো দাদা শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য।

৪৮। পূর্বোল্লিখিত রেণু দেবী ও সুকান্তর বড় মাসি।

৪৯। অরুণাচলকে লেখা সুকান্তর সর্বশেষ চিঠি।

৫০। অরুণাচলের মা লেখিকা শ্রীমতী সরলা বসুকে লেখা চিঠি। সম্ভবত ১৩৪৮ সালের 'চৈত্র সংক্রান্তি' তারিখে অরুণাচলকে লিখিত চিঠিটির সঙ্গে এটি প্রেরিত হয়। ভাঁজ করা এই চিঠিটির পিছনে লেখা আছে "শ্রীমতী সরলা দেবী সমীপেষু"।

৫১। ১৯৪২ সালের ৪ঠা মে তারিখে অরুণাচলের বাবা অশ্বিনীকুমার বসুর পোস্ট-কার্ডের চিঠির পিছনে এই চিঠি লেখেন সুকান্ত।

৫২। ১৯৪২ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অরুণাচলকে লেখা "সৎসঙ্গ শরণম্, শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ অর্ণবস্বামী গুরুজী মহারাজ সমীপেষু" সম্বোধন-যুক্ত চিঠিটির সঙ্গেই এটি প্রেরিত হয়।

৫৩। এ চিঠিটি সম্ভবত ১৯৪৭ সালের ৭ই মার্চ লেখা।

৫৪। অরুণাচলের বাবা অশ্বিনীকুমার বসুকে লেখা চিঠি। সম্ভবত ইংরেজি তারিখ ২০শে মে ১৯৪২।

৫৫। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পরবর্তী চারটি চিঠিও এঁকে লেখা।

৫৬। ছোটমামা শ্রীবিমল ভট্টাচার্য।

৫৭। পূর্বোল্লিখিত শ্রীরমেন ভট্টাচার্যের দিদি শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্যের দুই কন্যা। সুকান্ত কাশীতে এঁদের বাড়িতে ছিলেন।

৫৮। ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মালবিকা ও পত্রলেখা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীউদয়ন ভট্টাচার্য।

৫৯। জেঠাইমা।

৬০। কাশীতে মেজবৌদি রেণু দেবীকে লেখা চিঠিতে সুকান্ত যে লাল কার্ডের উল্লেখ করেছেন তা হল এই চিঠি। এটিও তাঁকেই লেখা।

৬১। গল্প-লেখক শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি। ১৯৭২ সালের আগস্টে প্রকাশিত 'বাংলা দেশ' পত্রিকা থেকে চিঠিটি সংগৃহীত হয়েছে।

৬২। কিশোর বাহিনীর কর্মসচিব হিসাবে কিশোর বাহিনীর কোনো সদস্যকে লেখা চিঠি।

৬৩। পরিচিতি ৬২ দ্রষ্টব্য।

৬৪। হুগলীর কমিনিস্ট কর্মী শ্রীমদন সাহাকে লেখা চিঠি।

অপ্রচলিত রচনা

ক্ষুধা[১]

দুপুরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল ; আর ভঙ্গ হল কালো মিত্তিরের বহু সাধনালব্ধ ঘুম। বাইরে মোক্ষদা মাসির ক্ষুরধার কণ্ঠস্বর একই মুহূর্তে সমস্ত বস্তিকে উচ্চকিত করে তুলল, কাউকে করল বিরক্ত আর কাউকে করল উৎকর্ণ ; তবু সবাই বুঝল একটা কিছু ঘটেছে। মাসির গর্জন শুনে নীলু ঘোষের পাঁচ বছরের ছেলে তিনু কান্না জুড়ে দিল, আর তার মা যশোদা তাকে চুপ করাবার জন্যে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং সন্তর্পণে কান পেতে রইল মাসির স্বর-সন্ধানের প্রতি। সকলের মধ্যেই একাগ্র হয়ে রইল আগ্রহ ও উত্তেজনা, কিন্তু কেউ ব্যস্ত নয়। কোনো প্রশ্নই কেউ করল না। করতে হয়ও না। কারণ সবাই জানে মাসি একাই একশো—এবং এই একশো জনের প্রচার-বিভাগ আজ পর্যন্ত কারো প্রশ্নের প্রত্যাশা বা অপেক্ষা করে নি। মাসি এক নিশ্বাসে এক ঘটি জল নিঃশেষ ক'রে শুরু করল :

—ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো কণ্টোরালির মুখে। মরণ হয় না রে তোদের ? পয়সা দিয়ে চাল নেব, অত কথা শুনতে হবে কেন শুনি ? আমরা কি তোদের খাসতালুকের পেরজা ? আগুন লেগে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে চালের গুদোম রে। দু'মুঠো চালের জন্যে আমার মান-সম্ভোম সব গেল গো ! আবার টিকিট ক'রেছেন, টিকিট ; বলি ও টিকিটের কী দাম আছে শুনি ? —লক্ষ্মী পিসিকে সম্মুখবর্তী দেখে মাসির স্বর সপ্তমে উঠল :—ও টিকিটে কিচ্ছু হবে না গো, কিচ্ছু হবে না। সোমত্ত বয়েস, সুন্দর মুখ না হলে কি চাল পাবার যো আছে ? আমি হেন মানুষ ভোর থেকে বসে আছি টিকিট আঁকড়ে তিনপ'র বেলা পর্যন্ত, আর আমাকে চাল না দিয়ে চাল দিলে কিনা ও বাড়ির মায়া সুন্দরীকে ! কেন ? তোর সাথে কি মায়ার পিরীত চলছে নাকি ? (তারপর একটা অশ্লীল মন্তব্য)।…

বিনয় এতক্ষণ মাসির বাক্যঝড়কে একরকম উপেক্ষা করেই লিখে

চলেছিল, কিন্তু মায়ার নাম এবং সেই সঙ্গে ওর প্রতি একটা ইতর উক্তি শুনে তার কলম তার অজ্ঞাতসারেই শ্লথ এবং মন্থর হয়ে এল। সে একটু আশ্চর্য হল। সে-আশ্চর্যবোধ মাসির চাল না পাওয়ার জন্যে নয়; বরং এতে সবচেয়ে আশ্চর্য না হওয়ারই কথা, কারণ এ একটা দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু সে আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, মায়া কিনা শেষ পর্যন্ত চাল আনতে গেছল!

বিনয় হয়তো ভাবতে পারল চাল না পাওয়া একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু মাসির কাছে এ একেবারে নতুন ও অপ্রত্যাশিত; কারণ এতদিন পর্যন্ত সে নির্বিবাদে ও নিরঙ্কুশ ভাবে চাল পেয়ে এসেছে এবং আজই তার প্রথম ব্যতিক্রম বলেই সে এতটা মর্মাহত। অন্যান্য দিন যারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে মাসির কাছে দুঃখ জানিয়েছে, মুখে তাদের কাছে সমবেদনা জ্ঞাপন করলেও মনে মনে মাসি এদের অকৃতকার্যতায় হেসেছে; কিন্তু, আজ মাসি ব্যর্থতার দুঃখ অনুভব করলেও যারা তারই মতো ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রতি তার সহানুভূতি দূরে থাক উপরন্তু রাগ দেখা দিল। তাই লক্ষ্মী পিসির উদ্দেশে সে বলল:

—তুই চাল পেলি না কেন রে পোড়ারমুখী?

লক্ষ্মী পিসি মাসির চেয়ে বয়সে ছোট এবং তার প্রতাপে জড়োসড়োও বটে, তাই সে জবাব দিল: কী করব, বল?

মাসি দাঁত খিঁচিয়ে উঠল এবং তারপর কণ্ট্রোলের শাপান্ত এবং বাপান্ত করতে করতে দুপুরটা নষ্ট করতে উদ্যত দেখে বিনয় ঘরে তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। বিনয় এ, আর, পি, সুতরাং সকলের অবজ্ঞেয় এবং গভর্ণমেণ্টের পোষ্য জীব বলে উপহসিত। প্রধানত সেই কারণে, আর তা ছাড়া বিনয়ের রহস্যজনক চলাফেরায় সকলে বিনয়কে এড়িয়ে চলে এবং বিনয় সকলকে এড়িয়ে যায়। কাজেই বিনয়কে বেরোতে দেখে সমবেত নারীমণ্ডলী অর্থাৎ মোক্ষদা, লক্ষ্মী,

যশোদা, আশার মা, পুঁটি, রেণু, হারু ঘোষ এবং ননী দত্তের স্ত্রী প্রভৃতি চঞ্চল হয়ে ঘোমটা টেনে স'রে গেল। তারপর আবার যথারীতি ক্ষুধিত, বঞ্চিত এবং উৎপীড়িত নারীদের সভা চলতে লাগল। কেউ কণ্টোলের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে, কেউ সিভিকগার্ডের অত্যাচারের সম্বন্ধে, কেউ গভর্ণমেণ্টের অবিচার সম্বন্ধে উঁচু-নীচু গলায় আলোচনা করতে লাগল। মাসি এ-সভার প্রধান বক্তা, যেহেতু সে সন্তব্যর্থ এবং সর্বাপেক্ষা আহত, সর্বোপরি তার কণ্ঠস্বরই বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ এবং মার্জিত। ক্রমে আলোচনা কণ্টোল থেকে মায়া-বিনয়ের সম্পর্ক এবং তা থেকে ক্রমশ চুরি-ডাকাতির উপদ্রবে পর্যবসিত হল দেখে যশোদা তার কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে ঘরে ঢুকল, আর তার পেছনে পেছনে তিনু 'মা খেতে দিবি না?' 'কখন ভাত রাঁধবি?' ইত্যাদি বলতে বলতে যশোদার আঁচল ধরে টানতে থাকল আর তার ছোট ছোট মুঠির অজস্র আঘাতে মাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। নীলু ঘোষ আজও কণ্টোল থেকে চাল পায় নি, তাই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ঘরে ফিরেছিল, কিন্তু তিনুর অবিরাম কান্না তাকে বাধ্য করল আর কোথাও চাল পাওয়া যায় কিনা সন্ধান করে দেখতে। তাই সে গামছা হাতে বেরিয়ে পড়ল দূরের কোনো কণ্ট্রোল্ড দোকানের উদ্দেশে। আর ঘরের মধ্যে যশোদা ক্ষুধার্ত সন্তানের হাতে নিপীড়িত হতে লাগল। যশোদা এবং নীলু আজ দু'দিন উপবাসী। নীলু ঘোষ একটা প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করত, মাইনে ছিল পনেরো টাকা। যদিও একমণ চালের দাম কুড়ি টাকা, তবুও নীলু ঘোষ কণ্ট্রোল্ড দোকানের উপর নির্ভর করে চালাতে পারত, যদি চালের প্রত্যাশায় কণ্ট্রোল্ড দোকানে ধর্ণা দিয়ে পর পর কয়েক দিন দেরি ক'রে তার চাকরীটা না যেত। আজ মাসখানেক হল নীলু ঘোষের চাকরী নেই, কিন্তু এতদিন যে সে না-খেয়ে আছে এমন নয়, তবে সম্প্রতি আর চলছে না, আর সেইজন্যেই সে এবং যশোদা দু'দিন ধরে

অনশনে কাটাচ্ছে। যশোদার যা কিছু গোপন সম্বল ছিল তাই দিয়ে গত দু'দিন সে তিনুর ক্ষুধাকে শান্ত করেছে আর কোলের ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বুকের পানীয় দিয়ে। কিন্তু আজ? আজ তার সম্বল ফুরিয়েছে, বক্ষস্থিত পানীয়ও নিঃশেষিত; আর নিজে সে তীব্র বুভুক্ষায় শীর্ণ এবং দুর্বল। অনশন ক'রে সে নিজের প্রতিই যে শুধু অবিচার করেছে, তা নয়, অবিচার করেছে আর একজনের প্রতি—সে আছে তার দেহে, সে পুষ্ট হচ্ছে তার রক্তে, সে প্রতীক্ষা করছে এই আলো-বাতাসময় পৃথিবীতে মুক্তির। তার প্রতি যশোদার দায়িত্ব কি পালিত হল? ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় সে চোখ বুঁজলো, কোলের শিশুটাকে নিবিড় করে চেপে ধরল আতঙ্কিত বুকে। যশোদা ভেবে পায় না কী প্রয়োজন এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে ভীত পৃথিবীতে একটি নতুন শিশুর জন্ম নেবার? অথচ তার আত্মপ্রকাশের দিন নিকটবর্তী।

হারু ঘোষ নীলুর অগ্রজ এবং সে এই বাড়িতেই পৃথক ভাবে থাকে, চাকরী করে চটকলে, মাইনে পঁচিশ টাকা। নীলুর কাছে সে অবস্থাপন্ন, তাই নীলু তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে এবং সম্বোধন করে 'বড়লোক' বলে। দিন সাতেক আগে তিনুর কাছে ঠিক এই রকম উৎপীড়িত হয়ে যশোদা তার সঙ্গতি থেকে একসের চাল কেনবার মতো পয়সা নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছিল কণ্ট্রোল্ড দোকানের দিকে। এই প্রথম সে একাকী পথে বেরুল। লজ্জায়, সংকোচে, অনভ্যাসের জড়তায় শোচনীয় হয়ে উঠল তার অবস্থা। সে আরো সংকটাপন্ন হল যখন কোলের শিশুটা রাস্তার মাঝখানে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। তবু সে ঘোমটার অন্তরালে আত্মরক্ষা করতে করতে কণ্ট্রোল্ড দোকানে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু গিয়ে দেখল সেখানে তার মতো ক্ষুধার্ত নারী একজন নয়, দু'জন নয়, শত-শত, এবং ক্ষুধার তাড়নায় তাদের লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, আব্রু নেই, সংযম নেই, নেই কোনো কিছুই; শুধু আছে ক্ষুধা আর আছে সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির আদিম

প্রবৃত্তি। যার কিছু নেই সেও আহার্য চায়, তারো বাঁচবার অদম্য লিপ্সা। সবকিছু দেখেশুনে যশোদা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চেষ্টা করছিল শিশুটাকে শান্ত করবার আর ডাকছিল সেই ভগবানকে যে-ভগবান অন্তত একসের চাল তাকে দিতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে ভগবানের বদলে উপস্থিত হল হারু ঘোষ। সে কারখানায় ধর্মঘট ক'রে বাড়ি ফিরছিল, এমন সময় পথের মধ্যে ভ্রাতৃবধূকে ঐ অবস্থায় দেখে কেমন যেন বেদনা বোধ করল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যশোদার কাছে গিয়ে ডাকল: বৌমা, এসো। ঠিক এই রকম দুরবস্থার মধ্যে সহসা ভাশুরের হাতে ধরা পড়ে যশোদার অবস্থা হল অবর্ণনীয়। তার ইচ্ছা হল সীতার মতো ভূগর্ভে মিলিয়ে যেতে অথবা সতীর মতো দেহত্যাগ করতে। কিন্তু তা যখন হল না তখন বাধ্য হয়ে ফিরতে হল হারু ঘোষের পেছনে পেছনে।

ঘরে ফিরে হারু ঘোষ স্ত্রীর কাছ থেকে একসের চাল নিয়ে যশোদাকে দিল। বলল: নীলুকে বলো, পুরুষ মানুষ হয়ে যে বৌ-বেটাকে খেতে দিতে পারে না তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

সারাদিন ঘোরাঘুরি ক'রে চাকরী অথবা চাল কোনটাই যোগাড় করতে না পেরে নীলু ঘোষ নিরাশ এবং সন্ত্রস্ত মনে বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা হয়ে গেছে—পথে-পথে নিরন্ধ্র অন্ধকার। স্যাঁৎসেঁতে গলিটার মধ্যে প্রবেশ করতেই মূর্তিময় আতঙ্ক যেন তাকে ঠাণ্ডা হাত দিয়ে স্পর্শ করল। নীলু ঘোষ এক মুহূর্ত থামল, কী যেন ভাবল, তারপর নিঃশব্দে অগ্রসর হল। চুপি চুপি ঘরে ঢুকে সে যা দেখল তাতে সে অবাক হল না, বরং এটাই সে আশা করেছিল। যশোদা তিনুকে ভাত খাওয়াচ্ছে। নীলু নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করল। ভাগ্যিস্ সে চুপি চুপি ঘরে ঢুকেছিল, তাই এমন গোপন ব্যাপারটা সে জানতে পারল। তা হলে এই ব্যাপার? এরা জমানো চাল লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে, আর সে কিনা সারাদিন না খেয়ে ঘুরছে? সে আড়াল থেকে

অনেকক্ষণ লণ্ঠনের আলোয় যশোদার ভালমানুষের মতো মুখখানা দেখল, আর রাগে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে একটি লাথিতে তাকে ধরাশায়ী করতে। কিন্তু সে-জিঘাংসা অতি কষ্টে সে দমন করল; কারণ সে জানে, তারই একজন অদৃশ্য সন্তান যশোদার দেহকে আশ্রয় করে আছে।

নীলু ঘরে ঢুকল। নীলুকে দেখে যশোদা তিনুকে আঁচিয়ে নীলুর জন্যে জায়গা করে ভাত বাড়তে বসল। যশোদাকে ধরা পড়ে এই ভালমানুষী করতে দেখে প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও নীলুর হাসি পেল। কিন্তু তবুও সে খেতে বসল, কারণ খাওয়া তার দরকার। ভাতে হাত দিয়েই সে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল: এ-চাল ছিল কোথায়?

যশোদা সংক্ষেপে উত্তর দিল: আজকে বিকেলে তোমার দাদা দিয়েছেন।

মুহূর্তে সব ওলট-পালট হয়ে গেল নীলুর মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ যশোদার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল: দিয়ে কী বললে? কতদিনের জন্যে চালটা ধার দিল সে-সম্বন্ধে কিছু বলেছে কি?

অতর্কিতে যশোদার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল: না, সে সম্বন্ধে কিছু বলে নি। শুধু বলেছে, যে-পুরুষমানুষ বৌ-বেটাকে খেতে দিতে পারে না তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

যে-কথাটা যশোদা এতক্ষণ ধরে বলবে না বলে ভেবে রেখেছিল সেই কথাটা অসাবধানে বলে ফেলেই সে বিপুল আশঙ্কায় নীলুর মুখের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নীলু হুংকার দিয়ে উঠল:

—কী, আমাকে যে এতবড় অপমান করল তার দেওয়া চাল তুই আমাকে খাওয়াতে বসেছিস, হতভাগী? কে বলেছিল তোকে ঐ বড়লোকের দেওয়া চাল আনতে, এঁ্যা? তুই আমার বৌ হয়ে কিনা ওর কাছে ভিক্ষে করতে গেছিলি? হারামজাদী, খা, তোর ভিক্ষে করে আনা চাল তুই খা—

বলেই ভাতের থালাটা পদাঘাতে দূরে সরিয়ে নীলু ঘোষ হাত ধুয়ে ঘরে এসে যশোদাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চল্লো :

—বেরো পোড়ারমুখী, বেরো আমার ঘর থেকে, তোকে পাশে ঠাঁই দিতেও আমার ঘেন্না করে। যা, তোর পেয়ারের লোকের কাছে শুগে যা—তোর মুখ দেখতে চাই না।

নীলু যশোদাকে বের করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আর যশোদা অত্যন্ত সাবধানে এবং নীরবে এইটুকু সহ্য করল। বারান্দায় ভিজে মাটির ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশের অজস্র তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যশোদার চোখ জলে ভরে এল, ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল। আর হারু ঘোষ ঘরে শুয়ে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ; কারণ অপরাধ তো তারই, সেই তো ওদের কষ্টে ব্যথিত হয়ে এই কাণ্ডটা ঘটাল।

তার পরদিনই কোথা থেকে যেন নীলু পাঁচ সের চাল নিয়ে এল। সেই চালে ক'দিন চলার পর দু'দিন হল ফুরিয়ে গেছে, তাই দু'দিন ধরে যশোদা অনাহারে আছে। এ ক'দিন সবই হয়েছে, কেবল নীলু এবং যশোদার মধ্যে কোনো কথোপকথন হয় নি। শুধু নীলু মাঝে মাঝে চুপি চুপি তিনুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে : হ্যাঁ রে খোকা, তোর মা ভাত খেয়েছে তো রে ? অজ্ঞ তিনু খুশিমত কখনো 'হ্যাঁ' বলেছে, কখনো 'না' বলেছে।

কাল নীলু পরিমিত পয়সা নিয়ে গিয়েও কণ্ট্রোল্ড দোকান থেকে বেলা হয়ে যাওয়ার জন্যে চাল না নিয়ে ফিরে এসেছিল। নীলুর ওপর যশোদার এজন্যে রাগই হয়েছিল, কিন্তু আজ মোক্ষদা মাসির কাছ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে তিনুর অজস্র মুষ্টিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করে সে ভাবতে লাগল, দোষ নীলুর নয়, তার ভাগ্যের নয়, দোষ মুষ্টিমেয় লোকের, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে অথচ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে না তাদের।

এদিকে হারু ঘোষের মিলের কর্তৃপক্ষ তাদের দাবী না মানায় হারুর জীবনযাত্রাও চলা কষ্টকর হয়েছে। তার চাল ফুরিয়ে গেছে চার পাঁচ দিন হল। রোজ এর-ওর কাছ থেকে ধার করে চলছে, তাকেও কণ্ট্রোল্ড দোকানের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। আজ প্রভাত হবার আগে হারু এবং নীলু উভয়েই বেরিয়ে পড়েছিল, উভয়ের ঘরেই চাল নেই। উভয়েই তাই কণ্ট্রোল্ড দোকানের লাইনের প্রথমে দাঁড়াবার জন্যে গিয়ে দেখে, তারা প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে। তার আগেই বহু লোক সমবেত।

কাল পর্যন্ত যা ছিল সম্বল তাই দিয়েই যশোদা তিনুকে ক্ষুধার জ্বালা থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আজ যখন ক্ষুধার জ্বালায় তিনু মাকে মারা ছেড়ে দিয়ে মাটি খেতে শুরু করল তখন আর সহ্য হল না যশোদার। তিনুকে কোলে নিয়ে ছুটে গেল হারু ঘোষের স্ত্রীর কাছে, গিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল :

—দিদি আমার ছেলেকে বাঁচাও, দু'মুঠো চাল দিয়ে রক্ষা কর একে, তোমার তো ছেলেমেয়ে নেই, তুমি তো ইচ্ছা করলে আর একবেলা না খেয়ে থাকতে পার, কিন্তু এর শিশুর প্রাণ আর সইতে পারছে না দিদি! দিদি, এর মুখের দিকে একবার তাকাও। তোমার শ্বশুরকুলের প্রদীপটিকে নিভতে দিও না।

বলেই যশোদা তার দিদির পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তিনুও তার মা'র কাণ্ড দেখে কান্না ভুলে গেল। যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করার পরও দিদির নারীসুলভ হৃদয় উদ্বৃত্ত তণ্ডুলাংশটুকু না দিয়ে পারল না।

সেইদিন রাত্রে। সমস্ত দিন হাঁটাহাঁটি করেও ভ্রাতৃদ্বয় চাল অথবা পয়সা কিছুই যোগাড় করতে না পেরে ক্ষুণ্ণমনে বাড়িতে ফিরল। বাড়িতে ঢুকে নীলু ঘোষ সব চুপচাপ দেখে বারান্দায় বসে বিড়ি টানছিল, এমন সময় হারু ঘোষের প্রবেশ। বাড়িতে পদার্পণ করেই এই ঘটনা শুনে ক্ষুধিত হারু ঘোষ স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতায় জ্বলে উঠল :

—কে বলেছিল ওদের দয়া করতে? ওদের ছেলে মারা গেলে আমাদের কী? নিজেরাই খেতে পাই না, তায় আবার দান-খয়রাত, ওদের চাল দেওয়ার চেয়ে বেড়াল-কুকুরকে চাল দেওয়া ঢের ভাল, ওই বেইমান নেমক-হারামের বৌকে আবার চাল দেওয়া! ও আমার ভাই! ভাই না শত্তুর! চাল কি সস্তা হয়েছে, না, বেশী হয়েছে যে তুমি আমায় না বলে চাল দাও!

সঙ্গে সঙ্গে হারু ঘোষের স্ফুলিঙ্গ নীলু ঘোষের বারুদে সঞ্চারিত হল মুখের বিড়িটা ফেলে বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়াল নীলু ঘোষ। চকিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে চীৎকার করে উঠল— কী, আবার? বড্ড খিদে তোর, না? দাঁড়া তোর খিদে ঘুচিয়ে দিচ্ছি—বলেই প্রচণ্ড এক লাথি। বিকট আর্তনাদ করে যশোদা লুটিয়ে পড়ল নীলু ঘোষের পায়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল হারু ঘোষ, মোক্ষদা মাসি, লক্ষ্মী পিসি, হারুর স্ত্রী, আশার মা, পুঁটি, রেণু, কালো মিত্তির, বিনয়, মায়া ইত্যাদি সকলে। ডাক্তার, আলো, পাখা, জল, এ্যাম্বুলেন্স, টেলিফোন প্রভৃতি লোকজন-শব্দকোলাহল নীলুকে কেমন যেন আচ্ছন্ন এবং বিমূঢ় করে ফেলল। সে স্তব্ধ হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। যশোদাকে কখন যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল নীলুর অচৈতন্য মনের পটভূমিতে তার চিহ্ন রইল না। ঘর ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর নীলুর মন কেমন যেন শূন্যতায় ভরে গেল, আস্তে আস্তে মনে পড়ল একটু আগের ঘটনা। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল যশোদার পরিত্যক্ত জীর্ণ বিছানায়, যশোদার চুলের গন্ধময় বালিশটাকে আঁকড়ে ধরল সজোরে। সব চুপ-চাপ। শুধু তাঁর হৃৎপিণ্ডের দ্রুততালে ধ্বনিত হতে থাকল বুভুক্ষার ছন্দ আর আসন্ন মৃত্যুর দ্রুততর পদধ্বনি। সমস্ত আশা এবং সমস্ত অবলম্বন আজ দারিদ্র্য ও অনশনের বলিষ্ঠ দুই পায়ে দলিত, নিঃশেষিত। ...সুতরাং?...অন্ধকারে নীলু ঘোষের দু'চোখ একবার

শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠে নিভে গেল। আকাশে শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন—প্রহরী বিমানের নৈশ পরিক্রমা।

আর হারু ঘোষ? শ্রান্ত, অবসন্ন হারু ঘোষের মনেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। ক্ষুধিত হারু ঘোষ অন্ধকারে নিশাচরের মতো নিঃশব্দ পদচারণায় সারা উঠোনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেওয়ালে নিজের ছায়া দেখে থমকে দাঁড়ায়—তারপর আবার ঘুরতে থাকে। একে একে প্রত্যেক ঘরের আলো নিভে যায়, অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে, রাত গভীরতর হয়, তবু হারু ঘোষের পদচারণার বিরাম নেই। অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে হারু ঘোষ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে অনুভব করতে থাকে কিসের যেন অশরীরী আবির্ভাব; অত্যন্ত ভীত, অত্যন্ত অসহায় ভাবে তাকায় আকাশের দিকে, সেখানে লক্ষ লক্ষ চোখে আকাশ ভর্ৎসনা জানায়—ক্ষমা নেই। হারু ঘোষ উন্মাদ হয়ে উঠল—আকাশ বলে ক্ষমা নেই, দেওয়ালের ছায়া বলে ক্ষমা নেই, তার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুতস্বরে ঘোষণা করতে থাকে ক্ষমা নেই। তার কানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্বরে ধ্বনিত হতে থাকে—ক্ষমা নেই।... ...

ভোরের দিকে মোক্ষদা মাসি ফিরে এল হাসপাতাল থেকে। অত্যন্ত সন্তর্পণে ফিস ফিস করে হারু ঘোষ জিজ্ঞাসা করল—কী খবর?

মোক্ষদা মাসির মতো মুখরাও মূক, মুহ্যমান—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে জানালে, বেঁচে নেই। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল তার ঘরের দিকে।

হারু ঘোষের সারা দেহে চাবুকের মতো চমকে উঠল আর্তনাদ; শরীর-মন এক সঙ্গে টলে উঠল, সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে বয়ে গেল অগ্নিময় প্লাবন। রাত শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। পাণ্ডুর আকাশের দিকে তাকিয়ে হারু ঘোষ নিজেও এবার অনুভব করল: ক্ষমা নেই।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই বিনয় সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে, মায়া অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাকে ডাকছে। বেশ বেলা যে হয়ে গেছে চারিদিকের তীব্র রোদ্দুর তারই বিজ্ঞাপন। কালকের দুর্ঘটনার জন্যে তার ঘুম আসতে বেশ দেরী হয়েছিল, সুতরাং বেলায় যে ঘুম ভাঙবে এটা জানা কথা, কিন্তু সেজন্যে মায়ার এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই; তবু একটা 'কারণ' মনে মনে সন্দেহ করে বিনয় পুলকিত হল। মৃদু হেসে বলল: দাঁড়াও, উঠছি—তুমি যে একেবারে ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে এসেছ দেখছি।

উঃ, কী কুঁড়ে আপনি, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি, এদিকে কী ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে তা তো জানেন না—

বিনয় কৃত্রিম গাম্ভীর্য ও বিস্ময়ের ভান করে বলল: বটে? কী রকম?

মায়া এক নিশ্বাসে বলে গেল: যশোদা কাকীমা কাল রাত্তিরে হাসপাতালে মারা গেছে, আর আজ সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখে, হারু কাকা, নীলু কাকা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

প্রচণ্ড বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-তাড়নায় বিনয় এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল: এঁ্যা, বল কি?

তারপর দ্রুত হাতে এ, আর, পি,-র নীল কোর্তাটা গায়ে চড়িয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অগণিত কৌতূহলী জনতা উঠোন-বারান্দা ভরিয়ে তুলেছে। পুলিশ, জমাদার, ইন্সপেক্টরের অপ্রতিহত প্রতাপ। তারই মধ্যে দিয়ে বিনয় চেয়ে দেখল, হারু ঘোষ বারান্দায় আর নীলু ঘোষ ঘরে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে চিরকালের মতো ব্যঙ্গ করে বীভৎস ভাবে ঝুলছে, যেন জিভ ভেংচাচ্ছে আসন্ন দুর্ভিক্ষকে।

বিপুল জনতা আর ঐ অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে বিনয় বস্তি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল, আপন মনে পথ চলতে সুরু করল, ভাবতে লাগল: দুর্ভিক্ষ যে লেগেছে তার সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত কি এই

নয়? আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে লাভার মতোই তলে তলে উত্তপ্ত হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, প্রতীক্ষা করছে বিপুল বিস্ফোরণের; সেই অনিবার্য অগ্ন্যুৎপাতের সূচনা দেখা গেল কাল রাত্রে। অথচ প্রত্যেকে গোপন করে চলেছে সেই অগ্নি-উদ্গীরণের প্রকম্পনকে আর তার সম্ভাবনাকে। আস্তে আস্তে ধ্বসে যাচ্ছে জীবনের ভিত্তি, ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে ক্ষুধার নগ্নরূপ। তবু অদ্ভুত ধৈর্য মানুষের; সমাজকে, সভ্যতাকে বাঁচাবার চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

বিনয় এক সময়ে এসে দাঁড়াল পাড়ার কণ্ট্রোল্ড দোকানের সামনে। অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল তার; দেখল, মোক্ষদা মাসি, লক্ষ্মী পিসি, মায়া সবাই সেখানে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে। বিনয় বিস্মিত হল। আর একটু আগে মোক্ষদা মাসিকে সে শোক করতে দেখে এসেছিল, অথচ নিয়তির মতো ক্ষুধা সুযোগ পর্যন্ত দিল না পরিপূর্ণ শোক করবার। মায়ার সঙ্গে চোখাচোখি হতে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল সে। অদ্ভুত ক্ষুধার মাহাত্ম্য! বিনয় ভাবতে থাকল: ক্ষুধা শোক মানে না, প্রেম মানে না, মানে না পৃথিবীর যে-কোন বিপর্যয়, সে আদিম, সে অনশ্বর।

লাইনবন্দী প্রত্যেকে প্রতীক্ষা করছে চালের জন্যে। বিনয় ভাবল, এ-প্রতীক্ষা চালের জন্যে, না বিপ্লবের জন্যে? বিনয় স্পষ্ট অনুভব করল এরা বিপ্লবকে পরিপুষ্ট করছে, অনিবার্য করে তুলছে প্রতিদিনকার ধৈর্যের মধ্যে দিয়ে। আর এদের অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা করছে তারই পূর্ণ আয়োজন। এরা একত্র, অথচ এক নয়; এরা প্রতীক্ষমান, তবু সচেষ্ট নয়, এরা চাইছে এতটুকু চেতনার আগুন ..... এদের মধ্যে আত্মগোপনকারী, ছদ্মবেশী ক্রমবর্ধমান ক্ষুধাকে প্রত্যক্ষ করে বিনয় এদের সংহত, সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করে সেই আগুন জ্বালার প্রতিজ্ঞা নিল।

দুর্বোধ্য[২]

সহর ছাড়িয়ে যে-রাস্তাটা রেল-স্টেশনের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার ওপরে একটা তেঁতুল গাছের তলায় লোকটিকে প্রতিদিন একভাবে দেখা যায়—যেমন দেখা যেতো পাঁচ বছর আগেও। কোনো বিপর্যয়ই লোকটিকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি যতদূর জানা যায়। এই স্থাণু বৃদ্ধ লোকটি অন্ধ, ভিক্ষাবৃত্তি তার একমাত্র জীবিকা তার সামনে মেলা থাকে একটা কাপড়, যে কাপড়ে কিছু না কিছু মিলতই এতকাল—যদিও এখন কিছু মেলে না। লোকটি অন্ধ, সুতরাং যে তাকে এই জায়গাটা বেছে দিয়েছিল তার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়, যেহেতু এখানে জন-সমাগম হয় খুব বেশী এবং তা রেল-স্টেশনের জন্যেই। সমস্ত দিনরাত এখানে লোক-চলাচলের বিরাম নেই, আর বিরাম নেই লোকের কথা বলার। এই কথাবলা যেন জনস্রোতের বিপুল কল্লোলধ্বনি, আর সেই ধ্বনি এসে আছড়ে পড়ে অন্ধের কানের পর্দায়। লোকটি উন্মুখ হয়ে থাকে—কিছু মিলুক আর নাই মিলুক, এই কথাশোনাই তার লাভ। নিস্তব্ধতা তার কাছে ক্ষুধার চেয়েও যন্ত্রণাময়।

লোকটি সারাদিন চুপ করে বসে থাকে মূর্তিমান ধৈর্যের মতো। চিৎকার করে না, অনুযোগ করে না, উৎপীড়িত করে না কাউকে। প্রথম প্রথম, সেই বহুদিন আগে, লোকে তার নীরবতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক কিছু দিত। সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ যখন তার কাছে সূর্যের তাপ আর লোকজনের কথাবার্তার অস্তিত্ব থাকত না, তখন সে বিপুল কৌতূহল আর আবেগের সঙ্গে কাপড় হাতড়ে অনুভব করত চাল, পয়সা, তরকারী··· । তৃপ্তিতে তার অন্ধ দু'চোখ অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠত। তারপরে সেই অন্ধকারেই একটা নরম হাত এসে তার শীর্ণ হাতটাকে চেপে ধরত—যে-হাত আনতো অনেক আশ্বাস আর অনেক রোমাঞ্চ। বৃদ্ধ তাঁর উপার্জন গুছিয়ে নিয়ে সেই নরম হাতে আত্মসমর্পণ করে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যেত। তারপর ভোর

হবার আগেই সেই হাতেই ভর করে গাছের তলায় এসে বসত। এমনি করে কেটেছে পাঁচ বছর।

কিন্তু দুর্ভিক্ষ এল অবশেষে। লোকের আলাপ-আলোচনা আর তার মেলে-ধরা কাপড়ের শূন্যতা বৃদ্ধকে সে-খবর পৌঁছে দিল যথাসময়ে।

—কুড়ি টাকা মণ দরেও যদি কেউ আমাকে চাল দেয় তো আমি এক্ষুণি নগদ কিনতে রাজি আছি পাঁচ মণ—বুঝলে হে—

উত্তরে আর একটি লোক কি বলে তা শোনা যায় না, কারণ তারা এগিয়ে যায় অনেক দূর ··

—আরে ভাবতিছ কী ভজহরি, এবার আর বৌ-বেটা নিয়ে বাঁচতি অবে না—

—তা যা বলিছ নীলমণি···

বৃদ্ধ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু আর কিছু শোনা যায় না। শুধু একটা প্রশ্ন তার মন জুড়ে ছটফট করতে থাকে—কেন, কেন? বৃদ্ধের ইচ্ছা করে একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে—কেন চালের মণ তিরিশ টাকা, কেন যাবে না বাঁচা?—কিন্তু তার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কে এই অন্ধ বৃদ্ধকে বোঝাবে পৃথিবীর জটিল পরিস্থিতি? শুধু বৃদ্ধের মনকে ঘিরে নেমে আসে আশংকার কালো ছায়া। আর দুর্দিনের দুর্বোধ্যতায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে দিনের পর দিন। অজন্মা নয়···প্লাবন নয় · তবু দুর্দিন, তবু দুর্ভিক্ষ? শিশুর মতো সে অবুঝ হয়ে ওঠে; জানতে চায় না, বুঝতে চায় না—কেন দুর্দিন, কেন দুর্ভিক্ষ—শুধু সে চায় ক্ষুধার আহার্য। কিন্তু দিনের শেষে যখন কাপড় হাতড়ে সে শুকনো গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই পায় না, তখন সারাদিনের নিস্তব্ধতা ভেঙে তার আহত অবরুদ্ধ মন বিপুল বিক্ষোভে চিৎকার করে উঠতে চায়, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে-শক্তি কোথায়? খানিক পরে সেই নরম হাতে তার অবসন্ন শিথিল হাত নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তুলে দেয়। আর ক্রমশ অন্ধকার তাদের গ্রাস করে।

একদিন বৃদ্ধের কানে এল : ফেণীতে যে আবার বোমা পড়ছে, ত্রিলোচন—

উত্তরে আর একটি লোকের গলা শোনা যায় : বল কী হে, ভাবনার কথা—

দ্বিতীয় ব্যক্তির দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও অন্ধ বৃদ্ধের মনে কোনো চাঞ্চল্য দেখা দিল না। তার কারণ সে নির্ভীক নয়, সে অজ্ঞ। কিন্তু সে যখন শুনল :

—ঘনশ্যামের বৌ চাল কিনতে গিয়ে চাল না পেয়ে জলে ডুবে মরেছে, সে-খবর শুনেছ শচীকান্ত ?

তখন শচীকান্তের চেয়ে বিস্মিত হল সে। শূন্য কাপড় হাতড়ে হাতড়ে দুর্দিনকে মর্মে মর্মে অনুভব করে বৃদ্ধ, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে অনেক বেশী ক্লান্ত করে তোলে ; প্রতিদিন।

তারপর একদিন দেখা গেল বৃদ্ধ তার নীরবতা ভঙ্গ করে ক্ষীণ-কাতর স্বরে চিৎকার করে ভিক্ষে চাইছে আর সেই চিৎকার আসছে ক্ষুধার যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে। সেই চিৎকারে বিরক্ত হয়ে কেউ কিছু দিল, আর কেউ বলে গেল :

—নিজেরাই খেতে পাই না, ভিক্ষে দেব কী করে ?

একজন বলল : আমরা পয়সা দিয়ে চাল পাই না, আর তুমি বিনি পয়সায় চাল চাইছ ? বেশ জোচ্চুরি ব্যবসা জুড়েছ, বাবা !

আবার কেউ বলে গেল : চাইছ একটা পয়সা, কিন্তু মনে মনে জানো এক পয়সা মিলবে না, কাজেই ডবল পয়সা দেবে, বেশ চালাক যা হোক !

এইসব কথা শুনতে শুনতে সেদিন কিছু পয়সা পাওয়া গেল এবং অনেকদিন পর এই রোজগার তার মনে ভরসা আর আনন্দ এনে দিল। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত প্রতীক্ষার পরও সেইদিন আর সেই কোমল হাত তার হাতে ধরা দিল না। দুর্ভাবনায় আর উৎকণ্ঠায় বহু সময়

কাটার পর অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে চমকে উঠে সে হাতড়াতে লাগল, আর খুঁজতে লাগল একটা কোমল নির্ভরযোগ্য হাত। আস্তে আস্তে একটা আতঙ্ক দেখা দিল—অপরিসীম বেদনা ছড়িয়ে পড়ল তার মনের ফসলকাটা মাঠে। বহুদিন পরে দেখা দিল তার অন্ধতাজনিত অক্ষমতার জন্যে অনুশোচনা। রোরুদ্যমান মনে কেবল একটা প্রশ্ন থেকে থেকে জ্বলে উঠতে লাগল : পাঁচ বছর আগে যে এইখানে এনে বসিয়েছে পাঁচ বছর পরে এমন কী কারণ ঘটেছে যার জন্যে সে এখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে না ?—তার অনেক প্রশ্নের মতোই এ প্রশ্নেরও জবাব মেলে না। শুধু থেকে থেকে ক্ষুধার যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তোলে।

তারপর আরো দুদিন কেটে গেল। চিৎকার করে ভিক্ষা চাইবার ক্ষমতা আর নেই, তাই সেই পয়সাগুলো আঁকড়ে ধ'রে সে ধুঁকতে থাকল। আর দু-চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ফোঁটা ফোঁটা জল। দু-হাতে পেট চেপে ধ'রে তার সেই গোঙানী, কারো কানে পৌঁছুলো না। কারণ কারুর কাছেই এ-দৃশ্য নতুন নয়। আর ভিখিরীকে করুণা করাও তাদের কাছে অসম্ভব। যেহেতু দুর্ভিক্ষ কত গভীর, আর কত ব্যাপক'!

বিকেলের দিকে যখন সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল অবসন্ন হয়ে,তখন একটা মিলিত আওয়াজ তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল ; ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হল। তার অতি কাছে হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল : অন্ন চাই—বস্ত্র চাই…। হাজার হাজার মিলিত পদধ্বনি আর উন্মত্ত আওয়াজ তার অবসন্ন প্রাণে রোমাঞ্চ আনল—অদ্ভুত উন্মাদনায় সে কেঁপে উঠল থর্‌থর্‌ করে। লোকের কথাবার্তায় বুঝল : তারা চলেছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে চাল আনতে। অন্ধ বিস্মিত হল—তারই প্রাণের কথা হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—তারই নিঃশব্দ চিৎকার এদের চিৎকারে মূর্ত হচ্ছে ! তা হলে এত লোক, প্রত্যেকেই তার মতো ক্ষুধার্ত, উপবাসখিন্ন ? একটা অজ্ঞাত

আবেগ তার সারাদেহে বিদ্যুতের মতো চলাফেরা করতে লাগল, সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। এত লোক, প্রত্যেকের ক্ষুধার যন্ত্রণা সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে লাগল, তাই অবশেষে সে বিপুল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে পারল না, কেবল একবার মাত্র তাদের সঙ্গে "অন্ন-চাই" বলেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।...

সেই রাত্রে একটা নরম হাত বৃদ্ধের শীতল হাতকে চেপে ধরল; আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে সে তার কোঁচড়ে ভরা চাল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

●

ভদ্রলোক[৩]

"শিয়ালদা—জোড়া-মন্দির—শিয়ালদা" তীব্র কণ্ঠে বার কয়েক চিৎকার করেই সুরেন ঘণ্টি দিল 'ঠন্ ঠন্' করে। বাইরে এবং ভেতরে, ঝুলন্ত এবং অনন্ত যাত্রী নিয়ে বাসখানা সুরেনের 'যা-ওঃ, ঠিক হ্যায়' চিৎকার শুনেই অনিচ্ছুক ও অসুস্থা নারীর মতো গোঙাতে গোঙাতে অগ্রসর হল। একটানা অস্বস্তিকর আওয়াজ ছড়াতে লাগল—উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ।

"টিকিট, বাবু, টিকিট আপনাদের"—অপরূপ কৌশলের সঙ্গে সেই নিশ্ছিদ্র ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সুরেন প্রত্যেকের পয়সা আদায় করে বেড়াতে লাগল। আগে ভিড় তার পছন্দ হ'ত না, পছন্দ হ'ত না অনর্থক খিটির-মিটির আর গালাগালি। কিন্তু ড্রাইভারের ক্রমাগত প্ররোচনায় আর কমিশনের লোভে আজকাল সে ভিড় বাড়াতে 'লেট'-এরও পরোয়া করে না। কেমন যেন নেশা লেগে গেছে তার :

পয়সা- আরো পয়সা ; একটি লোককে, একটি মালকেও সে ছাড়বে না বিনা পয়সায়।

অথচ দু'মাস আগেও সুরেন ছিল সামান্য লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলে। দু'মাস আগেও সে বাসে চড়েছে কন্‌ডাক্‌টার হয়ে নয়, যাত্রী হয়ে। দু'মাসে সে বদলে গেছে। খাকির জামার নীচে ঢাকা পড়ে গেছে ভদ্রলোকের চেহারাটা। বাংলার বদলে হিন্দি বুলিতে হয়েছে অভ্যস্ত। হাতের রিস্টওয়াচটাকে তবুও সে ভদ্রলোকের নিদর্শন হিসাবে মনে করে ; তাই ওটা নিয়ে তার একটু গর্বই আছে। যদিও কন্‌ডাক্‌টারী তার সয়ে গেছে, তবুও সে নিজেকে মজুর বলে ভাবতে পারে না। ঘামে ভেজা খাকির জামাটার মতোই অস্বস্তিকর ঐ 'মজুর' শব্দটা।

—এই কন্‌ডাক্‌টার, বাঁধো, বাঁধো। একটা অতিব্যস্ত প্যাসেঞ্জার উঠে দাঁড়াল। তবুও সুরেন নির্বিকার। বাস 'স্টপেজ' ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। লোকটি খাপ্পা হয়ে উঠল : কী শুনতে পাওনা না কি তুমি ?

সুরেনও চোখ পাকিয়ে বলল : আপনি 'তুমি' বলছেন কাকে ?

—তুমি বলব না তো কি 'হুজুর' বলব ? লোকটি রাগে গজগজ করতে করতে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল। প্যাসেঞ্জারদেরও কেউ কেউ মন্তব্য করল : কন্‌ডাক্‌টাররাও আজকাল ভদ্দরলোক হয়েছে, কালে কালে কতই হবে।

একটি পান-খেকো লুঙ্গিপরা লোক, বোধ হয় পকেটমার, হেসে কথাটা সমর্থন করল। বলল : মার না খেলে ঠিক থাকে না শালারা, শালাদের দেমাক হয়েছে আজকাল

আগুন জ্বলে উঠল সুরেনের চোখে। নাঃ, একদিন নির্ঘাৎ মারামারি হবে।…একটা প্যাসেঞ্জার নেমে গেল। ধাঁই-ধাঁই বাসের গায়ে দু'তিনটে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল সুরেন : যা-ওঃ। রাগে গরগর করতে করতে সুরেন ভাবল : ওঃ, যদি মামা তাকে না তাড়িয়ে

দিত বাড়ি থেকে! তা হলে কি আর··· কি এমন আর অপরাধ করেছিল সে? ভাড়াটেদের মেয়ে গৌরীর সঙ্গে প্রেম করা কি গো-মাংস খাওয়ার মতো অপরাধ? উনিশ বছর বয়সে থার্ডক্লাশেও উঠে প্রেম করে না কোন মহাপুরুষ?

—এই শালা শুয়ার কি বাচ্চা, ড্রাইভারের সঙ্গে সুরেনও চেঁচিয়ে উঠল। একটুকুর জন্যে চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল লোকটা। আবার ঘন্টি দিয়ে সুরেন চেঁচিয়ে উঠল: যা-ওঃ, ঠিক হ্যায়। লোকটার ভাগ্যের তারিফ করতে লাগল সমস্ত প্যাসেঞ্জার।

সুরেনকে কিছুতেই মদ খাওয়াতে পারল না রামচরণ ড্রাইভার। সুরেন বোধহয় এখনো আবার ভদ্রলোক হবার আশা রাখে। এখনো তার কাছে কুৎসিত মনে হয় রামচরণদের ইঙ্গিতগুলো। বিশেষ করে বীভৎস লাগে রাত্রি বেলায় অনুরোধ। ওরা কত করে গুণ ব্যাখ্যা করে মদের: মাইরি মাল না টানলে কি দিনভোর এমন গাড়ি টানা যায়? তুই খেয়ে দেখ, দেখবি সারাদিন কত ফুর্তিতে কাজ করতে পারবি। তাই নয়? কি বল গো পাঁড়েজী?

পাঁড়েজী ড্রাইভার মাথা নেড়ে রামচরণের কথা সমর্থন করে। অনুরোধ ক'রে ক'রে নিষ্ফল হয়ে শেষে রামচরণ রুখে উঠে ভেঙচি কেটে বলে: এঃ, শালা আমার গুরু-ঠাকুর এয়েছেন।

সুরেন মৃদু হেসে সিগারেট বার করে।

যথারীতি সেদিনও "জোড়া-মন্দির—জোড়া-মন্দির" বলে হাঁকার পর গাড়ি ছেড়ে দিল। উঁ-উঁ-উঁ শব্দ করতে করতে একটা স্টপেজে এসে থামতেই সুরেন চেঁচিয়ে উঠল: জল্‌দি করুন বাবু, জল্‌দি করুন। এক ভদ্রলোক উঠলেন স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে। সুরেন অভ্যাস মতো "লেডিস্ সিট ছেড়ে দিন, আপনারা" বলেই আগন্তুকদের দিকে চেয়ে চমকে উঠল—একি. এরা যে তার মামার বাড়ির ভাড়াটেরা!

গৌরীও রয়েছে এদের সঙ্গে। সুরেনের বুকের ভিতরটা ধ্বক্‌-ধ্বক কাঁপতে লাগল বাসের ইঞ্জিনটার মতো। ভাড়াটেবাবু সুরেনকে এক নজর দেখে নিলেন। তাঁর বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটো হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিল : মা, মা, আমাদের সুরেন-দা, 'ঐ ছাখো সুরেন-দা। কী মজা! ও সুরেন-দা, বাড়িতে যাওনা কেন? এঁ্যা?

গাড়ি শুদ্ধ লোকের সামনে সুরেন বিব্রত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ টিকিট দিতেই মনে রইল না তার। ভদ্রলোক ধমকে নিরস্ত করলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সবকিছুই—বন্ধ হয়ে গেল সুরেনের হাঁক ডাক। একবার আড়চোখে তাকাল সে গৌরীর দিকে—সে তখন রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আস্তে আস্তে সে বাকী টিকিটের দামগুলো সংগ্রহ করতে লাগল। বাসের একটানা উঁ-উঁ-উঁ শব্দকে এই প্রথম তার নিজের বুকের আর্তনাদ বলে মনে হল। কন্‌ডাক্‌টারীর দুঃসহ গ্লানি ঘাম হয়ে ফুটে বেরুল তার কপালে।

গৌরীর বিমুখ ভাব সুরেনের শিরায় শিরায় বইয়ে দিল তুষারের ঝড়; দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত মনে হল বাসের ঝাঁকুনি-দেওয়া গতি। বহুদিনের রক্ত-জল-করা পরিশ্রম আর আশা চূড়ান্ত বিন্দুতে এসে কাঁপতে লাগল স্পিডোমিটারের মতো। একটু চাহনি, একটু পলক-ফেলা আশ্বাস, এরই জন্যে সে কাঁধে তুলে নিয়েছিল কন্‌ডাক্‌টারের ব্যাগ। কিন্তু আজ মনে হল বাসের সবাই তার দিকে চেয়ে আছে, সবাই মৃদু মৃদু হাসছে, এমন কি গৌরীর বাবাও। ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা হল সুরেনের টাকাকড়ি-শুদ্ধ কাঁধে ঝোলান ব্যাগটা।

ওরা নেমে যেতেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঘন্টি মেরে দুর্বল স্বরে হাঁকল : যা-ওঃ। কিন্তু 'ঠিক হ্যায়' সে বলতে পারল না। কেবল বার বার তার মনে হতে লাগল; নেহি, ঠিক নেহি হ্যায়।

সেদিন রাত্রে সুরেন মদ খেল, প্রচুর মদ। তারপর রামচরণকে অনুসরণ করল। যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়াই রামচরণের কাজ। সে আজ সুরেনকে পৌঁছে দিল সৌখিন ভদ্রসমাজ থেকে ঘা-খাওয়া ছোটলোকের সমাজে।

দরদী কিশোর[৪]

দোতলার ঘরে পড়ার সময় শতদ্রু আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। জানালা দিয়ে সে দেখতে পায় তাদের বাড়ির সামনের বস্তিটার জন্যে যে নতুন কণ্ট্রোলের দোকান হয়েছে, সেখানে নিদারুণ ভীড়, আর চালের জন্যে মারামারি কাটাকাটি। মাঝে মাঝে রক্তপাত আর মূর্ছিত হওয়ার খবরও পাওয়া যায়। সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে স্কুলের পড়া ভুলে যায়, অন্যায় অত্যাচার দেখে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তবু সে নিরুপায়, বাড়ির কঠোর শাসন আর সতর্কদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা অসম্ভব। যারা চাল না পেয়ে ফিরে যায় তাদের হতাশায় অন্ধকার মুখ তাকে যেন চাবুক মারে, এদের দুঃখ মোচনের জন্য কিছু করতে শতদ্রু উৎসুক হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে মনে প্রাণে। তারই সহপাঠী শিবুকে সে পড়া ফেলে প্রতিদিন চালের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে ছাখে। বেচারার আর স্কুলে যাওয়া হয় না, কোনো কোনো দিন চাল না পেয়েই বাড়ি ফেরে, আর বৃদ্ধ বাপের গালিগালাজ শোনে, আবার মাঝে মাঝে মারও খায়। ওর জন্যে শতদ্রুর কষ্ট হয়। অবশেষে ঐ বস্তিটার কষ্ট ঘোচাতে শতদ্রু একদিন কৃতসংকল্প হল।

কিছুদিনের মধ্যেই শতদ্রুর সহপাঠীরা জানতে পারল শতদ্রুর পরিবর্তন হয়েছে। সে নিয়মিত খেলার মাঠে আসে না, কারুর কাছে

এ্যাডভেঞ্চারের বই ধার চায় না, এমন কী 'হাফ-হলি-ডে'তে 'ম্যাটিনি শো'এ সিনেমায় পর্যন্ত যায় না। একজন ছেলে, শতদ্রু দল ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে, তলে তলে খোঁজ নিয়ে জানলো শতদ্রু কী এক 'কিশোর-বাহিনী' গ'ড়ে তুলেছে। তারা প্রথমে খুব একচোট হাসল, তারপর শতদ্রুকে পেয়েই অনবরত খ্যাপাতে শুরু করল। কিন্তু শতদ্রু আজকাল গ্রাহ্য করে না, সে চুপি চুপি তার কাজ করে যেতে লাগল। বাস্তবিক, আজকাল তার মন থেকে এ্যাডভেঞ্চারের, ক্লাবের আর সিনেমার নেশা মুছে গেছে। সে আজকাল বড় হবার স্বপ্ন দেখছে। তা ছাড়া সবচেয়ে গোপন কথা, সে একজন কম্যুনিষ্টের সঙ্গে মিশে অনেক কিছুই জানতে পারছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে একটা কিশোর-বাহিনীর ভলান্টিয়ার দল গ'ড়ে, বাড়ির সতর্কদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার আশঙ্কা তাকে নিরস্ত করতে পারল না, বরং সে গোপনে কাজ করতে করতে অনুভব করল, সে-ও তো একজন দেশকর্মী। শতদ্রু ভবিষ্যৎ নেতা হবার স্বপ্নে রাঙিয়ে উঠল আর সে খুঁজতে লাগল কঠিন কাজ, আরো কঠিন কাজ, তার যোগ্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। সে আজকাল আর আগের কালের 'শতু' নয়, সে এখন 'কমরেড শতদ্রু রায়'। রুশ-কিশোরদের আত্মত্যাগ আর বীরত্ব শতদ্রুকে অস্থির করে তোলে; সে মুখে কিছু বলে না বটে কিন্তু মনে মনে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল একটা কঠিন কাজ, একটা আত্মত্যাগের সুবর্ণ সুযোগ। অবশেষে সে আত্মত্যাগ করল, কিন্তু তার ফল হল মারাত্মক।

শতদ্রুর কাছ থেকে খবর পেয়ে ভলান্টিয়াররা শতদ্রুদের বাড়িতে উপস্থিত হল। শতদ্রুর বাবা অফিস যাবার আগে খবরের কাগজে শেয়ার মার্কেটের খবর দেখছিলেন, একপাল ছেলেকে ঢুকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

—আমরা 'কিশোর-বাহিনী'র ভলান্টিয়ার। আপনার ছেলের মুখে শুনলাম আপনি নাকি ষাট মণ চাল বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন, সেগুলো বস্তির জন্য দিতে হবে। আমরা অবিশ্যি আধা দরে আপনার চাল বিক্রি করে ষাট মণের দাম দিয়ে দেব। আর তাতে রাজী না হলে আমরা পুলিশের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হব না।

– আমার ছেলে, এ খবর দিয়েছে, না?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—আচ্ছা, নিয়ে যাও।

ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে চাল বের করে আনল। তারা লক্ষ্য করল না, শতদ্রুর বাবার কী জ্বলন্ত চোখ! শতদ্রুর বাবা সেদিন অফিস না গিয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

সেইদিন দুপুরে একটা আর্ত-চিৎকার ভেসে এল বস্তির লোকদের কানে। তারা বুঝল না কিসের আর্তনাদ। বুঝতে পারলে হয়তো সমবেদনায় ব্যথিত হত, কিন্তু তারা সন্থ পাওয়া চাল নিয়েই ব্যস্ত রইল। বহুক্ষণ ধরে অমানুষিক অত্যাচারের পর, শতদ্রুকে তার পড়ার ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হল। কিন্তু শতদ্রু এতে এতটুকু দুঃখিত নয়, এতটুকু অনুশোচনা জাগল না তার মনে। সে ভাবল: এতো তুচ্ছ, এতো সামান্য নিপীড়ন, রুশিয়ার বীরদের অথবা কায়ুর কমরেডদের তুলনায় তার আত্মত্যাগ এমন কিছু নয়। তবু একটা কিছু করার আনন্দে সে শিউরে উঠল, আর এই কান্নায় তার মন পবিত্র শুচিস্নিগ্ধ হল। জানালা দিয়ে সে চেয়ে দেখল যে-বাড়িতে আজ দুদিন উনুনে আগুন পড়ে নি সেখান থেকে উঠছে ধোঁয়া; বহুদিন পরে শিবু হাসিমুখে স্কুল থেকে ফিরছে, আর কণ্ট্রোলের দোকানের লাইনে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত শৃঙ্খলা। কোথাও চাল না-পাওয়ার খবর নেই। সকলের মুখেই হাসি— যেন শতদ্রুর প্রতি অকৃপণ আশীর্বাদ। একটু পরে কান্নার বদলে শতদ্রুর কণ্ঠে গুনগুন করে উঠল 'কিশোর-বাহিনী'র গান।

কিশোরের স্বপ্ন[৩]

রবিবার দুপুরে রিলিফ কিচেনের কাজ সেরে ক্লান্ত হয়ে জয়দ্রথ বাড়ি ফিরে 'বাংলার কিশোর আন্দোলন' বইটা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ল, পড়তে পড়তে ক্রমশ বইয়ের অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে এল, আর সে ঘুমের সমুদ্রে ডুবে গেল।

চারিদিকে বিপুল—ভীষণ অন্ধকার। সে-অন্ধকারে তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, কিন্তু তা বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই জ্বলে উঠল সহস্র সহস্র শিখায় এক বিরাট চিতা ; আর শোনা গেল লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের আর্তনাদ—ভয়ে জয়দ্রথের হাত পা হিম হয়ে যাবার উপক্রম হতেই সে পিছনের দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল—অসহ্য সে আর্তনাদ ; আর সেই চিতার আগুনে তার নিজের হাত-পা-ও আর একটু হলে ঝল্‌সে যাচ্ছিল।

আবার অন্ধকার। চারিদিকে মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কে যেন তার পিঠে একটি শীর্ণ, শীতল হাত রাখল। জয়দ্রথ চমকে উঠল : 'কে ?'

তার সামনে দাঁড়িয়ে সারা দেহ শতচ্ছিন্ন কালো কাপড়ে ঢাকা একটি মেয়ে-মূর্তি। মেয়েটি একটু কেঁপে উঠল, তারপর ক্ষীণ, কাতর স্বরে গোঙাতে গোঙাতে বলল : আমাকে চিনতে পারছ না ? তা পারবে কেন, আমার কি আর সেদিন আছে ? তুমি আমার ছেলে হয়েও তাই আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না···দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে : আমি তোমার দেশ !···

বিস্ময়ে জয় আর একটু হলে মূর্ছা যেত : 'তুমি ?'

'—হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না ?' ম্লান হাসে বাংলা দেশ।

—তোমার এ অবস্থা কেন ?

জয়ের দরদ মাখান কথায় ডুকরে কেঁদে উঠল বাংলা।

—খেতে পাই না বাবা, খেতে পাই না···

—কেন, সরকার কি তোমায় কিছু খেতে দেয় না ?

বাংলার এত দুঃখেও হাসি পেল : 'কোন দিন সে দিয়েছে খেতে ? আমাকে খেতে দেওয়া তো তার ইচ্ছা নয়, চিরকাল না খাইয়েই রেখেছে আমাকে ; আমি যাতে খেতে না পাই, তার বাঁধনের হাত থেকে মুক্তি না পাই, সেজন্যে সে আমার ছেলেদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়ে তাকে টিকিয়েই রেখেছে। আজ যখন আমার এত কষ্ট, তখনও আমার উপযুক্ত ছেলেদের আমার মুখে এক ফোঁটা জল দেবারও ব্যবস্থা না রেখে আটকে রেখেছে—তাই সরকারের কথা জিজ্ঞাসা করে আমায় কষ্ট দিও না······

জয় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে সেই কাপড়ে ঢাকা রহস্যময়ী মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বলে : তোমার ঘোমটা-টা একটু খুলবে ? তোমায় আমি দেখব।

বাংলা তার ঘোমটা খুলতেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক'রে উঠল জয় : উঃ, কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তোমার ! আচ্ছা তোমার দিকে চাইবার মতো কেউ নেই দেশের মধ্যে ?

—না, বাবা। সুসন্তান ব'লে আমার মুখে দুটি অন্ন দেবে ব'লে যাদের ওপর ভরসা করেছিলুম, সেই ছেলেরা আমার দিকে তাকায় না, কেবল মন্ত্রী হওয়া নিয়ে দিনরাত ঝগড়া করে, আমি যে এদিকে মরে যাচ্ছি, সেদিকে নজর নেই, চিতার ওপর বোধহয় ওরা মন্ত্রীর সিংহাসন পাতবে···

—তোমাকে বাঁচাবার কোনো উপায় নেই ?

—আছে। তোমরা যদি সরকারের ওপর ভরসা না করে, নিজেরাই একজোট হয়ে আমাকে খাওয়াবার ভার নাও, তা হলেই আমি বাঁচব···

হঠাৎ জয় ব'লে উঠল : তোমার মুখে ওগুলো কিসের দাগ ?

—এগুলো ? কতকগুলো বিদেশী শত্রুর চর বছর খানেক ধরে

লুটপাট ক'রে, রেল-লাইন তুলে, ইস্কুল-কলেজ পুড়িয়ে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করছিল, এ তারই দাগ। তারা প্রথম প্রথম 'আমার' ভাল হবে বলে আমার নিজের ছেলেদেরও দলে টেনেছিল, কিন্তু তারা প্রায় সবাই তাদের ভুল বুঝেছে, তাই এখন ক্রমশ আমার ঘা শুকিয়ে আসছে। তোমরা খুব সাবধান! ···এদের চিনে রাখ; আর কখনো এদের ফাঁদে পা দিও না আমাকে খুন করতে···

জয় আর একবার বাংলার দিকে ভাল ক'রে তাকায়, ঠিক যেন কলকাতার মরো মরো ভিখিরীর মতো চেহারা হয়েছে। হঠাৎ পায়ের দিকে তাকিয়েই সে চীৎকার ক'রে ওঠে: এ কী?

দেখে পা দিয়ে অনর্গল রক্ত পড়ছে।

—তোমার এ অবস্থা কে করলে?

হঠাৎ বাংলার ক্লান্ত চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, বললে:—জাপান। ···খিদের হাত থেকে যদিও বা বাঁচতুম, কিন্তু এর হাত থেকে বোধহয় বাঁচতে পারব না···

জয় বুক ফুলিয়ে বলে: আমরা, ছোটরা থাকতে তোমার ভয় কী?

'—পারবে? পারবে আমাকে বাঁচাতে?' বাংলা দুর্বল হাতে জয়কে কোলে তুলে নিল।

বাংলার কোলে উঠে জয় আবেগে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

—তুমি কিছু ভেব না। বড়রা কিছু না করে তো আমরা আছি।

বাংলা বলে: তুমি যদি আমাকে বাঁচাতে চাও, তা হলে তোমায় সাহায্য করবে, তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমার মজুর কিষাণ ভাইরা। তারা আমায় তোমার মতোই বাঁচাতে চায়, তোমার মতোই ভালবাসে। আমার কিষাণ ছেলেরা আমার মুখে দুটি অন্ন দেবার জন্যে দিনরাত কী পরিশ্রমই না করছে; আর মজুর ছেলেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে আমার কাপড় যোগাবার জন্যে।

জয় বলে: আর আমরা? তোমার ছোট্ট দুষ্টু ছেলেরা?

বাংলা হাসল, 'তোমরাও পাড়ায় পাড়ায় তোমাদের ছোট্ট হাত দিয়ে আমায় খাওয়াবার চেষ্টা করছ।'

জয় আনন্দে বাংলার বুকে মুখ লুকোয়।

হঠাৎ আকাশ-কাঁপা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। বাংলার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ভয় ফুটে উঠল।

'—ঐ, ঐ তারা আসছে……সাবধান! শত্রুকে ক্ষমা ক'রো না…তা হলে আমি বাঁচব না।' জয় তার ছোট্ট দু'হাত দিয়ে বাংলাকে জড়িয়ে ধরল। কী যেন বলতে গেল সে, হঠাৎ শুনতে পেল তার দিদি তিস্তা তাকে ডাকছে:

—ওরে জয়, ওঠ, ওঠ চারটে বেজে গেছে। তোর কিশোর-বাহিনীর বন্ধুরা, তোর জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

জয় চোখ মেলে দেখে 'বাংলার কিশোর আন্দোলন' বইটা তখনো সে শক্ত ক'রে ধরে আছে।

ছন্দ ও আবৃত্তি[৬]

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, সে এখন অনেকটা সাবালক হয়েছে। পয়ার-ত্রিপদীর গতানুগতিকতা থেকে খুব অল্প দিনের মধ্যেই বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের প্রগতিশীলতায় সে মুক্তি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির আমল থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত এতকাল পয়ার-ত্রিপদীর একচেটিয়া রাজত্বের পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবই বাংলা ছন্দে বিপ্লব এনেছে। মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' মিলের বশ্যতা অস্বীকার করলেও পয়ারের অভিভাবকত্ব ঐ একটি মাত্র শর্তে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু বিহারীলাল প্রভৃতির হাতে যে-সম্ভাবনা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে তা সার্থক হল। শুধু সার্থক হল বললে খুব অল্পই বলা হয়; আসলে, বিহারীলাল প্রভৃতির হাতে যে-সম্ভাবনা লোহা ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে তা ইস্পাতের অস্ত্র হল, রবীন্দ্রনাথের হাতে ছন্দের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতার পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, তবু একটি মাত্র ছন্দের উল্লেখ করব, সে হচ্ছে বলাকার ছন্দ। বাস্তবিক, ঐ একটি মাত্র ছন্দ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্য জীবনে অদ্ভুত ও চমকপ্রদ ভাবে বিকাশ লাভ করে এবং ঐ ছন্দেরই উন্নত পর্যায় শেষের দিকের কবিতায় খুব বেশী রকম পাওয়া যায়। সম্ভবত ঐ ছন্দই রবীন্দ্রনাথকে গদ্য-ছন্দে লেখবার প্রেরণা দেয় এবং তার ফলেই বাংলা ছন্দ বাঁধা নিয়মের পর্দা ঘুচিয়ে আজকাল স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারছে। বোধহয়, একমাত্র এই কারণেই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বলাকা-ছন্দ ঐতিহাসিক।

সত্যেন দত্তের কাছেও বাংলা ছন্দ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। নজরুল ইস্‌লামও স্মরণীয়, নজরুলের ছন্দে ভাদ্রের আকস্মিক প্লাবনের মতো যে বলিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল তা অপসারিত হলেও তার পলিমাটি আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলানোয় সাহায্য করবে।

এঁরা দু'জন বাদে এমন কোনো কবিই বাংলা ছন্দে কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না, যাঁরা নিজেদের আধুনিক কবি বলে অস্বীকার করেন। অথচ কেবলমাত্র ছন্দের দিক থেকেই যে আধুনিক কবিতা অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে এ কথা অমান্য করার স্পর্ধা বা প্রবৃত্তি অন্তত কারো নেই বলেই আমার মনে হয়।

আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রমাণের আবশ্যক বোধহয় নেই। তারপরেই উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু দে, বিশেষ করে আজকাল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছন্দের ঘোড়ার একজন পাকা ঘোড়-সওয়ার, যদিও সম্প্রতি নিষ্ক্রিয়। অমিয় চক্রবর্তী খুব সম্ভব একটা নতুন ছন্দের সূত্রপাত করবেন, কিন্তু তিনি এখনো পর্যন্ত গবেষণাগারে। গদ্য-ছন্দে সমর সেন-ই দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয়। ইতিমধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একখানা চটি বইয়ে ছড়ার ছন্দের উন্নত-ক্রম কত উপভোগ্য হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। বিমলচন্দ্র ঘোষের ঐ ধরনের একখানা বই ঐ কারণেই অতি সুপাঠ্য হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অধুনা আত্ম-সম্বরণ করেছেন, কিন্তু অজিত দত্তের খবর কী? বুদ্ধদেব বসুর ছন্দের ধার দিন দিন কমে যাচ্ছে। তিনি গদ্য-ছন্দে লেখেন না কেন?

অতঃপর অভিযোগ-প্রসঙ্গ—ভাল ছন্দ ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য মনে হচ্ছে। এর প্রতিকারের কোনো উপায় কি নেই? আহার্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাল ছন্দ দুর্লভ হওয়ায় দুটোর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের দুরভিসন্ধি মনের মধ্যে অদম্য হয়ে উঠছে, সুতরাং ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে কবিদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ লক্ষ্য করব। কোনো কোনো কবির ছন্দের আশঙ্কাজনক প্রভাব অধিকাংশ নবজাত কবিকে অজ্ঞাতসারে অথবা জ্ঞাতসারে আচ্ছন্ন করছে, অতএব দুঃসাহস প্রকাশ করেই তাঁদের সচেতন হতে বলছি। খ্যাতনামা এবং অখ্যাতনামা প্রত্যেক কবির কাছেই দাবি করছি, তাঁদের সমস্তটুকু সম্ভাবনাকে পরিশ্রম করে ফুটিয়ে তুলে

বাংলা ছন্দকে সমৃদ্ধ করার জন্যে। এ কথা যেন ভাবতে না হয় রবীন্দ্রনাথের পরে কারো কাছে আর কিছু আশা করবার নেই।

এইবার আবৃত্তির কথায় আসা যাক। ছন্দের সঙ্গে আবৃত্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অথচ ছন্দের দিক থেকে অগ্রসর হয়েও বাংলা দেশ আবৃত্তির ব্যাপারে অত্যন্ত অমনোযোগী। আমি খুব কম লোককেই ভাল আবৃত্তি করতে দেখেছি। ভাল আবৃত্তি না করার অর্থ ছন্দের প্রকৃতি না বোঝা এবং তারও অর্থ হচ্ছে ছন্দের প্রতি উদাসীনতা। ছন্দের প্রতি পাঠকের ঔদাসীন্য থাকলে ছন্দের চর্চা এবং উন্নতি যে কমে আসবে, এতো জানা কথা।

সুতরাং বাংলা ছন্দের উন্নতির জন্যে সুষ্ঠু আবৃত্তির প্রচলন হওয়া দরকার এবং এ বিষয়ে কবিদের সর্বপ্রথম অগ্রণী হতে হবে। অনেক প্রসিদ্ধ কবিকে আবৃত্তি করতে দেখেছি, যা মোটেই মর্মস্পর্শী হয় না। বিশুদ্ধ উচ্চারণ, নিখুঁত ধ্বনি-বিন্যাস, কণ্ঠস্বরের সুনিপুণ ব্যঞ্জনা এবং সর্বোপরি ছন্দ সম্বন্ধে সতর্কতা, এইগুলি না হলে আবৃত্তি যে ব্যর্থ হয় তা তাঁদের ধারণায় আসে না।

আগে আমাদের বাংলা দেশে কবির লড়াই, পাঁচালি, কথকতা ইত্যাদির মধ্যে ছন্দ-শিক্ষার কিছুটা ব্যবস্থা ছিল, যদিও তার মধ্যে ভুল-ত্রুটি ছিল প্রচুর, কিন্তু তার ব্যাপকতা সত্যিই শ্রদ্ধেয় এবং উপায়টাও ছিল সহজ। এখন যদি সেই ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন না-ও হয়, তবুও কবিরা সভা-সমিতিতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সাধারণকে ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান-বিতরণ করতে অনায়াসেই পারেন। এ ব্যবস্থা যে একেবারেই নেই তা নয়, তবে খুবই কম। রেডিও-কর্তৃপক্ষ যদি প্রায়ই কবিদের আমন্ত্রণ ক'রে (নিজেদের মাইনে করা লোক দিয়ে নয়, যাদের থিয়েটারী ঢঙে আবৃত্তি করাই চাকরি বজায় রাখার উপায়) আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে ছন্দ-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তা হলেও জনসাধারণ উপকৃত হয়। সিনেমায় যদি নায়ক-নায়িকা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে

দু'চার লাইন রবীন্দ্রনাথের কি নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে তা হলে কি রসভঙ্গ হবে ?

যদি সত্যিই ছন্দ সম্বন্ধে কাউকে সচেতন করতে হয় তা হলে তা কিশোরদের। তারা ছড়ার মধ্যে দিয়ে তা শিখতে পারে। আর তারা যদি তা শেখে তা হলে ভবিষ্যতে কাউকে আর আবৃত্তি-শিক্ষার জন্যে পত্রিকায় লেখা লিখতে হবে না। কাজেই ভাল আবৃত্তি ও ছন্দের জন্যে একেবারে গোড়ায় জল ঢালতে হবে এবং সেইজন্যে মায়েদের দৃষ্টি এই দিকে দেওয়া দরকার। তাঁরা ঘুম-পাড়ানি গানের সময় কেবল সেকেলে 'ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি' না ক'রে রবীন্দ্রনাথ কি সুকুমার রায়ের ছড়া আবৃত্তি ক'রে জ্ঞান হবার আগে থেকেই ছন্দে কান পাকিয়ে রাখতে পারেন। এ হবে এস্‌রাজ বাজানোর আগে ঠিক সুরে তার বেঁধে নেওয়ার মতো। প্রত্যেক বিদ্যায়তনের শিক্ষকের দায়িত্ব আরো বেশী, কেবলমাত্র তাঁরাই পারেন এ ব্যাপারে সঠিক শিক্ষা দিতে। প্রতিদিন কবিতা মুখস্থ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে, পুরস্কার বিতরণ কি সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ছাত্রদের আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে কি করে ছন্দ পড়তে হয়, আবৃত্তি করতে হয় তা তাঁরা শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষার মতো এ শিক্ষায়ও তাঁরা ফাঁকি দেন।

পরিশেষে আমার মন্তব্য হচ্ছে, গদ্য-ছন্দের যে একটা বিশিষ্ট সুর আছে, সেটাও যে পদ্যের মতোই পড়া যায়, তা অনেকেই জানেন না। কেউ কেউ গল্প পড়ার মতোই তা পড়েন। সুতরাং উভয়বিধ ছন্দ সম্বন্ধে যত্ন নিতে হবে লেখক ও পাঠক উভয়কেই। কবিরা নতুন নতুন আবৃত্তি-উপযোগী ছন্দে লিখলে (যা আধুনিক কবিরা লেখেন না) এবং পাঠকরা তা ঠিকমতো পড়লে তবেই আধুনিক কবিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, উপেক্ষিত আধুনিক কবিতা খেচর অবস্থা থেকে ক্রমশ জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হবে।

বর্ষ-বাণী[৭]

বৈশাখী

(গান)

—আহ্বান—

এসো এসো এসো হে নবীন
এসো এসো হে বৈশাখ,
এসো আলো এসো হে প্রাণ
ডাকো কালবৈশাখীর ডাক।
বাতাসে আনো ঝড়ের সুর
যুক্ত করো নিকট-দূর।
মুক্ত করো শতাব্দীরে দিনের প্রতিদানে,
ঝঞ্ঝা আনো বজ্র হানো বিজলী জ্বাল প্রাণে।
পুরানো দিন তপ্ত বায়ে আজকে ঝ'রে যাক ॥

বসন্তেরই শান্ত বায়ে পল্লবিনী-লতা
তরুর কোলে দোলনরত লজ্জা-অবনতা।
প্রভাতী-ডাকে তাহারে ডাকো
একেলা কানে কানে
প্রলয় সুরে নাট্যশালা ভরিয়া তোল গানে।
মেঘের বুকে কাজল আঁকো,
জাগাও ঘূর্ণিপাক ॥

নিঃস্ব করো বিশ্ব ভুবন দুঃখ-দহন-তাপে
শুষ্ক করো রুক্ষ করো কঠিন অভিশাপে।

সে সন্ন্যাসী একেলা আসি
রিক্ত-ঝুলি হ'তে
দিলে যে দান জ্বলিল প্রাণ
পুড়িল আরও ওতে।
তৃষ্ণাময়ী ধরণী আজি করুণা মাগে তব
নবীনপ্রাণ, নবীনদান আনো হে নব নব।
পিছনে তাই বৈশাখী ঝড় আশাসে তুলে হাঁক

গান[৮]

যেমন ক'রে তপন টানে জল
তেমনি ক'রে তোমায় অবিরল
টানছি দিনে দিনে
তুমি লও গো আমায় চিনে
শুধু ঘোচাও তোমার ছল॥

জানি আমি তোমায় বলা বৃথা
তুমি আমার আমি তোমার মিতা,
রুদ্ধ দুয়ার খুলে
তুমি আসবে নাকো ভুলে
থামবে নাকো আমার চলাচল॥

জনযুদ্ধের গান[৯]

জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ,
জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন
মিলেছে ভারত আর বীর মহাচীন।
সাম্যবাদীরা আজ মহাক্রুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ ॥
জনগণ শক্তির ক্ষয় নেই,
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।
নিষ্ক্রিয়তায় তবে কেন মন মগ্ন
কেড়ে নাও হাতিয়ার, শুভলগ্ন।
করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ ;
শুরু করো, প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ ॥

গান[১০]

আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে
আমরা কিশোর বীর।
আজ বাংলার ঘরে ঘরে আমরা যে সৈনিক মুক্তির।
সেবা আমাদের হাতের অস্ত্র
দুঃখীকে বিলাই অন্ন বস্ত্র
দেশের মুক্তি-দূত যে আমরা
স্ফুলিংগ শক্তির।

"আমরা আগুন জ্বালাব মিলনে
পোড়াব শত্রুদল
আমরা ভেঙেছি চীনে সোভিয়েটে
দাসত্ব-শৃঙ্খল।
আমার সাথীরা প্রতি দেশে দেশে
আজো উদ্যত একই উদ্দেশে—
এখানে শত্রুনিধনে নিয়েছি প্রতিজ্ঞা গম্ভীর

বাঙলার বুকে কালো মহামারী মেলেছে অন্ধপাখা
আমার মায়ের পঞ্জরে নখ বিঁধেছে রক্তমাখা
তবু আজো দেখি হীন ভেদাভেদ !
আমরা মেলাব যত বিচ্ছেদ ;
আমরা সৃষ্টি করব পৃথিবী নতুন শতাব্দীর ॥

গান[11]

শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়ে
ঝন্ ঝনা ঝন্ ঝন্
সর্বহারার বন্দী-শিবিরে
ধ্বংসের গর্জন।
দিকে দিকে জাগে প্রস্তুত জনসৈন্য
পালাবে কোথায় ? রাস্তা তো নেই অন্য
হাড়ে রচা এই খোঁয়াড় তোমার জন্য
হে শত্রু দুষমন !

যুগান্ত জোড়া জড়রাত্রির শেষে
দিগন্তে দেখি স্তম্ভিত লাল আলো,
রুক্ষ মাঠেতে সবুজ ঘনায় এসে
নতুন দেশের যাত্রীরা চমকালো।
চলতি ট্রেনের চাকায় গুঁড়ায়ে দম্ভ
পতাকা উড়াই : মিলিত জয়স্তম্ভ।
মুক্তির ঝড়ে শত্রুরা হতভম্ব।

আমরা কঠিন পণ

ভবিষ্যতে[১২]

স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,
আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে হব রে ইন্ধন ?
বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে,
রক্ত পণে মুক্তি দেব ভারত-মাতারে।
মূর্খ যারা অজ্ঞ যারা যে জন বঞ্চিত,
তাদের তরে মুক্তি-সুধা করব সঞ্চিত।
চাষী মজুর দীন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই,
একস্বরে বলব মোরা স্বাধীনতা চাই।
থাকবে নাকো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়
ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।
আমরা সবাই ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর
আমরা হব মুক্তিদাতা আমরা হব বীর ॥

সুচিকিৎসা[১৩]

বদ্যিনাথের সর্দি হল কলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা ক'রে জোলাপ নিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বল্ল কেশে, "বড়ই কঠিন ব্যামো,
এ সব কি সুচিকিৎসা?—আরে আরে রামঃ।
আমার হাতে পড়লে পরে "এক্‌সরে' করে দেখি,
রোগটা কেমন, কঠিন কিনা—আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানেতে থাকুক,
আইস-ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন তো রাখুক।
'ইনজেক্‌শান' নিতে হবে 'অক্সিজেন'টা পরে,
তার পরেতে দেখব এ রোগ থাকে কেমন ক'রে"
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হল ভারী,
সর্দি হলেই এমনতর? ধন্য ডাক্তারী!!

পরিচয়[১৪]

ও পাড়ার শ্যাম রায়
কাছে পেলে কামড়ায়
এমনি সে পালোয়ান,
একদিন দুপুরে
ডেকে বলে গুপুরে
'এক্ষুনি আলো আন্‌'।

কী বিপদ তা হ'লে
আলো তার না হ'লে
          মার খাব আমরা ?
দিলে পরে উত্তর
রেগে বলে, 'ছত্তোর,
          যত সব দামড়া'।
কেঁদে বলি, শ্রীপদে
বাঁচাও এ বিপদে—
          অক্ষম আমাদের।
হেসে বলে শাম-দা
নিয়ে আয় রামদা
          ধুবড়ির রামাদের ॥

আজিকার দিন কেটে যায়[১০]

আজিকার দিন কেটে যায়,—
অনলস মধ্যাহ্ন বেলায়
যাহার অক্ষয় মূর্তি পেয়েছিনু খুঁজে
তারি পানে আছি চক্ষু বুজে।
আমি সেই ধনুর্ধর যার শরাসনে
অস্ত্র নাই, দীপ্তি মনে মনে,
দিগন্তের স্তিমিত আলোকে
পূজা চলে অনিত্যের বহ্নিময় স্রোতে।

চলমান নির্বিরোধ ডাক,
আজিকে অন্তর হতে চিরমুক্তি পাক।
কঠিন প্রস্তরমূর্তি ভেঙে যাবে যবে
সেই দিন আমাদের অস্ত্র তার কোষমুক্ত হবে
সুতরাং রুদ্ধতায় আজিকার দিন
হোক মুক্তিহীন।
প্রথম বাঁশির স্ফূর্তি গুপ্ত উৎস হতে
জীবন-সিন্ধুর বুকে আন্তরিক পোতে
আজিও পায় নি পথ তাই
আমার রুদ্রের পূজা নগণ্য প্রথাই
তবুও আগত দিন ব্যগ্র হয়ে বারংবার চায়
আজিকার দিন কেটে যায়॥

চৈত্রদিনের গান[16]

চৈত্রীরাতের হঠাৎ হাওয়া
                    আমায় ডেকে বলে,
"বনানী আজ সজীব হ'ল
                    নতুন ফুলে ফুলে।
এখনও কি ঘুম-বিভোল?
পাতায় পাতায় জানায় দোল
                    বসন্তেরই হাওয়া।
তোমার নবীন প্রাণে প্রাণে,
কে সে আলোর জোয়ার আনে?

নিরুদ্দেশের পানে আজি তোমার তরী বাওয়া ;
তোমার প্রাণে দোল দিয়েছে বসন্তেরই হাওয়া ।
ওঠ্ রে আজি জাগরে জাগ
সন্ধ্যাকাশে উড়ায় ফাগ
ঘুমের দেশের সুপ্তিহীনা মেয়ে ।
তোমার সোনার রথে চ'ড়ে
মুক্তি-পথের লাগাম ধ'রে
ভবিষ্যতের পানে চল আলোর গান গেয়ে ।
রক্তস্রোতে তোমার দিন,
চলেছে ভেসে সীমানাহীন ।
তারে তুমি মহান্ ক'রে তোল,
তোমার পিছে মৃত্যুমাখা দিনগুলিরে ভোল ॥

সুহৃদ্‌বরেষু[১৭]

কাব্যকে জানিতে হয়, দৃষ্টিদোষে নতুবা পতিত
শব্দের ঝঙ্কার শুধু যাহা ক্ষীণ জ্ঞানের অতীত ।
রাতকানা দেখে শুধু দিবসের আলোকপ্রকাশ,
তার কাছে অর্থহীন রাত্রিকার গভীর আকাশ ।
মানুষ কাব্যের স্রষ্টা, কাব্য কবি করে না সৃজন,
কাব্যের নতুন জন্ম, যেই পথ যখনই বিজন ।
প্রগতির কথা শুনে হাসি মোর করুণ পর্যায়
নেমে এল, (স্বেচ্ছাচার বুঝি বা গর্জায়)

যখন নতুন ধারা এনে দেয় দুরন্ত প্লাবন
স্বেচ্ছাচার মনে করে নেমে আসে তখনি শ্রাবণ ;
কাব্যের প্রগতি-রথ ?   (কারে কহে বুঝিতে অক্ষম,
অশ্বগুলি ইচ্ছামতো চরে খায়, খুঁজিতে মোক্ষম !)
সুজীর্ণ প্রগতি-রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উইয়ের জ্বালায
সাবথি-বাহন ফেলি' ইতস্তত বিপথে পালায ।
নতুনী রথের পথে মৃতপ্রায় প্রবীণ ঘোটক,
মাথা নেড়ে বুঝে, ইহা অ-রাজযোটক ॥

পটভূমি[১৮]

অজাতশত্রু, কতদিন কাল কাটলো :
চিরজীবন কি আবাদ-ই ফসল ফলবে ?
ওগো ত্রিশঙ্কু, নামাবলী আজ সম্বল
টংকারে মূঢ় স্তব্ধ বুকেব রক্ত ।

কখনো সন্ধ্যা জীবনকে চায় বাঁধতে,
সাদা রাতগুলো স্বপ্নের ছায়া মনে হয়,
মাটির বুকেতে পরিচিত পদশব্দ,
কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি থেকেই অব্যয় ।

ভীরু একদিন চেয়েছিল দূর অতীতে
রক্তের গড়া মানুষকে ভালবাসতে ;

তাই বলে আজ পেশাদারী কোন মৃত্যু
বিপদকে ভয়?   সাম্যের পুনরুক্তি।

সখের শপথ গলিত কালের গর্ভে—
প্রপঞ্চময় এই দুনিয়ার মুষ্টি,
তবু দিন চাই, উপসংহারে নিঃস্ব
নইলে চটুল কালের চপল দৃষ্টি।

পঙ্গু জীবন; পিচ্ছিল ভীত আত্মা,—
রাত্রির বুকে উদ্যত লাল চক্ষু;
শেষ নিঃশ্বাস পড়ুক মৌন মন্ত্রে,
যদি ধরিত্রী একটুও হয় রক্তিম ॥

ভারতীয় জীবনত্রাণ-সমাজের মহাপ্রয়াণে[১৯]

অকস্মাৎ মধ্যদিনে গান বন্ধ ক'রে দিল পাখি,
ছিন্নভিন্ন সন্ধ্যাবেলা প্রাত্যহিক মিলনের রাখী;
ঘরে ঘরে অনেকেই নিঃসঙ্গ একাকী।

ক্লাব উঠে গিয়েছে সফরে,
শূন্য ঘর, শূন্য মাঠ,
ফুল ফোটা মালঞ্চ প'ড়ে
ত্যক্ত এ ক্লাবের কক্ষে নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে।

সূর্য অস্ত গিয়েছে কখন্,
কারো আজ দেখা নেই—
কোথাও বন্ধুর দল ছড়ায় না হাসি,
নিষ্প্রভ ভোজের স্বপ্ন ;
একটি কথাও শব্দ তোলে না বাতাসে—
ক্লাব্-ঘরে ধুলো জমে,
বিনা গল্পে সন্ধ্যা হয় ;
চাঁদ ওঠে উন্মুক্ত আকাশে।

খেলোয়াড় খেলে নাকো,
গায়কেরা গায় নাকো গান—
বক্তারা বলে না কথা,
সাঁতারুর বন্ধ আজ স্নান।
সর্বস্ব নিয়েছে গোরা তারা মারে উরুতে চাপড়,
যে পথে এ ক্লাব গেছে কে জানে সে পথের খবর ?

সন্ধ্যার আভাস আসে,
জ্বলে না আলোক ক্লাব কক্ষের কোলে,
হাতে হাতে নেই সিগারেট—
তর্কাতর্কি হয় নাকো বিভক্ত দু'দলে ;
অযথা সন্ধ্যায় কোনো অচেনার পদশব্দে
মালীটা হাঁকে না।

মনে পড়ে লেকের সে পথ ?
মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা হাওয়ার চাবুক ?
অনেক উজ্জ্বল দৃশ্য এই লেকে
করেছিল উৎসাহিত বুক।

কেরানী, বেকার, ছাত্র, অধ্যাপক, শিল্পী ও ডাক্তার
সকলের কাছে ছিল অবারিত দ্বার,
কাজের গহ্বর থেকে পাখিদের মতো এরা নীড়
সন্ধানে, সন্ধ্যায় ডেকে এনেছিল এইখানে ভিড়।
রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সিনেমার কথা,
এদের রসনা থেকে প্রত্যহ স্খলিত হ'ত অলক্ষ্যে অযথা ;
মাঝে মাঝে অনর্থক উচ্ছ্বসিত হাসি,
বাতাসে ছড়াত নিত্য শব্দ রাশি রাশি।

তারপর অকস্মাৎ ভেঙে গেল রুদ্ধশ্বাস মন্ত্রমুগ্ধ সভা,
সহসা চৈতন্যোদয় ; প্রত্যেকের বুকে ফোটে ক্ষুব্ধ রক্তজবা।
সমস্ত গানের শেষে যেন ভেঙে গেল এক গানের আসর,
যেমন রাত্রির শেষে নিঃশেষে কাঙাল হয় বিবাহ-বাসর।

'জীবন-রক্ষক' এই সমাজের দারুণ অভাবে,
এদের 'জীবন-রক্ষা' হয়তো কঠিন হবে,
হয়তো অনেক প্রাণ যাবে॥

"নব জ্যামিতি"র ছড়া[২০]

Food Problem

(একটি প্রাথমিক সম্পাদ্যের ছায়া অবলম্বনে)

সিদ্ধান্ত :

আজকে দেশে রব উঠেছে, দেশেতে নেই খাদ্য ;
'আছে', সেটা প্রমাণ করাই অধুনা 'সম্পাদ্য'।

কল্পনা :

মনে করো, আসছে জাপান অতি অবিলম্বে,
সাধারণকে রাখতে হবে লৌহদৃঢ় 'লম্বে'।
"খাদ্য নেই" এর প্রথম পাওয়া খুব 'সরল রেখা'তে,
দেশরক্ষার 'লম্ব' তোলাই আজকে হবে শেখাতে।

অঙ্কন :

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে,
প্রতিরোধের বিন্দুতে নাও ঐক্য-রেখা এঁকে।
'হিন্দু'-'মুসলমানে'র কেন্দ্রে, দুদিকের দুই 'চাপে',
যুক্ত করো উভয়কে এক প্রতিরোধের ধাপে।
প্রতিরোধের বিন্দুতে দুই জাতি যদি মেলে,
সাথে সাথেই খাদ্য পাওযার হদিশ তুমি পেলে।

প্রমাণ :

খাদ্য এবং প্রতিরোধ উভয়েরই চাই,
হিন্দু এবং মুসলমানে মিলন হবে তাই।

উভয়ের চাই স্বাধীনতা, উভয় দাবীই সমান,
দিকে দিকে 'খাদ্যলাভ' একতারই প্রমাণ।
প্রতিরোধের সঠিক পথে অগ্রসর যারা,
ঐক্যবদ্ধ পরস্পর খাদ্য পায় তারা॥

জবাব[২১]

আশংকা নয় আসন্ন রাত্রিকে
মুক্তি-মগ্ন প্রতিজ্ঞা চারিদিকে
হানবে এবার অজস্র মৃত্যুকে ;
জঙ্গী-জনতা ক্রমাগত সম্মুখে।

শত্রুদল গোপনে আজ, হানো আঘাত
এসেছে দিন ; পতেঙ্গার রক্তপাত
আনে নি ক্রোধ, স্বার্থবোধ দুর্দিনে ?
উষ্ণমন শাণিত হোক সংগীনে।

ক্ষিপ্ত হোক, দৃপ্ত হোক তুচ্ছ প্রাণ
কাস্তে ধরো, মুঠিতে এক গুচ্ছ ধান।
মর্ম আজ ধর্ম সাজ আচ্ছাদন
করুক : চাই এদেশে বীর উৎপাদন।

শ্রমিক দৃঢ় কারখানায়, কৃষক দৃঢ় মাঠে,
তাই প্রতীক্ষা, ঘনায় দিন স্বপ্নহীন হাটে।
তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাতে নিবিড়
পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির॥

চরমপত্র[২২]

তোমাকে দিচ্ছি চরমপত্র রক্তে লেখা ;
অনেক দুঃখে মথিত এ শেষ বিদ্বে শেখা ;
অগণ্য চাষী-মজুর জেগেছে শহরে গ্রামে
সবাই দিচ্ছি চরমপত্র একটি খামে :
পবিত্র এই মাটিতে তোমার মুছে গেছে ঠাঁই,
ক্ষুব্ধ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত 'স্বাধীনতা চাই'।
বহু উপহার দিয়েছ,—শাস্তি, ফাঁসি ও গুলি,
অরাজক, মারী, মন্বন্তরে মাথার খুলি।
তোমার যোগ্য প্রতিনিধি দেশে গড়েছে শ্মশান,
নেড়েছে পর্ণকুটির, কেড়েছে ইজ্জত, মান।
এতদিন বহু আঘাত হেনেছ, পেয়ে গেছ পার,
ভুলি নি আমরা, শুরু হোক শেষ হিসাবটা তার,
ধর্মতলাকে ভুলি নি আমরা, চট্টগ্রাম
সর্বদা মনে অঙ্কুশ হানে নেই বিশ্রাম।
বোম্বাই থেকে শহীদ জীবন আনে সংহতি,
ছড়ায় রক্ত প্লাবন, এদেশে বিদ্যুৎগতি।
আমাদের এই দলাদলি দেখে ভেবেছ তোমার
আয়ু সুদীর্ঘ, যুগ বেপরোয়া গুলি ও বোমার,
সে স্বপ্ন ভোলো চরমপত্র সমুখে গড়ায়,
তোমাদের চোখ-রাঙানিকে আজ বলো কে ডরায় ?
বহু তো অগ্নি বর্ষণ করো সদলবলে,
আমরা জ্বালছি আগুন নেভাও অশ্রুজলে।
স্পর্ধা, তাইতো ভেঙে দিলে শেষ-রক্তের বাঁধ
রোখো বন্যাকে, চরমপত্রে ঘোষণা : জেহাদ ॥

মেজদাকে : মুক্তির অভিনন্দন[২৩]

তোমাকে দেখেছি আমি অবিচল, দৃপ্ত দুঃসময়ে
ললাটে পড়ে নি রেখা ক্রূরতম সংকটেরও ভয়ে ;
তোমাকে দেখেছি আমি বিপদেও পরিহাস রত
দেখেছি তোমার মধ্যে কোনো এক শক্তি সুসংহত ।
দুঃখে শোকে, বারবার অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতে
অনাহত, আত্মমগ্ন সমুদ্যত জয়ধ্বজা হাতে ।
শিল্প ও সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট তোমার হৃদয়
জীবনকে জানো তাই মান নাকো কোনো পরাজয় ;
দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ মন যেন ব্যস্ত ভাগীরথী জল
পথের দু'ধারে তার ছড়ায় যে দানের ফসল,
পরোয়া রাখে না প্রতিদানের তা এমনি উদার,
বহুবার মুখোমুখি হয়েছে সে বিশ্বাসহন্তার ।
তবুও অক্ষুণ্ণ মন, যতো হোক নিন্দা ও অখ্যাতি
সহিষ্ণু হৃদয় জানে সর্বদা মানুষের জ্ঞাতি,
তাইতো তোমার মুখে শুনে বাণপ্রস্থের ইঙ্গিত
মনেতে বিস্ময় মানি, শেষে হবে বিরক্তির জিত ?
পৃথিবীকে চেয়ে দেখ, প্রশ্নে ও সংশয়ে থরো থরো,
তোমার মুক্তির সঙ্গে বিশ্বের মুক্তিকে যোগ করো ॥

পত্র[২৪]

কাশী গিয়ে হু হু ক'রে কাটলো কয়েক মাস তো,
কেমন আছে মেজাজ ও মন, কেমন আছে স্বাস্থ্য
বেজায় রকম ঠাণ্ডা সবাই করছে তো বরদাস্ত ?
খাচ্ছে সবাই সস্তা জিনিস, খাচ্ছে পাঁঠা আস্ত ?

সেলাই কলের কথাটুকু মেজদার দু'কান
স্পর্শ ক'রে গেছে বলেই আমার অনুমান।
ব্যবস্থাটা হবেই, করি অভয় বর দান ;
আশা করি, শুনে হবে উল্লসিত প্রাণ।
এতটা কাল ঠাকুর ও ঝি লোভ সামলে আসতো,
এবার বুঝি লোভের দায়ে হয় তারা বরখাস্ত।

চারুটাও হয়ে গেছে বেজায় বেয়াড়া,
মাথার ওপরে ঝোলে যা খুশীর খাঁড়া।
নতেদা'র বেড়ে গেছে অঙ্গুলি হাড়া,
ঘেলুর পরীক্ষাও হয়ে গেছে সারা ;
এবার খরচ ক'রে কিছু রেল-ভাড়া
মাতিয়ে তুলতে বলি রামধন পাড়া।

এবার বোধহয় ছাড়তে হল কাশী,
ছাড়তে হল শৈলর মা, ইন্দু ও ন'মাসি।
দুঃখ কিসের, কেউ কি সেথায় থাকে বারোমাসই
কাশী থাকতে চাইবে তারা যারা স্বর্গবাসী,
আমি কিন্তু কলকাতাতেই থাকতে ভালবাসি।
আমার যুক্তি শুনতে গিয়ে পাচ্ছে কি খুব হাসি ?
লেখা বন্ধ হোক তা হলে, এবার আমি আসি ॥

মার্শাল তিতোর প্রতি[২৫]

কমরেড, তুমি পাঠালে ঘোষণা দেশান্তরে,
কুটিরে কুটিরে প্রতিধ্বনি,—
তুলেছে মুক্তি দারুণ তুফান প্রাণের ঝড়ে
তুমি শক্তির অটুট খনি।
কমরেড, আজ কিষাণ শ্রমিক তোমার পাশে
তুমি যে মুক্তি রটনা করো,
তারাই সৈন্য : হাজারে হাজারে এগিয়ে আসে
তোমার দু'পাশে সকলে জড়ো।
হে বন্ধু আজ তুমি বিদ্যুৎ অন্ধকারে
সে আলোয় দ্রুত পথকে চেনা :
সহসা জনতা দৃপ্ত গেরিলা—অত্যাচারে,
দৃঢ় শত্রুর মেটায় দেনা।
তোমার মন্ত্র কোণে কোণে ফেরে সংগোপনে
পথচারীদের ক্ষিপ্রগতি :
মেতেছে জনতা মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটনে :
—ভীরু প্রস্তাবে অসম্মতি।
ফসলের ক্ষেতে শত্রু রক্ত-সেচন করে,
মৃত্যুর ঢেউ কারখানাতে—
তবুও আকাশ ভরে আচমকা আর্তস্বরে :
শত্রু নিহত স্তব্ধ রাতে।
প্রবল পাহাড়ে গোপনে যুদ্ধ সঞ্চারিত
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মুখর গানে,
বিপ্লবী পথে মিলেছে এবার বন্ধু তিতো :
মুক্তির ফৌজ আঘাত হানে।
শত্রু শিবিরে লাগানো আগুনে বাঁধন পোড়ে

—অগ্নি ইসারা জনান্তিকে !
ধ্বংসস্তূপে আজ মুক্তির পতাকা ওড়ে
ভাঙার বন্যা চতুর্দিকে ।
নামে বসন্ত, পাইন বনের শাখায় শাখায়
গাঢ়-সংগীত তুষারপাতে,
অযুত জীবন ঘনিষ্ঠ দেহে সামনে তাকায় :
মারণ-অস্ত্র সবল হাতে ।
লক্ষ জনতা রক্তে শপথ রচনা করে—
'আমরা নই তো মৃত্যুভীত,
তৈরী আমরা ; যুগোশ্লাভের প্রতিটি ঘরে
তুমি আছ জানি বন্ধু তিতো ।'
তোমার সেনানী পথে প্রান্তরে দোসর খোঁজে :
'কোথায় কে আছ মুক্তিকামী ?'
ক্ষিপ্ত করেছে তোমার সে ডাক আমাকেও যে
তাইতো তোমার পেছনে আমি ॥

ব্যর্থতা[২৬]

আজকে হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদী
পার হ'তে সাধ জাগে, মনে হয় তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ,
চাষার ছেলের হাতে এসে যেত হঠাৎ আজ ।
তা হলে না হয় আকাশবিহার হ'ত সফল,
টুকরো মেঘেরা যেতে-যেতে ছুঁয়ে যেত কপোল ;

জনারণ্যে কি রাজকন্যার নেইকো ঠাঁই ?
কাস্তেখানাকে বাগিয়ে আজকে ভাবছি তাই।

অসি নাই থাক, হাতে তো আমার কাস্তে আছে,
চাষার ছেলের অসিকে কি ভালবাসতে আছে ?
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝলসে উঠবে কাস্তে দৃপ্ত-কিরণ।
হে রাজকন্যা, দৈত্যপুরীতে বন্দী থেকে
নিজেকে মুক্ত করতে আমায় নিয়েছ ডেকে
হেমন্তে পাকা ফসল সামনে, তবু দিলে ডাক ;
তোমাকে মুক্ত করব, আজকে ধান কাটা থাক।

রাজপুত্রের মতন যদিও নেই কৃপাণ,
তবু মনে আশা, তাই কাস্তেতে দিচ্ছি শান,
হে রাজকুমারী, আমাদের ঘরে আসতে তোমার
মন চাইবে তো ? হবে কষ্টের সমুদ্র পার ?
দৈত্যশালায় পাথরের ঘর, পালঙ্ক-খাট,
আমাদের শুধু পর্ণ-কুটির, ফাঁকা ক্ষেত-মাঠ ;
সোনার শিকল নেই, আমাদের মুক্ত আকাশ,
রাজার ঝিয়ারী ! এখানে নিদ্রাহীন বারো মাস।

এখানে দিন ও রাত্রি পরিশ্রমেই কাটে
সূর্য এখানে দ্রুত ওঠে, নামে দেরিতে পাটে।
হে রাজকন্যা, চলো যাই, আজ এলাম পাশে,
পক্ষীরাজের অভাবে পা দেব কোমল ঘাসে।

হে রাজকন্যা সাড়া দাও, কেন মৌন পাষাণ ?
আমার সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে তুমি তুলবে না ধান ?
হে রাজকন্যা, ঘুম ভাঙলো না ? সোনার কাঠি
কোথা থেকে পাব, আমরা নিঃস্ব, ক্ষেতেই খাটি ।
সোনার কাঠির সোনা নেই, আছে ধানের সোনা,
তাতে কি হবে না ? তবে তো বৃথাই অনুশোচনা ॥

দেবদারু গাছে রোদের ঝলক[২৭]

দেবদারু গাছে রোদের ঝলক, হেমন্তে ঝরে পাতা,
সারাদিন ধ'রে মুরগীরা ডাকে, এই নিয়ে দিন গাঁথা
রক্তের ঝড় বাইরে বইছে, ছোটে হিংসার ঢেউ,
খবরে কাগজ জানায় সেকথা, চোখে দেখি নাকো কেউ ॥

১। 'ক্ষুধা' গল্পটি ২রা এপ্রিল ১৯৪৩-এর অরণি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অরুণাচলকে লেখা ২৭শে চৈত্র ১৩৪৯ তারিখের চিঠিতে এই গল্পটির উল্লেখ করেছেন সুকান্ত।

২। 'দুর্বোধ্য' গল্পটি ২৮শে মে ১৯৪৩-এর অরণি পত্রিকায় চিত্র-গল্প হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

৩। 'ভদ্রলোক' গল্পটিও অরণিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৪। 'দরদী কিশোর' গল্পটি সাপ্তাহিক জনযুদ্ধ পত্রিকায় কিশোর বিভাগে ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৫। 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্পটি জনযুদ্ধের কিশোর বিভাগে ৬ই অক্টোবর ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। জনযুদ্ধে প্রকাশিত গল্প দুটি শ্রীসুধী প্রধানের সহায়তায় সংগৃহীত।

৬। 'ছন্দ ও আবৃত্তি' প্রবন্ধটি ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭-এর অরণিতে প্রকাশিত হয়েছে।

৭। গানটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪০। এটি 'সূর্য-প্রণাম'-এর সমকালীন একটি অসম্পূর্ণ গীতিকাব্যের প্রথমাংশ বলে মনে হয়।

৮। এই গানটি শ্রীবিমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন। গানটি গীতিগুচ্ছের গানগুলির সমকালীন বলে মনে হয়।

৯। সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'জনযুদ্ধের গান' সংকলন গ্রন্থটি থেকে এই গানটি সংগৃহীত।

১০। গানটি মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৬৩-তে প্রকাশিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেছে। রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৩-৪৪ সাল।

১১। গানটির রচনাকাল ১৯শে জুলাই ১৯৪৪ সাল।

১২-১৩। 'ভবিষ্যতে' ও 'সুচিকিৎসা'—এই ছড়া দুটি শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'সুকান্ত-প্রসঙ্গ', 'শারদীয়া বসুমতী', ১৩৫৪-থেকে সংগৃহীত। পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি! এগুলি ১৯৪০-এর আগের লেখা বলে অনুমিত।

১৪। ‘পরিচয়’ ছড়াটির রচনাকাল ১৩৩৯-৪০ সাল বলে মনে হয়।

১৫। এই কবিতাটিও ভূপেন্দ্রনাথের ‘সুকান্ত-প্রসঙ্গ’ প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। এটি ১৯৪০-এর আগের রচনা।

১৬। ‘চৈত্রদিনের গান’ কবিতাটি শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ছোটদের ‘শিখা’ পত্রিকার জন্য রচিত। রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪০।

১৭। এই কবিতাটি অরুণাচলকে সুকান্ত পত্রাকারে লিখেছিলেন। রচনার তারিখ ১৩ই কার্তিক ১৩৪৮।

১৮। ‘পটভূমি’ কবিতাটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪২-৪৩।

১৯। ‘ভারতীয় জীবনত্রাণ-সমাজের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে শোকোচ্ছ্বাস (শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-কে)’—এই শিরোনামায় কবিতাটি লেখা হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার লেক অঞ্চলের ‘ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি’র সদস্য ছিলেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। লেকে যুদ্ধকালীন মিলিটারী ক্যাম্প হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলে সুকান্ত এই কবিতাটি লিখেছিলেন।

২০। “নব জ্যামিতি”র ছড়া সাপ্তাহিক জনযুদ্ধের কিশোর বিভাগে প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৩।

২১। ‘জবাব’ কবিতাটি কার্তিক ১৩৫০-এর পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২২। ‘চরমপত্র’ কবিতাটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৪।

২৩। ১৯৪৪ সালে সুকান্তর মেজদা শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হন। তাঁর মুক্তি উপলক্ষে সুকান্ত এই কবিতাটি লেখেন।

২৪। ১৯৪৫ সালে সুকান্ত মেজবৌদি রেণু দেবীর সঙ্গে কাশী বেড়াতে যান। সুকান্ত ফিরে এসে শ্যামবাজারের বাড়ি থেকে এই চিঠিটি তাঁকে লিখেছিলেন। চিঠিটি শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন।

২৫। ‘মার্শাল তিতোর প্রতি’ কবিতাটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৬।

২৬। ‘ব্যর্থতা’ কবিতাটি আষাঢ় ১৩৫৩-এর কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি ‘মীমাংসা’ কবিতার প্রথম খসড়া বলে মনে হয়।

২৭। ১৯৪৬ সালে রচিত এই কবিতাটি খুলনার ‘সপ্তর্ষি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শয্যাশায়ী সুকান্ত ‘রেড-এড কিওর হোম’ হাসপাতালের রাইটিং প্যাডে লিখে এটি পাঠান। কবিতাটি শ্রীমনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রথম ছত্রের সূচী

অকস্মাৎ মধ্যদিনে গান বন্ধ ক'রে দিল পাখি	৩৯৪
অজাতশত্রু, কতদিন কাল কাটলো	২৯৩
অনিশ্চিত পৃথিবীতে অরণ্যের ফুল	১২১
অনেক উল্কার স্রোত বয়েছিল হঠাৎ প্রত্যুষে	১২৯
অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ বহু উদ্যম আমার	৯৭
অনেক স্তব্ধ দিনের এপারে চকিত চতুর্দিক	১২৪
অবাক পৃথিবী ! অবাক করলে তুমি	৪৯
অভুক্ত শ্বাপদচক্ষু নিঃস্পন্দ আঁধারে	৯২
অমৃতলোকের যাত্রী হে অমর কবি, কোন প্রস্থানের	২৪৭
অসহ্য দিন ! স্নায়ু উদ্বেল ! শ্লথ পায়ে ঘুরি ইতস্তত	১৬০
আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়	১০১
আকাশের খাপছাড়া ক্রন্দন	১২২
আজ এসেছি তোমাদের ঘরে ঘরে	৬৫
আজকে দেশে রব উঠেছে, দেশেতে নেই খাদ্য	৩৯৭
আজকে হঠাৎ সাত-সমুদ্র তেরো-নদী	১৩১
আজকে হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদী	৪০৩
আজ মনে হয় বসন্ত আমার জীবনে এসেছিল	৩২
আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়	১৪৬
আজ রাত্রে ভেঙে গেল ঘুম	৪৮
আজিকার দিন কেটে যায়	৩৯০
আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ	৮৪
আঁধিয়ারে কেঁদে কয় সলতে	১৬৯
আবার এবার দুর্বার সেই একুশে নভেম্বর	১০২
আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে	২৮৬
আমরা সবাই প্রস্তুত আজ, ভীরু পলাতক	১৬২
আমরা সিগারেট	৫৩
আমরা সিঁড়ি	৪০
আমাদের ডাক এসেছে	২৩৮

আমার গোপন সূর্য হল অস্তগামী ১৪৫
আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ ১২৭
আমার মৃত্যুর পর কেটে গেল বৎসর বৎসর ১২৫
আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন ১৫২
আমায় সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে ৫৬
আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি ৫৫
আমি সৈনিক, হাঁটি যুগ থেকে যুগান্তরে ১৬৬
আর এক যুদ্ধ শেষ ১০৪
আরবার ফিরে এল বাইশে শ্রাবণ ১৭০
আশংকা নয় আসন্ন রাত্রিকে ৩৯৮
এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি ১১৫
এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে ৮২
এই নিবিড় বাদল দিনে ১৮১
এই হেমন্তে কাটা হবে ধান ৮৩
এক যে ছিল আপনভোলা কিশোর ১৯৮
একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল ৩৮
এখন এই তো সময় ৬৮
এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি ২৯
এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে ১১৯
এখানে সূর্য ছড়ায় অকৃপণ ১৩৮
এত দিন ছিল বাঁধা সড়ক ১৪৯
এদেশ বিপন্ন আজ ; জানি আজ নিরন্ন জীবন ৬৭
এমন মুহূর্ত এসেছিল ১৫৩
এসো এসো এসো হে নবীন ৩৮৪
ও কে যায় চলে কথা না বলে দিও না যেতে ১৮৫
ও কে যায় চলে কথা না বলে, দিও না যেতে ২৪৫
ওখানে এখন মে মাস তুষার গলানো দিন ৫৪
ওগো কবি তুমি আপন ভোলা ১৮৯

ওগো কবি, তুমি আপন ভোলা ২৩৮
ও পাড়ার শ্যাম রায় ৩৮৯
কখন বাজল ছ'টা ১৬৮
কখনো হঠাৎ মনে হয় ৭৩
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি ১৮৯
কত যুগ, কত বর্ষান্তের শেষে ৯৮
কবিগুরু, আজ মধ্যাহ্নের অর্ঘ্য ২৩৯
কমরেড, তুমি পাঠালে ঘোষণা দেশান্তরে ৪০২
কলকাতায় শান্তি নেই ৬২
কলম, তুমি কত না যুগ কত না কাল ধ'রে ৪১
কাব্যকে জানিতে হয়, দৃষ্টিদোষে নতুবা পতিত ৩৯২
কারা যেন আজ দুহাতে খুলেছে, ভেঙেছে খিল ১০১
কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায় ৩৫
কাশী গিয়ে হু হু ক'রে কাটলো কয়েক মাস তো ৪০১
কাস্তে দাও আমার এ হাতে ৮০
কিছু দিয়ে যাও এই ধূলিমাখা পান্থশালায় ১৮৭
কিন্তু মধ্যাহ্ন তো পেরিয়ে যায় ২৪০
কোন অভিশাপ নিয়ে এল এই ১৯১
ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি কর ক্ষমা ১৮৮
ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম ৬০
ক্ষুধিতের সেবার সব ভার ২১৯
খবর আসে ৩২
গন্ধ এনেছে তীব্র নেশায় ফেনিল মদির ২৫১
গানের সাগর পাড়ি দিলাম ১৮২
গুঞ্জরিয়া এল অলি ১৯০
ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত ২০৫
চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন ১২৬
চৈতীরাতের হঠাৎ হাওয়া আমায় ডেকে বলে ৩৯১

জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ ৩৮৬
জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ ১৮
জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে ১৬৩
জাপানী গো জাপানী ১৬৯
জার্মানী গো জার্মানী ১৬৯
ঝুলন-পূর্ণিমাতে ২৪৮
ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু ৪৫
তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাও না যতই গালি ১৯৭
তোমরা এসেছ, বিপ্লবী বীর ! অবাক অভ্যুদয় ১০৬
তোমাকে দিচ্ছি চরমপত্র রক্তে লেখা ৩৯৯
তোমাকে দেখেছি আমি অবিচল, দৃপ্ত দুঃসময়ে ৪০০
তোর সেই ইংরাজীতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা কামনা ১৪০
দম-আটকানো কুয়াশা তো আর নেই ৫২
দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে ১৮৪
দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে ২৪১
দুর্বল পৃথিবী কাঁদে জটিল বিকারে ১৪৮
দৃষ্টিহীন সন্ধ্যাবেলা শীতল কোমল অন্ধকার ১৫০
দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম ৮৯
দেখ, এই মোটা লোকটাকে দেখ ২০৯
দেবদারু গাছে রোদের ঝলক, হেমন্তে ঝরে পাতা ৪০৫
দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে ১৬৮
দ্বারে মৃত্যু ৪৪
ধনপতি পাল, তিনি জমিদার মস্ত ২০৮
নগরে ও গ্রামে জমেছে ভিড় ৯৪
নমো রবি, সূর্য দেবতা ২৪৯
নরম ঘুমের ঘোর ভাঙল ১১৪
নিশুতি রাতের বুকে গলানো আকাশ ১৫৮
নিয়ত দক্ষিণ হাওয়া শুরু হল একদা সন্ধ্যায় ৭৮

নীল সমুদ্রের ইশারা ১৩৪
পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম ৫৮
পাখি সব করে রব, রাত্রি শেষ ঘোষণা চৌদিকে ১৩৭
পূব সাগরের পার হতে কোন পথিক তুমি উঠলে হেসে ২৩৫
পৃথিবী কি আজি শেষে নিঃস্ব ১৭৬
পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে ৬১
ফেব্রারী মাসে ভাই, কলকাতা শহরে ২১৫
ফোটে ফুল আসে যৌবন ১৯৩
বদ্যিনাথের সর্দি হল কলকাতাতে গিয়ে ৩৮৯
বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত ১৬১
বরেনবাবু মস্ত জ্ঞানী, মস্ত বড় পাঠক ২০১
বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে ২০৬
বিগত শেষ-সংশয় : স্বপ্ন ক্রমে ছিন্ন ১১১
বিষণ্ণ রাত, প্রসন্ন দিন আনো ১২৪
বিয়ে বাড়ি : বাজছে সানাই, বাজছে নানান বাদ্য ২০৩
বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি ৯৫
বেজে চলে রেডিও ১৬৮
বেলাশেষে শান্তছায়া সন্ধ্যার আভাসে ২৪৩
ভাঙন নেপথ্য পৃথিবীতে ১১৮
ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি ৩০
ভারতবর্ষে পাথরের গুরুভার ১১২
ভুল হল বুঝি এই ধরণীতলে ১৯২
ভেঙেছে সাম্রাজ্যস্বপ্ন, ছত্রপতি হয়েছে উধাও ১৩৫
ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায় ১৯৯
মাথা তোল তুমি বিন্ধ্যাচল ১৬৫
মুখ তুলে চায় সুবিপুল হিমালয় ১৯৩
মুখে-মৃদু হাসি অহিংস বুদ্ধের ৭০
মুহূর্তকে ভুলে থাকা বৃথা ১৫৫

ছ তুমি তাই	১৫০
া 'পরে ভিত্তি প্রতিকূল	১৫৩
নিন্দিত স্বরে	১১০
দবীতে গোলমাল ভারী	২০২
রে তপন টানে জল	৩৮৫
ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে	২৭
কদিন দিতে গিয়ে আড্ডা	২০৪
টেছে তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে	৭৬
ন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে	৯০
ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ	৮৭
রে ভোরের পাখির রবে	১৮৪
'হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে	১৮৬
ভাঙা সুর বাজে পায়ে	৩৮৭
না একটা গোপন খবর দিচ্ছি আমি তোমায়	২০০
লে বিকালে মনের খেয়ালে	১৬৮
আকাশতলে পীড়িত নিঃশ্বাসে	১৪৩
ভিড় জমে ওঠে রেস্তোঁরার দুর্লভ আসরে	১৫৯
আঁধার ঘিরল যখন	১৮৮
ন্ত আজ আমি প্রহরী	১০৯
ম	২৩৫
বিশ্রী দম-আটকানো কুয়াশা আর নেই	৫০
রাত্রি এনেছে প্লাবন, উষ্ণ নিবিড়	৯১
ন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন	৩৮৮
আলোর আভাস পেয়ে কেঁপে উঠল	২৩৬
দেশে উঠল আওয়াজ—"হো-হো, হো-হো, হো-হো"	২১৩
ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল	৭৯
ফাল্গুনী হাওয়া ব্যাধিগ্রস্ত কলির সন্ধ্যায়	১৬১
বুঝি তোমার রথের সাতটি ঘোড়া উঠল	২৬৬

হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার ?
হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলা দেশ
হে তারুণ্য, জীবনের প্রত্যেক প্রবাহ
হে নাবিক, আজ কোন্ সমুদ্রে
হে পাষাণ, আমি নির্ঝরিণী
হে পৃথিবী, আজিকে বিদায়
হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
হে মোর মরণ, হে মোর মরণ
হে রাজকন্যে
হে সাথী, আজকে স্বপ্নের দিন গোনা
হে সূর্য ! শীতের সূর্য